হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

মৃত্তিকার রং

মাকে

এই লেখকের ঃ

ইরাবতী (২য় সং)
উপকূল
আরাকান
অন্যতমা
সুরবাহার
সপ্তকন্যার কাহিনী
বহুচারিনী

শহরের শেষ, শহরতলীর শুরু।

সীমানা হিসাবেই এবড়ো খেবড়ো বাঁজা মাঠ। একপাশে স্তূপীকৃত ভাঙাচোরা ইঁটের বাহার। অর্ধসমাপ্ত ঘর তৈরীর ইসারা। পোড়া ইঁটগুলোর মতন মানুষটার ভাগ্যেও হয়তো আগুন লেগেছিল। একতলা সমান গাঁথুনী, তারপরেই শেষ। আশা আকাঙ্ক্ষার সমাধি। পীচঢালা পথ ফুরিয়ে লাল শুরকির রাস্তা, খোয়াওঠা। গাড়ীর নাচুনিতেই মালুম হয়। দুপাশে ছোট ছোট বাড়ি, সামনের ফালি জমিতে পেঁপে, সজনে আর লাউ কুমড়োর মাচা। ঠিক দুপুরে কেউ কোথাও নেই। সাড়া নয়, শব্দ নয়, কেবল গাছের মাথায় বসা কাকের চীৎকার।

খড়খড়ি ফাঁক করে রমা ডাগর চোখ দুটো মেলে চেয়ে চেয়ে দেখল। শহরের সচল ব্যস্ততা থেকে শহরতলীর শান্ত পরিবেশ। ক্লান্ত জীবন থেকে নতুন জীবনের হাতছানি। আড়চোখে সামনে বসা লোকটার দিকেও নজর চালাল। এতদিনের চেনা লোকটাও কেমন অচেনা। দিনের পর দিন মানুষ জনের চোখ বাঁচিয়ে এই লোকটা ইনিয়ে বিনিয়ে ভালোবাসার কথা বলেছে, ইঙ্গিত দিয়েছে মধুর জীবনের, এমন যেন মনেই হয় না। গম্ভীর মুখ, ঝড়ের মুখে বেকায়দায় পড়া নৌকার মাঝির মতন উদ্বেগের আঁচড়ও গালের ভাঁজে, চোখের দৃষ্টিতে।

রমা ইচ্ছা ক'রেই চুড়ির আওয়াজ করল। একটা হাত রাখল লোকটার হাঁটুর ওপরে, খুব আস্তে ফিসফিসিয়ে বলল, আর কতদূর গো!

—কেন? ভয় করছে? লোকটি বাইরে থেকে চোখ ফেরাল না।

গাড়ি বাঁক ফিরতেই লোকটি জানলা দিয়ে মুখ বাড়াল। চাকা দু' পাক ঘুরতেই জোর গলায় বলল—ব্যস, রোখকে।

লাগামে টান পড়তেই গাড়ির পাঁজরায় আর্তনাদ। ঝাঁকুনী দিয়ে থেমে গেল। গাড়োয়ান নেমে দরজা খুলে দাঁড়াল।

মাথা নিচু ক'রে নামবার মুখেই রমা বাধা পেল। হাতের ওপর চিমটি কেটে লোকটি ইসারা করল। সঙ্গে সঙ্গে রমা ব্যস্ত হাতে ঘোমটা তুলে দিল মাথায়।

আশ্চর্য, কিছুতেই মনে থাকে না। অথচ মাস খানেকের ওপর সুযোগ সুবিধা পেলেই রমা কোণের ঘরটায় ব'সে ভাঙা আয়নার সামনে মাথায় ঘোমটা টেনে দিয়েছে, উঁকি দিয়ে দেখেছে নিজের লাজুক প্রতিচ্ছবির দিকে, খুট ক'রে একটু আওয়াজ হতেই চমকে উঠে মাথার কাপড় ফেলে দিয়েছে ঘাড়ের ওপর।

ঘোমটা মাথায় রমা পায়ে পায়ে রাস্তার ধারে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গেই গাড়োয়ান গাড়ীর ছাদের ওপর থেকে বিছানার বাণ্ডিল আর ছোট বাক্স দুটো নামিয়ে রাখল এক পাশে, তারপর মাথায় জড়ান গামছাটা খুলে গালের ওপর গড়িয়ে আসা ঘাম মুছতে মুছতে হাত পাতল।

নিচু হয়ে বালতিটা তুলতে গিয়েই রমা থেমে গেল, তার আগেই কে একজন তুলে নিল বালতিটা, শক্তহাতে ছোট বাক্সটা তুলতে তুলতে বলল, থাক বৌদি, তুমি ঘরে গিয়ে বস, আমি সব তুলে নিয়ে যাচ্ছি।

সরু কালাপাড় ধুতি, সাদা সেমিজ, কনুইয়ের কাছে বরাবর সোনার মাদুলী, গলাতেও পাতলা একছড়া হার। আঁটসাট গড়ন, পানের রসে রাঙা টুকটুকে পুরু ঠোঁট, হাসিখুশী মানুষটি। যৌবন পড়তির মুখে, কিন্তু শক্ত গড়নের জন্য কমবয়সীই দেখায়।

আর কথা বাড়াল না রমা। পিছন পিছন সরু নালা পার হয়ে বাড়ির উঠানে এসে ঢুকল।

—আমার নাম সুখী, বুঝলে বৌদি, ওই নামেই বাপু ডেকো। বাড়ীওয়ালীর মতন তুমিও যেন ঝি ঝি ব'লে দিনরাত্তির হাঁক পেড়ো না।

রমা ঘাড় নাড়ল—কেন, ওসব বলতে যাব কেন। সুখী নামটা তো বেশ। দিব্যি নাম।

—ওই নামটুকুই দিব্যি। যা সুখে আছি তা আর শুনে কাজ নেই। শখ ক'রে বাপ মা ওই নাম রেখেছিল। ভেবেছিল বোধ হয়, মেয়ে আমার রাজরাণীই হবে। হুঁ, এখন একবার ওপর থেকে চোখ মেলে চেয়ে দেখুক হেনস্তাটা—

কথাগুলো মাঝপথে থেমে যেতেই রমা ঘোমটা একটু তুলে চেয়ে দেখল।

বালতি আর বাক্স উঠানে নামিয়ে সুখী একটা হাত দিয়ে নিজের কপাল চাপড়াচ্ছে, মরণদশা আমার, হুট হুট করে এগিয়ে তো আসছি, এদিকে যে তালা ঝুলছে দরজায়। তারপরই গলার আওয়াজ খাটো করে রমার দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, দাও বৌদি চাবিটা।

—চাবি তো নেই আমার কাছে।

—ওমা, কি বোকা মেয়ে গো তুমি বৌদি! সুখী খিল খিল ক'রে হেসে উঠল, এর মধ্যে চাবির গোছা সোয়ামীর হাতে তুলে দিয়েছ? যাও, চেয়ে নিয়ে এস। দরজা তো আর ফুস্‌মন্তরে খুলবে না।

রমাকে বেশী দূর এগোতে হ'ল না, ভাড়া মিটিয়ে হন্‌ হন ক'রে মানুষটাই এগিয়ে আসছিল। কাছাকাছি আসতেই রমা আস্তে আস্তে বলল, কমলদা, ঘরের চাবিটা।

কমল বিরক্তিতে ভুরু দুটো কোঁচকাল, না, তুমি সর্ব্বনাশ করবে দেখছি রমা। খুব সাবধান, দেওয়ালেরও কান আছে। পই পই ক'রে বারণ করেছি, ওসব দাদা-টাদা এবার ছাড়। কে কোথা দিয়ে শুনে ফেললে কেলেঙ্কারীর একশেষ। আর ঘর বাঁধতে হবে না। এমনিতেই তো তোমার দুই দাদা বোধ হয় এতক্ষণ হন্যে হয়ে শহর চষে ফেলছে। তোমার বাবা নেহাৎ অপারগ। বিছানায় শুয়ে শুয়েই আমার চোদ্দপুরুষ নরকস্থ করছেন। কোথায় সামলে সুমলে গা ঢাকা দিয়ে থাকতে হবে আর তুমি প্রথম দিনেই এলোমেলো গাইতে শুরু করেছো।

ঘোমটার ফাঁক দিয়ে কমলের দিকে একবার চেয়েই রমা জিভ কাটল।

পাঁচ বছরের এ অভ্যেস এক দিনে কখনও ভোলা যায়! উঠতে ফিরতে কেবল কমলদা। সিঁথির ফাঁকে সিঁদুর ঢালতে কোন কসরৎ করতে হয় নি। কমলই স্বয়ং সাহায্য করেছে। কিন্তু নতুন আলোয় নতুন সম্বোধনের সঙ্গে রমা কিছুতেই খাপ খাইয়ে উঠতে পারছে না। দু' একবার সময় মত ঘোমটা টেনে দিতে না পারলে, বড়ো জোর আশেপাশের মানুষজন বেহায়াই বলবে, তার বেশী নয়, কিন্তু এক ঘরে রাত কাটানো মানুষকে দাদা বলে ডাকলে, মুখ তুলে চাইবে কি করে। চারদিকে ঢি ঢি পড়ে যাবে যে! রাতারাতি বাস উঠিয়ে অন্য কোথাও আস্তানা বাঁধতে হবে।

মনে মনে রমা আবার প্রতিজ্ঞা করল। খুব সাবধান হবে এবার থেকে। একটি বেফাঁস কথা নয়, মাপা চালচলন, নব বিবাহিত দম্পতি নতুন ঘর বাঁধতে এসেছে, এমনি ভাব।

প্রথম নজরে রমার ভালই লাগল। গোটা চারেক বড় বড়

জানলা। কচি শিউলীগাছের ডাল একটা এদিকের জানলার গরাদ ছুঁয়ে। সদ্য কলি ফিরনো, দরজা-জানলায় আনকোরা রঙের প্রলেপ।

খাওয়াদাওয়ার বালাই নেই। সে পাট হোটেলেই চুকিয়ে এসেছে। বিছানাটা পেতে বালিশে হেলান দিয়ে রমা বসল। ক্লান্তিতে সারা শরীর ভেঙে পড়ছে। বাপের বাড়ি থেকে এমন কিছু দূর নয়, বড় জোর মাইল আট নয়েকের ব্যবধান। কিন্তু মাইল আর ক্রোশের ব্যবধানটাই কি সব? রমার মনে হ'ল এক দেশ থেকে আর একটা দেশের দূরত্ব, এক জগত থেকে আর এক জগতের। মনে করলেও আর ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। রাতের অন্ধকারে ঘরের চৌকাঠ পার হওয়া যত সহজ, বাইরের কালি মুছে ঘরের চৌহদ্দির মধ্যে ফিরে যাওয়া মোটেই তত সহজ হবে না। বাড়ির প্রতিটি লোক আঙুল দিয়ে দেখাবে ঘর ছেড়ে পালানো মেয়ের দিকে। পড়শীরা টিটকিরি দেবে! মানুষের চোখ এড়াতে নিজেকে চোখ বুজতে হবে চিরকালের মত।

এদিক ওদিক দেখে কমল বিছানার একটা কোণ ঘেঁষে বসল, খুব ক্লান্ত লাগছে, না?

রমা ম্লান হাসল, শরীরের ক্লান্তি বিশেষ নয়, যতটা মনের।

—আর ভয় নেই। ঝড় থেমে গেছে। শক্ত হাতে নৌকা বাঁধবার দিন এসেছে।

একথায় রমা কোন উত্তর দিল না। দুটো হাত আড়াআড়ি ভাবে মাথার নিচে রেখে হাই তুলল।

কমল কিছু বলতে যাবার আগেই সুখী এসে দাঁড়াল দরজার গোড়ায়, বালতিটা এগিয়ে দাও বৌদি, এইবেলা টেপা-কল থেকে জল নিয়ে আসি। একটু পরে হিন্দুস্থানী মেয়ে-মরদের লাইন শুরু হবে।

কমল উঠে বালতিটা এগিয়ে দিল, তারপর আর বসল না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বলল, বেরোতে হবে একবার।

—বেরোতে হবে? রমা ধড়মড় ক'রে উঠে বসল। এমন একটা পরিবেশে একলা থাকার কল্পনাতেই শিউরে উঠল।

—হ্যাঁ, কমল হাসল, একটা হ্যারিকেনের যোগাড় দেখতে হবে। লাইট নেই এ বাড়িতে খেয়ালই করি নি। হিসেবে ভুল হয়ে গিয়েছিল।

পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে রমা চাইল কমলের দিকে। এক আধ দিনের দেখা মানুষ নয়, বেশ কয়েক বছরের জানাশোনা। কোনদিন কোথাও একটু ভুল হয় নি লোকটার। বাঁধাধরা জীবন, পরিমিত চলাফেরা। কেবল রমাকে ভালবাসার বেলাতেই একটু গোলমাল ক'রে ফেলেছিল। বামুন কায়েতে ভালবাসা হয়তো হয়, কিন্তু বিয়ে হয় না, এ সহজ সত্যটা কিছুতেই মেনে নিতে পারে নি। দিনের পর দিন কানে ঘর ছাড়বার মন্ত্র দিয়েছে। আপনজন সব ছেড়ে, পরিচিত এলাকা ছাড়িয়ে মনের মানুষের হাত ধরে পায়ে পায়ে অনেকদূর এগিয়ে যাওয়া। প্রথম প্রথম এ সব শুনে রমা কুঁকড়ে গিয়েছিল। দুটো হাত সজোরে বুকে চেপেও বুকের দাপাদাপি বন্ধ করতে পারে নি। দিনের বেলায় প্রখর আলোতেও কেমন চাপ চাপ অন্ধকার।

কিন্তু রাতের ঘন অন্ধকারে নিঃসঙ্গ বিছানায় এ হাতছানি, ঘর ছাড়ার গুঞ্জন নতুন রূপ নিত। বাস্তবে যার চিন্তাতেই শিউরে উঠত, স্বপ্নে পাহাড়প্রমাণ বাধা ঠেলে কমলের হাত ধ'রে প্রান্তরের পর প্রান্তর পার হ'য়ে পাশাপাশি যেতে একটুও অসুবিধা হয় নি। অচেনা পথ, অজানা ভবিষ্যত, তা হোক, সঙ্গের মানুষটা তো চেনা-জানা। এমন একজনের ওপর নিজেকে ছেড়ে দিতে ভারি ভালো লাগে।

তবু পাশের লোকটা কিছুক্ষণের জন্যও সরে যাবে, একথা ভাবতেও রমার ভাল লাগল না।

—কি হবে হ্যারিকেন? রমা শুকনো গলায় বলল।

দেয়ালে ঠেস দিয়ে কমল খুব জোরে হেসে উঠল। ফাঁকা ঘরটা গম গম ক'রে উঠল সে হাসির দমকে। হাসি থামিয়ে বলল, তোমার চোখের আলোয় বাইরের পথ দেখতে অবশ্য অসুবিধা হয় নি, কিন্তু রাতের অন্ধকারও যদি কেটে যায় সে আলোয়, তা হ'লে তো আমার হ্যারিকেনের খরচই বেঁচে গেল।

এবার আসল কথাটাই রমা বলে ফেলল। একটু থেমে, আঁচল দিয়ে মুখের কিছুটা চাপা দিয়ে আস্তে আস্তে বলল, একলা আমার ভারি ভয় করবে!

—কিন্তু আর দুদিন পরে তো একলাই থাকতে হবে? সারাটা রাত, তখন?

—পরের কথা পরে ভাববো। কিন্তু আজ তা ব'লে, একলা থাকতে পারব না।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। অনেকদূর থেকে ইঞ্জিনের শব্দ আসছে। একটু দূরে, মাঠের ওপাশ দিয়ে ঘুরে গেছে রেলের লাইন। জানলায় দাঁড়ালে রেলের উঁচু জমির পাশে পাশে তারের বেড়াগুলো নজরে পড়ে। চিকচিক ক'রে কড়া রোদের ঝলকে।

হাত দিয়ে আধ-ভেজানো দরজাটা ঠেলে সুখী ঘরে ঢুকল। একেবারে কোণের দিকে জলভর্তি বালতিটা রাখতে রাখতে বলল, যা ব্যাপার দেখছি বিকেলে তোমাদের বোধ হয় রাধাবাড়ার পাট নেই। ওই এক বালতিতেই হ'য়ে যাবে। চলি বউদি।

খানিকটা এগিয়েই সুখী আবার ফিরে দাঁড়াল, কাল সাড়ে ছটায়

আসব বউদি। অত ভোরে উঠবে তো। আমার আবার পাঁচ বাড়ি কাজ, বেশিক্ষণ কড়া নাড়তে পারব না।

রমা উত্তর দিল না। উত্তর দিল কমল, ঠিক আছে, তুমি ভোরেই এস। আমরা খুব সকালে উঠি।

সুখী উঠান পার হ'য়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে কমল এগিয়ে এসে রমার কাছে ঝুঁকে পড়ে বলল খুব নিচু গলায়, সারারাত ঘুমোবই না, তা আবার ভোরে ওঠা।

—আহা, রমা মুচকি হেসে মুখ ঝামটা দিল, রাতের পর রাত জাগলে শরীর খারাপ হবে না?

তা হবে, কিন্তু মন ঠিক থাকবে। কমল আবার বিছানার এক পাশে এসে বসল।

এক হাত বাড়িয়ে রমা কমলের একটা হাত আঁকড়ে ধরল। নিজের কপালে ছোঁয়াল আঙুলগুলো। ফিস ফিস ক'রে বলল, বাড়িতে খুব হৈ চৈ পড়ে গেছে, না?

—পড়া তো উচিত। জলজ্যান্ত একটা মানুষ উধাও।

—কিন্তু বালিশের তলা থেকে আমার লেখা চিঠি তো পাবেই।

—তা পাবে, কিন্তু সমস্যার সমাধান তো হবে না তাতে, বরং সমস্যার শুরু।

—ভালই হয়েছে, জান? এ ছাড়া আর উপায় ছিল না।

—নিজের মনকে বোঝাচ্ছ বুঝি?

—উঁহুঃ, তোমাকে। রমা কমলের হাতটা আরও জোরে আঁকড়ে ধরল।

—আমাকে? কমল আরও একটু কাছে সরে এল। রমার দেহের খুব কাছাকাছি, আমাকে বোঝাবার লোক ঠিক অফিস অবধি ধাওয়া করবে।

—কে ছোড়দা?

—হুঃ, দায়িত্ব তো সমীরেরই ? তোমাদের বাড়ির লোকের কাছে তো ও বেচারীকেই জবাবদিহি করতে হচ্ছে এমন একটা বন্ধুকে বাড়িতে ঢোকাবার জন্য।

রমা উত্তর দেবার আগেই সিঁড়িতে পায়ের শব্দ। খড়ম পায়ে একজন ওপর থেকে নিচে নামছে। কাশির আওয়াজও শোনা গেল।

গায়ে মাথায় কাপড় ঠিক ক'রে রমা উঠে বসল। কমল দাঁড়াল জানলার ধারে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দরজায় টোকা। ঠক ঠক।

—কমলবাবু আছেন নাকি ?

কমল রমাকে ইসারা ক'রে দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

ভিতরের কামরাটি নেহাতই ছোট। দুটো বাক্সতেই পা ফেলার জায়গা নেই। পার্টিশনে কান রেখে রমা দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল।

হাতাকাটা ফতুয়া, সবুজ লুঙ্গী, নাতিদীর্ঘ বহরে বড় চেহারার একটি প্রৌঢ়। কদম ছাঁট চুল, গলায় আড়াই প্যাঁচের কণ্ঠির মালা।

কমল ব্যস্ত হ'য়ে উঠল, আপনাকে বসতে দেব এমন কিছু নেই এখানে।

—ঠিক আছে, ব্যস্ত হ'তে হবে না। বাড়িওয়ালা হাত নেড়ে অভয় দিলেন, আমার আরও আগে আসা উচিত ছিল মশাই। নতুন এলেন, সুবিধা অসুবিধা বলবেন মুখ ফুটে। যতদূর সম্ভব করব।

উত্তরে কমল দুটো হাত যোড় ক'রে বিগলিত হওয়ার অভিনয় করল।

—আমার আবার দুপুরবেলা একটু গড়ান অভ্যেস। খেয়েদেয়ে একটু শুয়েছি, সেই সময় বোধহয় মশাই এসে পড়েছেন ?

কথা নয়, এবারেও কমল ঘাড় নেড়ে উত্তর দিল।

—জিনিষপত্তর সব এসেছে ?

—জিনিষপত্তর আর এমন কি ? ওই গোটা দুয়েক প্যাঁটরা, বিছানা আর সংসারের টুকিটাকি জিনিষ।

—ব্যস, ব্যস, বাঙালীর সংসারে এ-ছাড়া আবার কি থাকবে মশাই, অর্গ্যান পিয়ানো ? না, ডিনার টেবিল! বলুন ? আস্তে আস্তে ছোটখাটো একটা খাট কিনে ফেলুন। নতুন সিমেণ্টের মেঝে কিনা, চট ক'রে ঠাণ্ডাটা আবার না লেগে যায়। তাড়াতাড়ি নেই, হবে র'য়ে বসে।

ভদ্রলোক কোমরের কসি খুলে গোটা দুয়েক বিঁড়ি বের করলেন, একটা মেহ্নৎ ক'রে নিজে ধরালেন, আর একটা এগিয়ে দিলেন কমলের দিকে, নিন, আসুন।

কমল আবার হাতযোড় করল, মাপ করবেন, অভ্যেস নেই।

—ওঃ, আমারই ভুল হয়েছে। আপনারা আধুনিক ছোকরা, এসব জিনিষ তো আপনাদের চলে না। কিন্তু সিগারেট তো নেই আমার কাছে ? মধু অভাবে গুড়ই চালান না হয় একদিন।

কমল বিব্রত হয়ে পড়ল, আজ্ঞে না, ভুল বুঝবেন না আমায়। কোন নেশাই আমার চলে না। পান পর্যন্ত নয়।

ভদ্রলোক দুটো চোখ কপালের মাঝ-বরাবর তুললেন, বলেন কি মশাই, খবরের কাগজের অফিসে রাতজাগা চাকরী, বিড়ি সিগারেট খান না ? তাজ্জব। কথার সঙ্গে সঙ্গেই গলার স্বর পাল্টে ফেললেন, ভালো, খুব ভালো মশাই, এসব জেনে শুনে বিষ খাওয়া। ধুম্রাসুরের কাছে তিলে তিলে নিজেকে বলি দেওয়া। বড় পাজি নেশা। দেখুন না বারো তেরো বছর থেকে পণ্ডিতমশাইয়ের চোখকে ফাঁকি দিয়ে শুরু করেছি, আজ এই তিপ্পান্ন বছর বয়স হ'ল, নেশার কমতি আছে ? ফাঁকি পরকে কি আর, নিজেকেই দিচ্ছি। সারা শীতকালটা হাঁপানীর টানে প্রাণ যায় যায়। তবু এ বদ নেশা ছাড়তে পারলাম ! হুঁ।

দরজার ফাঁক দিয়ে রমা একদৃষ্টে চেয়ে চেয়ে দেখল। দম দেওয়া কলের গানের মতন একটানা এমন ভাবে কেউ কথা বলে যেতে পারে এ ওর ধারণারও অতীত। এমন একটা মানুষের সামনে স্বল্পবাক কমলের অবস্থাটা কল্পনা ক'রে ভারি মজা লাগল রমার। জানলার গরাদ ধ'রে কমল অসহায়ের মতন চেয়ে রয়েছে। কথা বলা দূরে থাকুক, হাঁ করারই সুযোগ পাচ্ছে না।

বৌমার একলা খুব কষ্ট হচ্ছে বোধ হয়। কোন ভয় নেই বৌমা, যখনই কষ্ট হবে একেবারে ওপরে চলে যাবে। আমার স্ত্রী রয়েছে, ভারি আমুদে মানুষ, লোকজন পেলে খুব খুশী হয়। তার ওপর যশোদাও রয়েছে এখানে, আমার মেয়ে। কোন অসুবিধা নেই। ভদ্রলোক কথার ফাঁকে ফাঁকে দরজার দিকে নজর দিলেন। লক্ষ্য অন্তরালবর্তিনী।

অথৈ জলে খড়ের কুটো দেখতে পেয়েছে কমল মুখ-চোখের এমনি ভাব করল, ও বেচারীর একলা থাকা অভ্যেস নেই কিনা, ওরই কষ্ট হবে বেশী। আমার তো বেশীর ভাগ সময় বাইরে বাইরে কাটবে। এই দেখুন না, একটা হ্যারিকেন কিনতে বাইরে যেতে চাইলাম, কিছুতেই যেতে দেবে না! ভুরু কুঁচকে কমল মুচকি হাসল।

দরজার ফাঁকে রমা ঘেমে নেয়ে উঠল লজ্জায়। কি দুষ্টু লোক। অমন ক'রে বাইরের একটা লোকের কাছে ঘরের কথা বলে কখনো ?

কমলের কথা শেষ হবার আগেই ভদ্রলোক বেদম হাসতে শুরু করলেন। হাসি থেমে শুরু হ'ল কাশি। মুখের বিড়ি জানলা গলিয়ে ফেলে দিয়ে প্রাণান্তকর কাশি। দু' হাতে বুক চেপে কোন রকমে তাল সামলালেন।

চোখ দুটো ছোট ক'রে কমলের দিকে চেয়ে বললেন, না, মশাই হাসালেন আপনি। এখনো চার পহর বেলা রয়েছে, এখনই একলা

থাকতে ভয়। তবে শুনুন মশাই, এ বাড়ী যখন শুরু করি, তখন চার-দিক আরো ফাঁকা। দিনের বেলা চোখের সামনে শেয়াল ঘোরে, সাপের আস্তানা এধারে ওধারে। আমি তো সারাদিন টো টো ক'রে বেড়াচ্ছি, কোথায় ইঁট, কোথায় চুণ, কোথায় লোহা, আর আমার গিন্নী একলা কাটিয়েছে দিনের পর দিন। দরকার হ'লে মিস্ত্রী খাটিয়েছে, ঝগড়া করেছে সীমানার খুঁটি নিয়ে। পথ চলতি লোক পর্যন্ত ভয়ে থ।

কি ভেবে আচমকা কথা থামিয়ে এগিয়ে গেলেন চৌকাঠের দিকে, কমলের দিকে ফিরে বললেন, চলি মশাই এখন। রোজই একবার ক'রে খোঁজ ঠিক নেবো। আপনি হ্যারিকেনের যোগাড় দেখুন একটা। আমার বাড়তি একটাও নেই, থাকলে আজকের মতন কাজ চালিয়ে নিতে পারতেন।

দু' পা গিয়েই আবার ফিরে এলেন। কমলের কানের কাছে মুখ নিয়ে আস্তে আস্তে বললেন, হঁ্যা, আর একটা কথা, নতুন লোক আপনি, আপনাকে বলা মশাই আমার কর্তব্য। মোড়ের দিকে যে 'দীনবন্ধু ভাণ্ডার' আসবার সময় দেখেছেন না, খুব সাবধান, পাই-পয়সার জিনিষ কিনবেন না ওখান থেকে। ব্যাটা একেবারে জল্লাদ। হাতে দাঁড়িপাল্লা নয় মশাই, করাত, একেবারে পেঁচিয়ে কাটে। সব সওদা করবেন 'গণেশালয়' থেকে, দামেও সস্তা, জিনিষও ভাল।

সিঁড়িতে খড়মের আওয়াজ মিলিয়ে যেতেই রমা সামনের ঘরে এসে দাঁড়াল। কপালে ঘামের অজস্র ফোঁটা, দুটি গাল লাল, রাগে না গরমে বোঝা মুসকিল। একেবারে কমলের সামনাসামনি এসে বলল, কি লোক গো তুমি ?

—সে কি, এখনও চব্বিশ ঘণ্টা কাটে নি এর মধ্যে অবিশ্বাস !

—আহা, নিজে আমার নামে লোকের কাছে যা নয় তাই বলবে।

—কেন মিথ্যেটা কি বলেছি? তুমি বল নি একলা থাকতে পারবে না?

—বলেছি, তোমার কাছে বলেছি। বাইরের দশজনের সামনে সেকথা জাহির করতে বলেছি?

—আরে ভালোই তো হ'ল। কেমন সঙ্গী জুটে যাবে একজন। ওদের আশ্রয়েই তো থাকা। অফিস শুরু হ'লে, একলা থাকতে হবে না। মা কিংবা মেয়ে ঠিক থাকবে সঙ্গে।

—আমার বাপু বড় ভয় করে।

—কেন?

—কি কথায় কি উত্তর দিয়ে ফেলব, শেষকালে কেলেঙ্কারীর একশেষ।

—কিচ্ছু ভয় নেই। নতুন বিয়ে, নতুন শহরে এসেছ। গোলমাল দেখলেই চোখে কাপড় চাপা দিয়ে ফোঁস ফোঁস ক'রে কাঁদতে শুরু করবে। ব্যস, সাতখুন মাপ।

রমা উত্তর দেবার আগেই সিঁড়িতে আবার পায়ের শব্দ। গিন্নীই বোধ হয় নেমে আসছেন এইবার।

কমল মনে মনে একবার আউড়ে নিল। মায়ের বয়সী, মাসীমা ব'লে ডাকলেই বা ক্ষতি কি! এক সঙ্গে বাস করতে হবে যখন, চলনসই একটা কুটুম্বিতা করে নিতে হবে বৈকি। অজানা জায়গায় কখন কি দরকার পড়ে ঠিক আছে?

এগিয়ে দরজার কাছ বরাবর গিয়েই কমল থতমত খেয়ে গেল।

মা নয় মেয়ে। রমার চেয়ে বছর ছয়েকের বড়ই হবে, কিন্তু মেদের ভার বয়সটাও যেন বাড়িয়ে দিয়েছে। হাল্কা সবুজ রঙের

শাড়ী, লাল পাড়। নক্‌শা কাটা ছিটের ব্লাউজ। ঠোঁট দুটি পানের রসে টইটম্বুর। কপালে আধুলি পরিমাণ সিঁদুরের টিপ, সীমন্তেও চওড়া সিঁদুরের বহর। মুখের কোণে, গলার খাঁজে, চুলের পাশে পাউডারের প্রলেপ। দ্রুত প্রসাধন সারার চিহ্ন।

ইসারায় রমাকে এগিয়ে আসতে ব'লে কমল পিছিয়ে গেল দেয়ালের দিকে।

—মার শরীর খারাপ। বাবা পাঠিয়ে দিলেন। আপনার নাকি একলা ঘরে থাকতে ভয় করে?

মেয়ের কথার ধরণ প্রায় বাপের মতন! তবে একটু আদুরে গলার টান। বাপমায়ের একটি মাত্র মেয়ে, চলন বলনেই বেশ বোঝা যায়।

রমা উত্তর দিল না। মুচকি হাসল শুধু। হাত দিয়ে বিছানার চাদরটা ঝেড়ে বলল, বসুন ভাই।

—আমাকে আবার আপনি আজ্ঞে কেন। যা না বয়স তার ডবল দেখায় মাংসের চাপে। রোগা হবার জন্য কম চেষ্টা করেছি ভাই? ঢাকুরিয়ায় থাকতে সকাল বিকেল লেকের ধারে পাক দিয়েছি। উনিও সঙ্গে থাকতেন। এক আধ দিন নয়, পুরো আড়াই মাস। হুঁ, উনি পাতলা হয়ে গেলেন কিন্তু আমি যে কে সেই।

রমা আপাদমস্তক একবার নিরীক্ষণ ক'রে বলল, আহা, আপনি আবার মোটা কোথায়? মোটা দেখেছি আমাদের বাপের বাড়ির পাড়ায়। বাব্বা! দশমণি লাস। চলতে ফিরতে পারে না।

কথাবার্তার তোড়ে এতক্ষণ ফাঁক পায় নি কমল, এবার সুযোগ বুঝে রমার দিকে চেয়ে বলল, ভালই হ'ল, তোমার গল্প করার লোক যখন জুটে গেছে, আমি দোকানটা একবার সেরে আসি।

কথা শেষ ক'রে আর দাঁড়াল না কমল। চৌকাঠ পার হয়ে উঠানে পা দিল। জানলার পাশ দিয়ে যেতে যেতে ঘরের মধ্যে চোখ ফিরিয়ে দেখল, রমা একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে। ডাগর দুটি চোখ মমতায় আরো কোমল।

কমল গেট পার হয়ে যেতেই যশোদা খিল খিল ক'রে হেসে উঠল, ক' মাস ?

রমা থতমত খেয়ে গেল, কিসের ক' মাস ?

—না, বলছি, বিয়ে হয়েছে ক'মাস ?

—কেন বলুন তো ?

—চাউনির ঘটা দেখে জিজ্ঞাসা করছি। বাব্বা, কর্তা দোকানে যাচ্ছেন তাতেই গিন্নীর ছলছল চোখ, যেন সোয়ামী বিদেশযাত্রা করছেন। নবযৌবনে এমনিই হয় বটে।

—আহা, আপনি বুঝি বুড়ী হয়ে গেছেন ?

—সাত বছর বিয়ে হয়েছে, বুড়ী ছাড়া কি। আপনার বছরখানেক হয়েছে বোধ হয় ?

—বছরখানেক ? রমা মাথা নিচু ক'রে মিষ্টি হাসলো, না, মাসখানেক।

—মাসখানেক, বলেন কি, যশোদা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল, এখন তা হ'লে পৃথিবী নন্দনকানন ঠেকছে বলুন ?

এই ধরণের কথাবার্তা বেশিদূর এগোতে দিতে সাহস হ'ল না। কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে শেষকালে সাপের ফণায় হাত ঠেকবে।

বরাতই বলতে হবে রমার, যশোদাই কথা পাল্টাল, কর্তা কাজ করেন কোথায় ?

—কালান্তর অফিসে।

—কালান্তর ?

—হ্যাঁ, ওই যে দৈনিক খবরের কাগজ ?

—খবরের কাগজ অফিসে কাজ করেন ? যশোদা জোড়া ভুরু বাঁকিয়ে ফেললো, আপনার কর্তা লেখক বুঝি ?

—না, লেখক নন।

—তবে, লেখক না হ'লে বানিয়ে বানিয়ে অত পাতা জুড়ে আজগুবি খবর কেউ লিখতে পারে ? মা গো মা, পড়ে হেসে বাঁচি না। কোথায় গাইবান্ধায় একটি মেয়েছেলের চারটি সন্তান প্রসব, রামপুরহাটে বেগুনের দর নিয়ে খুনোখুনি ; এতও মাথায় আসে। যশোদা দেয়ালে হেলান দিয়ে হাসতে শুরু করল।

দু'চার মিনিট। রমা একটি কথাও বলতে পারল না। পাস করা মেয়ে নয় বটে, কিন্তু একেবারে আকাট মূর্খও নয়। বাড়িতে পড়াশোনা করেছে। খবরের কাগজ মানে যে এই সব উদ্ভট ধরণের ব্যাপারই নয়, এটুকু বোঝবার মতন বুদ্ধি রাখে।

যশোদার হাসি থামলে, রমা আস্তে আস্তে বলল, খবরের কাগজের অফিসে আরও সাত রকম কাজ থাকে তো। সেই সব করে বোধ হয়।

ঠোঁটের পাশে গড়িয়ে আসা পানের রস শাড়ীর আঁচল দিয়ে সযত্নে মুছে নিল। দু' হাত দিয়ে কপালের ওপর থেকে চুলগুলো সরাতে সরাতে বলল, ভালই হ'ল, একলা একলা দিন যেন কাটতে চায় না। তবু বিকেলের দিকটা গল্প ক'রে কাটাতে পারব। আপনার দুপুরে ঘুমোন অভ্যেস নেই তো ?

—না, দুপুরে ঘুমিয়ে পড়লে আমাকে সারারাত জেগে থাকতে হয়।

রমার কথা শেষ হবার সঙ্গেই যশোদা মুচকি হাসল, তা হ'লে তো দুপুরে আপনার একটু গড়িয়ে নেওয়াই উচিত, সারারাত নইলে জেগে থাকবেন কি করে ?

প্রথমে রমা কথাটার মানে বুঝতে পারে নি। খেয়ালই করে নি। কিন্তু একটু ভাবতেই ওর গাল আর কান দুটো রাঙা হয়ে উঠল। মাথা নিচু ক'রে আঙুলের নখ খুঁটতে খুঁটতে বলল, যান, ভারি ইয়ে আপনি। মোটেই সারারাত জাগি না।

যশোদা আর একবার হাসিতে ভেঙে পড়বার মুখেই বাধা পেল। উঠানে পায়ের শব্দ। দরজার কাছে কমলকে দেখা গেল। এক হাতে আনকোরা হ্যারিকেন, অন্য হাতে গোটা দুয়েক ঠোঙা।

কমল ঘরে ঢুকতেই যশোদা পাশ কাটিয়ে উঠে দাঁড়াল, আজ চলি ভাই, কাল সকালে একবার এসে খোঁজ নিয়ে যাবো।

যশোদা বেরিয়ে যেতে কমল দরজায় খিল দিয়ে দিল। ঠোঙাগুলো বিছানার ধারে রেখে রমার পাশে বসে পড়ে জিজ্ঞাসা করল,—কি খবর, বেফাঁস কিছু বলে ফেলো নি তো?

—বলবার অবকাশ পেলে তো!

—ওঃ, এ বিষয়ে বাপ আর মেয়ে বুঝি সমান। একলাই একশ।

—তা কি কথাবার্তা হ'ল এতক্ষণ ধ'রে?

রমা খিল খিল ক'রে হেসে উঠল, কি বলে জান? তুমি নাকি খবরের কাগজে যত আজগুবি খবর বানিয়ে বানিয়ে লেখ।

—তার মানে?

—মানে, যারাই খবরের কাগজের অফিসে চাকরী করে, তাদেরই না কি ওই কাজ।

—মন্দ বলে নি। কমল কথাগুলোয় খুব মন দিল না। কাগজের ঠোঙাগুলো সাবধানে খুলে রমার সামনে রাখল। মুড়ি, মুড়কী আর সন্দেশ।

—ওমা, এসব আনতে গেলে কেন? রমা সত্যিই অবাক হয়ে গেল।

—চাঁদের আলো আর পাপিয়ার তান খাইয়ে রাখব এমন প্রতিজ্ঞা তো আর সত্যিই করি নি। সেই কখন খেয়েছ, খিদে পাবার কথা বৈ কি।

—উহুঁ, মোটেই না। বেলা দুটোয় খেয়ে মানুষ এখনি আবার খেতে পারে নাকি।

—হুঁ, আমি পারি। একটু থেমে মুড়ি মুড়কী ভাগ ক'রে দিতে দিতে কমল বলল, বোধ হয় তুমিও পার। নাও, আরম্ভ কর।

বিকেলের পড়ন্ত রোদ জানালার গরাদ দিয়ে দেয়ালের ওপর এসে পড়েছে। স্বল্প হাওয়ায় কাঁপছে শিউলীর ডাল। ঘরে ফেরা কাকেদের বিশ্রী কর্কশ আওয়াজও এ পরিবেশে খুব তিক্ত মনে হচ্ছে না।

খাওয়া শেষ ক'রে কমল কাগজের ঠোঙাগুলো জানলা দিয়ে বাইরে ফেলে দিল।

কোঁচার খুটে হাত মুছতে মুছতে বলল, কাল অবশ্য সাত-সকালে হুড়োহুড়ি করার দরকার নেই, তবুও দোকানে ব'লে এসেছি এক বস্তা কয়লা দিয়ে যাবে। এখানে একটা সুবিধা, চালের কণ্ট্রোল নেই। কাছেই বাজার। রেললাইনের ওধারে। কাল সকালে উঠে ওসব ভাবা যাবে।

রমার গাল বোঝাই মুড়ি আর মুড়কী। ঘাড় নেড়ে দায়সারা উত্তর দিল। খাওয়া শেষ ক'রে উঠে পড়ল। ভাল ক'রে মুখ হাতই ধোয়া হয় নি এখনও। চুলের মধ্যেও যেন বালি কিচ কিচ করছে। এক বালতি জল সম্বল। তা হোক, ওর মধ্যেই ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে নিতে হবে।

খয়েরী রঙের নতুন একটা শাড়ী পরে সযত্নে চুল আঁচড়ে, কপালে ছোট্ট একটি সিঁদুরের ফোঁটা দিয়ে রমা যখন বাইরের ঘরে পা দিল,

তখন বাইরে সন্ধ্যার ছায়া নেমেছে। যোগাড়যন্ত্র ক'রে কমল নতুন হ্যারিকেনটা জ্বালিয়ে ফেলেছে। তাকের ওপর জুতসই একটা জায়গায় বসিয়েও দিয়েছে। দুটো হাত দিয়ে জানলার দুটো গরাদ চেপে ধ'রে একদৃষ্টে বাইরের দিকে চেয়ে কি দেখছে।

পা টিপে টিপে রমা পিছনে গিয়ে দাঁড়িয়ে সোহাগ-তরল গলায় বললে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একমনে কার কথা ভাবা হচ্ছে শুনি ?

কমল ঘাড় ফেরাল না। হেসে বললে, দৃষ্টির পিছনেও যিনি, সামনেও তিনি। আন্দাজে ঠাওর ক'রে রমার একটা হাত আঁকড়ে ধ'রে তাকে কাছে টেনে আনল।

—এই, কি হচ্ছে, কে কোথা দিয়ে দেখে ফেলবে।

কমল আবার হাসল, এখানকার লোক শুধু দেখেই ফেলবে, বাধা দিতে পারবে না।

—বা রে, তা ব'লে দিন দুপুরে বেয়াদবি করবে তুমি ? নিজেকে সরিয়ে নেবার ছল ক'রে রমা কমলের আরো গা ঘেঁষে দাঁড়াল।

কমল আঙুল বাড়িয়ে পশ্চিম আকাশের দিকে দেখাল। ঘন বাঁশ ঝাড়ের পিছনে রক্তের ঝলক। গাছে পাতায় রঙের ছিটে।

'অস্তে গেলা দিনমণি, আইলা গোধূলি,' কমল সুর ক'রে বলল।

—তবে আর কি ! আমার আর বিছানাপত্তর ঠিক ক'রে কাজ নেই, কৃত্রিম রাগে রমা ভুরু কোঁচকাল। অনেক দিন ধরে যেন কমলের সংসার করছে এমনি হাবভাব।

কমল মুচকি হাসল। বাধা দিল না। চুপচাপ জানলায় দাঁড়িয়ে দেখলো বাইরের দিকে চেয়ে। শান্ত নিরুত্তর পরিবেশ। ট্রাম বাসের কোলাহল নেই, জনতার চীৎকার নয়। দয়িতাকে নিয়ে নীড় বাঁধার উপযুক্ত জায়গা।

কিন্তু জীবনের শুরু। আর ছেলে-খেলা নয়। প্রেমের নরম বুলিতে শুধু মন ভিজানই নয়। কঠিন মাটিতে দাঁড়াতে হবে পাশাপাশি। অনেক ঝড়-ঝাপটার মুখোমুখি। কিন্তু তবু তার সব চেয়ে বড় সান্ত্বনা, মনের মানুষকে ঘরের মানুষ করতে পেরেছে।

মাঝরাতে কি একটা শব্দে রমার আচমকা ঘুম ভেঙে গেল।

নতুন জায়গা, তার ওপর গাছপাতার শর শর আওয়াজ। অস্পষ্ট মনে পড়ল বাপের কথা, ভায়েদের মুখ, বউদির বিরক্তিমাখা দু' চোখের দৃষ্টি। মাত্র কয়েক লাইনের একটা চিঠি। এক ঝাঁক কালির আঁচড়। কিন্তু বহুদিনের সম্পর্ক কাটিয়ে ওঠার পক্ষে তাই তো যথেষ্ট। খাতা ছেঁড়া একটা কাগজ, কিন্তু দুটো সংসারের মাঝখানে বিরাট এক প্রাচীরের ব্যবধান সূচিত হ'ল তাতেই। ইচ্ছা করলেও, দু' চোখের জলে অক্ষরগুলো ধুয়ে মুছে দিলেও হয়তো সে সংসারে রমার আর পিছু হেঁটে ফিরে যাওয়া চলবে না।

না যাক, সে সংসারে ফিরে যেতেও চায় না রমা। শুধু ছোড়দার জন্য মনটা কেমন করে। একদণ্ড রমাকে ছাড়া চলত না তার। বউদির ভয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে পুরোনো খবরের কাগজ জ্বেলে চা ক'রে দেওয়া, ঘণ্টার পর ঘণ্টা আবোল তাবোল বকা, প্রথমে শুধু দুজনে, তারপর এল কমল। সপ্তাহে অন্ততঃ তিন দিন। রমার বাপের সঙ্গে লোকদেখান দু' চারটা কথা বলেই কোণের ঘরে এসে জুটত। সাহিত্য রাজনীতি থেকে শুরু ক'রে আধুনিক সমস্ত সমস্যা নিয়ে তুমুল তর্ক। রমা মাঝে মাঝে যোগ দিত, কিন্তু বেশি সময়টা হাঁটুর ওপর মুখ রেখে চুপচাপ শুনতো ব'সে ব'সে। ভারি চমৎকার কথা বলার ভঙ্গী কমলের। এক হাতে কোঁকড়ানো চুলের মুঠি ধরে ঠোঁট

কুঁচকে মিষ্টি হেসে বড় বড় বিষয় নিয়ে অনর্গল বকে যেত। ক্লান্তি নেই, বিব্রত ভাব নেই, তর্কে একনিষ্ঠ, পরে অবশ্য প্রেমেও।

রমা কনুয়ে ভর দিয়ে মাথাটা উঁচু করল। পাশাপাশি দুটো বালিশ। কিন্তু কমলের মাথা নিজের বালিশ ছেড়ে রমার বালিশে এসে পড়েছে। কোঁকড়ানো চুলের রাশ কপালের ওপর। ম্লান চাঁদের আলোয় খুব বিষন্ন দেখাচ্ছে কমলের মুখ। গভীর নিঃশ্বাসের সঙ্গে বুকটা ওঠানামা করছে। ঘন চোখের পাতা, হঠাৎ দেখলে সুর্মা আঁকা ব'লেই ভুল হয়। খাঁটি মানুষ, কোথাও এতটুকু ভেজাল নেই। নির্ভর করা চলে, এমন মানুষের হাত ধ'রে তেপান্তরের গাছের তলাতেও বাসা বাঁধা যায়।

রমা সরে এসে কমলের বুকের কাছ ঘেঁষে মাথা রাখল। একটা হাত দিয়ে নিবিড় ক'রে জড়িয়ে ধরলো তার দেহ।

গভীর রাতে আবার ঘুম ভেঙে গেল রমার। সিঁড়িতে ভারী জুতোর আওয়াজ। কড়ানাড়ার শব্দ। হেঁড়ে গলায় সুর ক'রে ক'রে গান। সেই সঙ্গে মেয়েলী গলার কথাও শোনা গেল। চাপা কণ্ঠস্বর। প্রথমে রমার মনে হ'ল স্বপ্নই হবে বুঝি। সারাদিনের এলোমেলো চিন্তার সঙ্গে খাপ খাওয়ানো এলোমেলো স্বপ্ন। কিন্তু তারপরই খেয়াল হ'ল। চোখ চেয়ে বুঝি স্বপ্ন দেখে মানুষ। স্বপ্ন নয়, ওপর তলায় কথাবার্তা চলেছে। শিসের শব্দ আবার গানের আওয়াজ। এক সময়ে অস্পষ্ট হ'য়ে এল সব কিছু। ওপরের কলগুঞ্জন, বাইরের শিউলির ডালের শির-শিরানি, দূরের ঝিঁঝির ডাক,—সব। রমার চোখ দুটো ক্লান্তিতে বুজে এল। আঁচলটা ভাল ক'রে গায়ে জড়িয়ে আরও সরে এল রমা—আর একটা যৌবনপুষ্ট শরীরের উত্তাপের সান্নিধ্যে। তারপর একটানা ঘুম—বিরতিহীন।

কড়ানাড়ার আওয়াজে সোমনাথবাবুর ঘুম ভাঙলেও ওঠবার উপায় নেই। কোণে দাঁড় করানো লাঠিটা মেঝের ওপর পড়ে গিয়েছে। ওই লাঠিটি নির্ভর, নয়তো এই আধ অন্ধকারে দেয়াল হাতড়ে যেতে ভরসা হয় না। এঁটো বাসন জড়ো করা ঘরের কোণে, পা লেগে গেলেই সর্বনাশ।

আস্তে আস্তে র‍্যাপারটা মুড়ি দিয়ে সোমনাথবাবু চুপচাপ বিছানার ওপর উঠে বসলেন। দুটো হাত নিজের ব্যাধিগ্রস্ত পা দুটোর ওপর বুলালেন। খুব সন্তর্পণে, সদ্যোজাত শিশুর কোমল দেহস্পর্শ করছেন এমনি ভাবে। ঠিক হাঁটুর নিচেয় অসহ্য যন্ত্রণা। একটু জোরে হাত লেগে গেলেই কাতরাতে হয়। মনে হয় হাড়গুলোই বুঝি মট মট ক'রে গুড়িয়ে গেল। এ রোগ সারবার নয়। অবশ্য তেমন চিকিৎসাই বা হ'ল কোথায়! পাড়ার অনাথ কবিরাজ। না জানে শাস্ত্র, না আছে পসার। টিমটিম করছে দোকান। সিঁড়ির নিচে এক ফালি ঘর। ডাকেও তেমনি লোক। যার তিন কুলে কেউ নেই, কিংবা এ পারে থাকার মেয়াদ যার ফুরিয়ে এসেছে। একটাকা দর্শনী হাতে পায়ে ধরলে আট আনাতেও নামে। চার বছরের ওপর তাঁর চিকিৎসায় রয়েছেন সোমনাথবাবু। উপকার তো নয়ই, বরং খুঁটিয়ে দেখলে অপকারই হয়েছে বোধ হয়। আগে তবু সামনের রাস্তাটায় পায়চারি করতেন। লাঠিতে ভর না দিয়েই দিব্যি যেতে পারতেন এ ঘর থেকে ও ঘরে। একটু দেরী হ'ত এই যা। কিন্তু আজকাল তাও বন্ধ। মাটিতে পা ফেলতে গেলেই সারা শরীর টনটন ক'রে ওঠে। সম্প্রতি ডাক্তার সেনের চিকিৎসায় রয়েছেন। কিন্তু কই, গাদা গাদা ওষুধ খেয়েও তো কোন উপকার পাচ্ছেন না।

এবারে পা ছেড়ে সোমনাথবাবু নিজের কপাল চাপড়ালেন। বরাত, নইলে আর এমনটি হবে কেন? জোয়ান মদ্দ দুই ছেলে। যেটি

রোজগার করে, সেটি বাপের দিকে ফিরেও চায় না। আর যেটি অপদার্থ, বাড়িতে ব'সে ব'সে শুধু কষ্টের ভাত ধ্বংস ক'রে যাচ্ছে, সেটির কারুর দিকে ফেরা না ফেরা সমান। তার ওপর মাছের কাঁটার মতন ওই এক সোমত্ত মেয়ে আটকে রয়েছে গলায়। ও মেয়ে যে পার হবে এমন ভরসা কম।

বাইরে কড়ানাড়ার আওয়াজ আরও জোর। সঙ্গে সঙ্গে ঝিয়ের গলার স্বরও শোনা গেল, এ কিরে বাবা! কি কাল ঘুম, আধ ঘণ্টার ওপর কড়া নেড়ে চলেছি, মানুষজনের সাড়া নেই।

মেয়ের নাম ধ'রে চেঁচিয়ে ডাকতে গিয়েই সোমনাথবাবু থেমে গেলেন। বাইরে পা ঘষড়ানির আওয়াজ পাওয়া গেল। যাক, আর ডাকতে হবে না। সংসারের চাকা ঘুরতে শুরু করবে। চেঁচামেচির হৈ চৈ সকাল থেকে রাত দশটা পর্যন্ত। ছোটছেলে বাড়ি ফিরে না আসা অবধি। নিষ্কর্মার ধাড়ী, কাজের সঙ্গে খোঁজখবর নেই, অথচ তারই ফিরতে রাত হয় সবচেয়ে বেশি।

বরাত! আবার কপাল চাপড়াতে গিয়েই সোমনাথবাবু মাঝপথে থেমে গেলেন। মেয়ে তো নয়, ছেলের বউয়ের গলা। আশ্চর্য, এত সকালে প্রমীলা তো কোনদিন ওঠে না। ওঠে হয়তো, কিন্তু নিচে নামে না সাত সকালে। দরকার হ'লে ওপর থেকে ঝিকে হুকুম চালায়।

আশ্চর্য বাড়ি বাবা, সবাই জেগে ঘুমোবে। পাছে উঠে দরজা খুলতে হয়, সবাই মটকা মেরে পড়ে থাকে। ছাই ফেলতে ভাঙ্গা কুলো, আমি আছি দাসীবাঁদী। দরজা খোলার শব্দের সঙ্গে প্রমীলার গজরানিও বাড়তে লাগল। বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে কথাবার্তা। একটা মানুষের রোজগারে এতবড় সংসার চলেছে, আর সবাই ঠুঁটো জগন্নাথ সে ইঙ্গিত করতেও ছাড়ল না।

সুর একটু নরম হ'তে সোমনাথবাবু খুব আস্তে ডাকলেন, বউমা।

ডাকের অনেকক্ষণ পরে প্রমীলা শ্বশুরের চৌকাঠে এসে দাঁড়াল। উস্কোখুস্কো চুল, সিঁদুর সারা কপালে মাখানো, দুটি চোখে তন্দ্রার ছাপ।

—ডাকলেন? স্বরে রুক্ষতার আমেজ।

—রমা ওঠে নি এখনও! সোমনাথবাবুর গলা আরও মৃদু।

—ওঠে নি তো দেখতেই পাচ্ছেন, এই কথা বলবার জন্য ডাকের ওপর ডাক?

সোমনাথবাবু আড়চোখে একবার প্রমীলাকে দেখে নিলেন। ভক্তিশ্রদ্ধা তো দূরের কথা, শ্বশুর ব'লে সামান্য সমীহও নয় বরং পঙ্গু শ্বশুর সংসারের একটা আবর্জনা, প্রতি কথায় সেটা জানিয়ে দিতে মোটেই দ্বিধা করে না। কিন্তু স্বর একটুও চড়ালেন না সোমনাথ-বাবু। বিরক্ত হয়েছেন মুখেচোখে তার সামান্য ভাবও ফোটালেন না। যে গরু দুধ দেয় তার চাঁটও খেতে হয় মাঝে মাঝে। বাষট্টি বছর সংসারে ঘোরাফেরা ক'রে এ কথা আর নতুন শিখতে হবে না তাঁকে।

প্রমীলার কথা শেষ হতেই সোমনাথ বাবু বালিশ চাপড়ে উত্তেজিত হ'য়ে উঠলেন, নবাব-নন্দিনী কি এখনও পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছেন? বউমা, এক বালতি জল নিয়ে হুড়হুড় ক'রে ঢেলে দাও গায়ে। সম্ভব হলে জল ঢালার কাজটা সোমনাথবাবু নিজেই যেন করেন মুখে চোখে এমন একটা ভাব দেখালেন।

খুশীই হলো প্রমীলা। শ্বশুরের কপট অভিনয়টুকু ধরার মত মেজাজ হয়তো ছিল না, কিংবা থাকলেও এ নিয়ে তর্ক করার প্রবৃত্তি ছিল না। তবু বলতে ছাড়ল না, তা হলে আর মাথা নিয়ে ঘোরাফেরা করতে হবে না এ বাড়িতে। ব'লে এতেই উঠতে বসতে ননদের খোঁটা শুনতে শুনতে প্রাণান্ত।

সোমনাথবাবু প্রমীলার কথায় আমলই দিলেন না,—না, না, দরজা ঠেলে জাগাও বউমা। অভয়াপদর অফিসের ভাত। তোমার এই কাহিল শরীর, কতবার ওঠা নামা করবে?

এতক্ষণে হাসি ফুটল প্রমীলার মুখে। মিথ্যে হোক, যাই হোক, তবু যে মুখ ফুটে শ্বশুর দরদ দেখিয়েছেন, এই যথেষ্ট। বাড়ির লোকেরা তো ফিরেও চায় না একবার। অম্বলের ব্যথায় ছটফট্ করার সময় কেউ একবার খোঁজ নিতেও যায় না। না ননদ, না দেওর। সবাই যে যার তালেই থাকে।

ফিরে গিয়ে প্রমীলা ননদের ঘরের সামনে দাঁড়াল। প্রথমে আস্তে টোকা, তারপর শিকলের ঝনঝন শব্দ। মরা মানুষ জেগে ওঠে সে আওয়াজে, কোথায় লাগে ঘুমন্ত।

—ঠাকুরঝি, ঠাকুরঝি, হুঁ, কপট নিদ্রা স্বয়ং বিষ্ণু এলেও ভাঙাতে পারবেন না, আমি তো কোন ছার। এসব মানুষকে জব্দ করা ছাড়া আর কি! চার পহর বেলা গড়িয়ে এলো, এখনও আঁচই পড়ল না উনানে। চা চুলোয় যাক, সময়ে মানুষের ভাত পেলে হয়।

আর একবার সজোরে ধাক্কা দিতে যাওয়ার মুখেই প্রমীলা বাধা পেল। দেওর সমীর এসে দাঁড়িয়েছে পাশে, সরো বউদি, আমি দেখছি। কাল রাত্তিরেই রমা বলছিল শরীরটা খারাপ। জ্বরজ্বারি হওয়াটাও আশ্চর্য নয়। নয়তো এত বেলা অবধি ঘুমোবার মেয়ে তো রমা নয়।

—তুমি দেখ ঠাকুরপো। তোমাদের সোহাগী বোনকে বিছানা ছাড়ান আমার বাপের সাধ্য নেই। প্রমীলা দরজা ছেড়ে ওপরে গিয়ে উঠল। সাত সকালে কাঁচা ঘুমটা ভেঙে যাওয়ায় মেজাজটাও খারাপ। বিছানায় আর একটু গড়িয়ে না নিলে শরীরের এ ম্যাজম্যাজে ভাবটা কাটবে না।

বউদি সরে যেতেই সমীর আস্তে আস্তে দরজায় হাত চাপড়াল, রমা, এই রমা, উঠে পড় লক্ষ্মী বোনটি আমার। শীগগির ওঠ, এখনই বাবা চেঁচামেচি শুরু করবেন।

আশ্চর্য, কোন সাড়াশব্দ নেই। চুপচাপ।

সমীর একটু জোরে ঠেলা দিতেই খুলে গেল দরজাটা। অন্ধকার ঘর। সমীর এগিয়ে গিয়ে পুবদিকের জানলাটা খুলে দিল। একেবারে কোণের দিকে বিছানা পাতা। গায়ের ছেঁড়া চাদরটা এলোমেলো ভাবে পড়ে রয়েছে। মশারীটা দেওয়ালের কোণে জড় করা। তাহলে ঠিক সময়েই রমা উঠে পড়েছে। উঠেই যদি পড়েছে, গেলো কোথায়! অন্ততঃ যেখানেই থাকুক, ঝি আসার জন্য দরজাটা নিশ্চয় খুলে রাখত।

এ পাশে বাথরুম। অবশ্য ওই নামেই। ভাঙা দরজা খাড়া ক'রে আবরু বাঁচবার চেষ্টা। ইটের পাঁজর বের করা চৌবাচ্চা। মুখ ধোয়া স্নান সারা সবই ওখানে। পায়খানা আর একটু দূরে। তার খোলা দরজাটা এখান থেকেই দেখা যাচ্ছে। এ পাশ থেকে দেখবার কোন অসুবিধা হ'ল না। বাথরুম খালি। সমীর উঠে এসে বাপের দরজায় দাঁড়াল। আধময়লা র‍্যাপার গায়ে জড়িয়ে সোমনাথবাবু গুণ গুণ ক'রে ঠাকুরদেবতার নাম জপ করছেন। ওপারে যাবার পাথেয়। সমীরের পায়ের আওয়াজে মুখ না ফিরিয়েই বললেন, কিরে, আজ তোরা চা-টা দিবি, না ও পাট তুলে দিলি!

সমীর কোন উত্তর না দিয়ে আবার রমার ঘরের কাছে এসে দাঁড়াল। আর একটা যাবার জায়গা আছে। ওপরে দাদার ঘরে। ছাতের এ কোণে ছোট্ট ঘর। দাদা আর বৌদির নিজস্ব। ওপরে কারুর বড় একটা ওঠার দরকার হয় না। ওঠেও না কেউ। রমা উঠবে এ আশা অত্যন্ত কম, বিশেষ ক'রে এই সকাল বেলা।

চৌকাঠ ডিঙ্গিয়ে সমীর রমার ঘরে ঢুকে পাতা বিছানার ওপর বসে পড়ল। ঘরের দরজা বন্ধ। গেল কোথায় মেয়েটা। সমীরের নিজের আলাদা কোন ঘর নেই। ওপরে ওঠবার সিঁড়ির নিচেটায় পর্দা টাঙিয়ে বন্দোবস্ত ক'রে নিয়েছে। শুধু কষ্টে শোয়াটুকু চলে। নড়বার উপায় নেই। বিছানা ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই পর্দা সরিয়ে সমীর ওটাকে বসবার ঘর ক'রে ফেলে। এখান থেকে দিব্বি দেখা যাচ্ছে তার আস্তানা। স্তূপীকৃত পুরানো খবরের কাগজ, ছেঁড়া মাসিক পত্রিকার বোঝা, গোটা কয়েক ওষুধের শিশি। মানুষজনের চিহ্ন নেই। তবে ?

চোখ ফিরিয়েই সমীর চমকে উঠল। দরজার পাশে এ কোণে জোড়া ইঁটের ওপর রমার রঙচঙে টিনের একটা তোরঙ্গ ছিল। সুসময়ে সমীরই কিনে দিয়েছিল। রমার ইহজীবনের যা কিছু সম্বল সবই জমা থাকত সেটাতে। ইঁটগুলো এলোমেলোভাবে ছড়ান। তোরঙ্গ নেই। লাফিয়ে উঠতে গিয়েই সমীরের হাত লেগে মাথার বালিশটা কোণের দিকে ছিটকে পড়ল। ভাঁজ করা ছোট কাগজ। খাতার পাতা ছেঁড়া।

এক নিঃশ্বাসে সমীর সবটা পড়ে ফেলল। চার পাঁচ লাইন। গোটা গোটা অক্ষরে রমার হাতের লেখা। একবার দুবার ক'রে অনেকবার সমীর পড়ল। চিঠিটা ওকেই লেখা।

ভাই ছোড়দা,

এ চিঠিটা তোমাকে লিখলাম, কারণ আর কাউকে এ চিঠির লেখার কোন মানেই হয় না। এ সংসারে আমার থাকা না থাকা বাকি সকলের কাছে অবান্তর। কমলদার সঙ্গে ঘর ছাড়লাম ঘর বাঁধবার আশায়। সমাজের চলতি বিধানে পরস্পরকে কাছে পাবার সম্ভাবনা ছিল না, তাই বিধানকে ডিঙোবার প্রয়োজন হ'ল। কমলদাকে আমার চেয়ে তুমি অনেক বেশি চেনো, কাজেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস মানুষ চিনতে ভুল করি নি।

বাড়ির আর সকলের অভিশাপের পাশাপাশি তোমার আশীর্বাদটুকু পাব এ ভরসা এখনো রাখি !

প্রণাম নিও। —রমা।

অক্ষরগুলো ঝাপসা হয়ে যেতে সমীর টের পেল তার দু'চোখ ভরে জল এসেছে। হাতের উল্টা পিঠ দিয়ে জল মুছে উঠে দাঁড়াল, চিঠিটা ভাঁজ ক'রে হাতের মুঠোয় রাখল। মিনিট দুই তিন নিজেকে ভারি অসহায় মনে হল সমীরের। এ সংসারে যেন ওর শেষ নির্ভরটুকুও সরে গেল। বাপের ঘরের দিকে একটু এগিয়েই সমীর দাঁড়িয়ে পড়ল। না, দরকার নেই কাউকে জানিয়ে। বোলতার চাকে ঢিল পড়ার মত গুণগুণানিতে এখনি চারিদিক ভরে উঠবে। ঘোলা হয়ে উঠবে জল। এ জিনিষ তো আর চাপা থাকবার নয়, জানাজানি হবেই। তবু যতটা দেরী হয়। বাড়ির লোকে এমন একটা ব্যাপারে ঠিক ওর দিকেই আঙ্গুল দিয়ে দেখাবে এ বিষয়ে কোন সংশয় নেই। খাল কেটে কুমীর আনার জন্য সমীরই তো দায়ী, উটকো একটা লোককে আদর করে ওই তো ঘরে টেনে এনেছে। বন্ধু, প্রাণের বন্ধু, সমীরের বন্ধুর উপযুক্ত কাজই করল !

বাইরে বেরোতে গিয়েই সমীরের একটা কথা মনে হল। দরজার ভেতর থেকে খিল দেওয়া, অথচ বাড়ির মেয়ে বাইরে গেল কি করে। একটু ভাবতেই সমীরের খেয়াল হ'ল, কয়লা রাখার পাশ দিয়ে ছোট্ট একটা রাস্তা। দড়ি দিয়ে ভাঙা দরজা একটা আটকান ছিল, সেইটে সরিয়ে পথ করে নিয়েছে। চোখের সামনে কমল আর রমার তিল তিল করে ভালবাসা গড়ে উঠেছে, একজনের হাত ধরে আর একজন ঘর ছাড়বার সাহস সঞ্চয় পর্যন্ত করেছে, অথচ দিনের পর দিন তাদের দুজনকে দেখেছে সমীর। বিন্দুমাত্র সন্দেহ করতে পারে নি।

রাস্তায় এসে প্রথম খেয়াল হল সমীরের, এমন সময় গেঞ্জির ওপর চাদর জড়িয়ে সে যাবেই বা কোথায়। জনবহুল কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় বোনকে খুঁজে বেড়াবে! কাছাকাছি থানায় ডায়েরী করবে একটা? কিন্তু তাতে তো আরও গোলমালের সৃষ্টি হবে। খানাতল্লাসের ছুতোয় পুলিশের লোক শহর তোলপাড় করবে। বংশের মর্যাদা তাতে কমবে বই বাড়বে না। তার চেয়ে কমলের মেসে একবার খোঁজ নেওয়া দরকার। যদি কোন হদিস পাওয়া যায়।

মেসের ফটকের মুখেই ম্যানেজারবাবুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ভদ্রলোক চাকরের কাছে বাজারের হিসেব নিচ্ছিলেন, সমীরকে আড়চোখে একবার দেখে নিয়ে এক গাল হাসলেন, তারপর সমীরবাবু, কি মনে করে?

—কিছু মনে করে নয়, কমলের কাছে একবার এসেছি।

—কমলবাবুর কাছে, সে কি মশাই, আপনি তাঁর বন্ধুলোক, একেবারে হরিহরাত্মা, আপনি জানেন না কিছু? বলে নি আপনাকে?

সমীর সেখানেই দাঁড়িয়ে পড়ল, মাথাটা হঠাৎ ঘুরে উঠল। ম্যানেজারের কথাগুলো, অস্পষ্ট। কানের কাছে হাজার বোলতার গুঞ্জন।

—কি ব্যাপার বলুন তো?

—বা, তাঁর যে বিয়ে! জিনিষপত্তর নিয়ে কাল সকালে মেস ছেড়ে গেছেন। বিয়ে থা সেরে কোথায় বুঝি বাসাও নেবেন। পুরোদস্তুর গৃহস্থ। মেসের ছন্নছাড়া জীবনে একেবারে ইতি।

—তাই নাকি, আপনাদেরও ফাঁকি দিয়েছে বলুন, সমীর গলার স্বরে পরিহাসের আমেজ আনল।

—আমাদের ফাঁকি দিয়ে যাবে কোথায়। দলশুদ্ধ একদিন অফিসে

গিয়ে হাজির হব না? কি যেন ওর খবরের কাগজের নামটা? বার্তাবহ না কি?

—কি জানি, আমারও ঠিক মনে পড়ছে না। আচ্ছা চলি তাহ'লে আজকে।

সমীর সোজা বাড়ি ফিরল না। ছোট্ট একটা পার্কের নিভৃত কোণে ঘাসের ওপরই বসে পড়ল। রোদের তেজ বাড়ছে, পথচারীর সংখ্যাও। অবশ্য পরিপূর্ণ বেকার জীবনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পার্কের বেঞ্চে কিংবা ময়দানের গাছের ছায়ায় কাটান বেশ অভ্যাস আছে। কিন্তু চোখ দুটো বুজলেই হু হু করে সিনেমার ছবির মতন শুরু থেকে সমস্ত ঘটনাটা ভেসে ওঠে।

সরকারের অবিচারের বিরুদ্ধে কি একটা কড়া চিঠি লিখে সমীর হাজির হয়েছিল কালান্তর অফিসে। চিঠিপত্র বিভাগে ছাপতে হবে চিঠিটা। এ বিভাগের যিনি কর্তা তিনি কি ব্যাপারে সেদিন বুঝি অনুপস্থিত, কাজেই সমীর পাশের চেয়ারে বসা নিরীহ গোছের একটি ভদ্রলোকের হাতে চিঠিটা দিয়েছিল। চিঠিটা বার দুই মনে মনে পড়ে ভদ্রলোক চিঠিটা সমীরের হাতে ফেরত দিয়েছিল।

—কি হল?

—এ আমরা ছাপতে পারি না।

—কেন?

—সরকারের বিরুদ্ধে কোন চিঠি আমরা ছাপতে পারি না।

—সরকারের অন্যায়ের, অবিচারের সম্বন্ধে হলেও নয়!

ভদ্রলোক মৃদু হেসে ঘাড় নেড়েছিল।

—কাগজ বন্ধ করে দিন। রাগে গরগর করতে করতে সমীর নীচে নেমে এসেছিল, কিন্তু চৌকাঠ পার হ'তে পারে নি। দরজার

গোড়াতেই কাঁধে মৃদু স্পর্শ পেয়ে ফিরে অবাক হয়ে গিয়েছিল। ওপরের সেই ভদ্রলোক।

—কি ব্যাপার, সমীরের গলা বেশ চড়া।

—ওভাবে গরম গরম ভাষায় না লিখে, একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে লিখুন না, ছাপবার বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি।

—ঘুরিয়ে ফিরিয়ে? সমীর অবাক হয়ে গিয়েছিল।

—আসুন ওপরে। ভদ্রলোক সমীরকে ওপরে নিয়ে গিয়েছিল। তারপর মিনিট কুড়ি কাটাকাটি ক'রে, অদরকারী শব্দ সরিয়ে চিঠির খসড়া তৈরী হয়েছিল।

ভদ্রলোক এক গাল হেসে বলেছিল, আপনি যা এনেছিলেন, সেটা হয়েছিল নিছক সাহিত্য, আর এ হলো রাজনীতি। সাপও মরল, অথচ লাঠিও অটুট রইল, দেখলেন তো?

এমন একটা ভদ্রলোকের সঙ্গে ভাব হতে সমীরের মোটেই দেরী হয় নি। শুধু ভাব, কয়েকদিন পরেই তাকে টেনে বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল। বাবা, দাদা, বৌদি, শেষকালে রমা, সকলের সঙ্গেই আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। প্রায় পাঁচ সাড়ে পাঁচ বছর আগের কথা। খুব অন্তরঙ্গ হয়ে গিয়েছিল দুজনে। সমীর বাড়ী না থাকলেও কমল ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিয়েছিল এ বাড়ীতে। প্রমীলা প্রথম প্রথম সুনজরেই দেখেছিল। নিজের অরক্ষণীয়া বোনটার যদি গতি হয় একটা। কিন্তু কমল জাতে কায়েত শুনে প্রমীলা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। তারপর থেকে কমল এসেছে জানলেও প্রমীলা বিশেষ আমল দিত না। ওপর থেকে নিচেই নামতো না মাঝে মাঝে। রুগ্ন বাপের কাছে কিংবা রমার সঙ্গে ব'সে ব'সে গল্প করত কমল। সমীরের ধারণা, বুঝি দেশবিদেশের কাহিনীই বলত, দেশান্তরের ভাগ্যবিপর্যয়ের কথা, কিন্তু

সে সবের ফাঁকে ফাঁকে ওরা যে আরো অনেক-কিছুই আলোচনা করত, সেটা আজকের ব্যাপারে দিনের আলোর মতন স্পষ্ট।

এক সময়ে সমীর আস্তে আস্তে উঠে পড়ল। সকাল থেকে এক ফোঁটা চাও পেটে পড়ে নি। বিশ্রী একটা যন্ত্রণা পেটের মাঝখানে। সব যেন মোচড় দিয়ে উঠছে। বাড়ীর কাছ বরাবর এসে সমীর একটু থমকে দাঁড়াল। না, কোন সাড়াশব্দ নেই, চেঁচামেচিও নয়। সব নিঃঝুম। পা টিপে টিপে এগিয়ে দরজায় হাত রাখতেই ভেজানো দরজা খুলে গেল। খুব সন্তর্পণে সমীর ঘরে ঢুকল। বাপের ঘরে উঁকি দিয়ে দেখল সোমনাথবাবু পুরোনো কাগজ চোখের সামনে মেলে ধ'রে চিত হয়ে শুয়ে রয়েছেন। এদিকের রান্নাঘরে এলোমেলো থালাবাসন ছড়ান। কাত করা বঁটি, ছাড়ানো আলুর খোসা। চৌবাচ্চার পাশে এঁটো বাসনের গোছা। যাক, একটা বিষয়ে নিশ্চিত হ'ল সমীর। বৌদি রান্নাঘরে ঢুকেছিল তা হ'লে। অবশ্য দাদার অফিসের ভাত, এ ছাড়া আর উপায় ছিল না। এগিয়ে নিজের ঘরে ঢুকতে গিয়েই সমীর থমকে দাঁড়াল। রমার ঘরে সমস্ত জিনিষপত্র ওলোট পালোট ক'রে প্রমীলা কি খুঁজছে। জিনিষপত্র আর কি! পুরোনো বই আর ছেঁড়া খবরের কাগজের স্তূপ। কমলের কল্যাণে খবরের কাগজ বড় কম জমে নি। তেলের শিশি, সাবানের বাক্স, চুলের ফিতে সব সারা মেঝের ছড়ান।

সমীরের পায়ের আওয়াজে প্রমীলা মুখ ফেরাল, যাক্, তুমি ফিরেছ ঠাকুরপো, আমি ভাবলাম বুঝি ভাইবোনেই উধাও!

সমীর কোন কথা বলল না। চৌকাঠ পেরিয়ে রমার পাতা বিছানার ওপর চেপে বসল। একটু ইতস্তত ভাব, তারপর সঙ্কোচ কাটিয়ে উঠে বলল, ওরা চলে গেছে বৌদি।

ওরা কারা ?

কমল আর রমা।

বুঝতে একটু সময় লাগল প্রমীলার। বুঝল যখন তখন আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। ধূলো ছড়ান মেঝের ওপরই গালে হাত দিয়ে বসে পড়ল।

—বল কি ঠাকুরপো, ঠাকুরঝির পেটে পেটে এত ছিল ?

সমীর এ কথার কোন উত্তর দিল না। প্রমীলার দৃষ্টির অনুসরণ ক'রে চেয়ে চেয়ে দেখল এদিক ওদিক।

—সাতসকালে তুমি উঠে গিয়েছিলে কোথায় ? ফুলশয্যার তত্ত্ব নিয়ে নাকি ?

এই ধরণের কথা সমীর আশাই করেছিল। এত বড় একটা ব্যাপারে বৌদি চুপচাপ থাকবে এ হতেই পারে না। কমলের চালচলন সম্বন্ধে এ বাড়ীতে এই একটি লোকই শুধু ইঙ্গিত করেছিল। সময় নেই, অসময় নেই, হুট হুট ক'রে উটকো একটা লোকের আসা-যাওয়া মোটেই পছন্দ করে নি। বলবার দিন এসেছে প্রমীলার। আজ কাউকে ছেড়ে কথা বলবে না।

– ওরা যে চলে যাবে তুমি আগেই জানতে ঠাকুরপো, না ?

উত্তরে সমীর ঘাড় নাড়ল, তারপর হাতটা প্রসারিত ক'রে রমার চিঠিটা বৌদির হাতে তুলে দিল।

ঘামে ভিজে গেছে অক্ষরগুলো। হাতের চাপে মুচড়ে গেছে চিঠিটা। দু'-একটা অক্ষর উঠেও গেছে হয়তো। কিন্তু যে কটা অক্ষর আছে প্রমীলার পক্ষে তাই যথেষ্ট। বারতিনেক পড়ল, তারপর চিঠিটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

সঙ্গে সঙ্গে সমীরও দাঁড়াল উঠে।

প্রমীলার কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বলল, কোথায় চললে ?

বাবার কাছে। সকাল থেকে অনেকবার খোঁজ করেছেন। আমি ভালোমানুষ ঠাকুরপো, তোমার বোনের মনে যে কাব্যিরসের জোয়ার এসেছিল তাকি জানি, আমি ভালো মনে বলেছি, বোনকে নিয়ে বোধ হয় তুমি গঙ্গাস্নানে বেরিয়েছ। দিনটা তো ভাল।

বাবার কাছে এখন নাই গেলে বৌদি। যা বলবার আমিই বলব'খন।

প্রমীলা ভুরু কুঁচকে ঘুরে দাঁড়াল। যা হোক ক'রে জড়িয়ে রাখা খোঁপা খুলে চুলের গোছা পিঠের ওপর ছড়িয়ে পড়ল। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে বাকি বিষটুকু প্রমীলা উজাড় ক'রে ঢেলে দিল, বোনের কেলেঙ্কারী আর কদিন চেপে রাখবে ঠাকুরপো। আজই বল আর কালই বল, তোমার বোনের এ রাসলীলার কথা জানতে আর কারুর বাকি থাকবে না। উটকো এক ছোঁড়ার সঙ্গে একলা ঘরে ব'সে হাহা হুহু হাসি, ঠাট্টামস্করা, পাড়ার লোকেদেরও কান এড়ায় নি। ক'জনের মুখ চাপা দেবে তুমি!

শেষ চেষ্টা করল সমীর। দুটো হাত দিয়ে রাস্তা আগলে বলল, তোমার পায়ে পড়ি বৌদি, বাবা বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছেন। খেয়েদেয়ে বিকেলের দিকে বললেই হবে।

আঃ, কি রসিকতা কর, প্রমীলা চেঁচিয়ে উঠল, বেনো জল ঢুকিয়ে ঘরের জল তো বের ক'রে দিলে। বামুনের মেয়ে কায়েতের ছেলের হাত ধ'রে রাস্তায় নাচতে বেরোল। সরো, কেলেঙ্কারী আর বাড়িয়ো না। তোমার কথামত চলতে গেলেই হয়েছে।

সমীর আশা করেছিল সোমনাথবাবু হয়তো কেঁদেই ফেলবেন হাঁউমাউ করে। মা মরা মেয়ে। সব সময়ে বুড়ো বাপকে চোখে চোখে রাখত। কিংবা হয়তো রাগে ফেটে পড়বেন। সমীরকে ডেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করবেন সমস্ত কিছু। কুলে কালি দিয়ে এই যে বাড়ীর মেয়ে বেরিয়ে গেল, কে দায়ী এর জন্য!

কিন্তু আশ্চর্য, সোমনাথবাবু এসব কিছুই করলেন না। প্রমীলার ডাকে ধড়মড় ক'রে বিছানার উপর উঠে বসলেন। তারপর সব শুনে গুম হয়ে শুধু বললেন, 'হুম্'। ব্যস, চুপচাপ। যেমন খবরের কাগজ পড়ছিলেন, তেমনি পড়তে লাগলেন। শুধু শুয়ে নয়, দু হাঁটুর ওপর থুতনিটা রেখে চুপচাপ। আরো অনেক কথা বলবার ছিল প্রমীলার। ইনিয়ে বিনিয়ে পুরনো কাসন্দি। কিন্তু শ্বশুরের রকম দেখে আর সাহস হ'ল না। চৌকাঠের ওপর দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ দরজায় আঁচড় কাটল, তারপর আস্তে আস্তে সরে এসে সমীরের ঘরের সামনে দাঁড়াল।

—কি ঠাকুরপো, ভাত খাবে তো? নাকি বোনের শোকে উপোস দেবে এবেলা?

সমীর একটি কথাও বলল না। রান্নাঘরে ঢুকে নিজের হাতে আসনটা টেনে নিয়ে বসে পড়ল।

দুপুরের দিকে খুটখাট আওয়াজ হতেই সমীর জেগে উঠল। ঠিক ঘুমোয়নি, একটু তন্দ্রার ভাব এসেছিল। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল। অসম্ভব একটা চিন্তা মনের কোণে। রমা ফিরে এসেছে। এমন তো কত হয়। মাঝ রাস্তায় গিয়েও মানুষ মত বদলায় বৈ কি! হয় তো লোকের ভিড়ে বাইরের আলোয় ভয়ই পেয়েছে রমা। কাকুতি মিনতি করেছে কমলকে। বাড়ীতে ফিরে যেতে চায়। ভুলই করেছিল। দুদিনের চোখের ভালো-লাগার ওপর নির্ভর করে ভবিষ্যতের আস্তানা বাঁধা যায় না। কিন্তু খানিকটা এগিয়েই সমীরের ভুল ভাঙল।

রমা নয়, রমার ঘরে সোমনাথবাবু দাঁড়িয়ে। হাত দিয়ে দিয়ে রমার ফেলে যাওয়া জিনিষগুলো ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখছেন। মুখটা এপাশ থেকে দেখা যাচ্ছে না। বলা যায় না, হয় তো কোঁচকানো দুটি চোখের

পাশ দিয়ে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ছে। শুকনো ঠোঁট দুটো আবেগে কেঁপে উঠছে থরথর ক'রে। প্রমীলার ভয়ে মেয়ের সঙ্গে ভালো ক'রে কথা বলতে সোমনাথবাবু সাহস করতেন না। সব সময় খিঁচিয়ে থাকতেন। কিন্তু বুভুক্ষু হৃদয়ের খোঁজ রমা না রাখলেও, সমীর রাখত।

সমস্ত দিনের মধ্যে এই প্রথম রমার ওপর রাগ হ'ল সমীরের। তার প্রেমটাই বড়ো হ'ল, দুদিনের চেনা একটা মানুষই আপন হ'য়ে উঠল। দু হাত দিয়ে শ্যাওলা সরানোর মতন বাপ ভাই সবাইকে নিজের সামনে থেকে রমা এমনি ভাবে সরিয়ে দিল! কমলই বা কি। বোঝানো উচিত ছিল তার। যাকে ভালবাসে, তার আত্মীয়-স্বজনের মুখে এমন ভাবে কালি লেপে দিতে একটু দ্বিধা করল না। সামান্য সঙ্কোচও নয়।

সোমনাথবাবু পিছন ফেরবার আগেই সমীর পা টিপে টিপে নিজের ঘরে ঢুকে পড়ল।

ছোট খোকা, খুব চাপা কোমল কণ্ঠস্বর।

সমীর চমকে ফিরে দাঁড়াল। এই নাম ক'রে তো বাবা ওকে কোনদিন ডাকেন না। বাপের সঙ্গে কথা বলার প্রয়োজনই হয় না। ওষুধ ফুরোলে ওষুধ বদলে আনা, কিম্বা সপ্তাহে একবার শরীরের খবর নেওয়া। ব্যস, এই তো সম্বন্ধ! আজকাল বাপের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে সমীরেরই লজ্জা করে। জোয়ান মদ্দ ছেলে, বছরের পর বছর কেবল অন্ন ধ্বংস ক'রে চলেছে। একটি পয়সা বাড়তি আনবার সামর্থ্য নেই, অথচ ভায়ের সংসারে দিব্বি হেলান দিয়ে রয়েছে দিনের পর দিন। বাজার খারাপ, তা ব'লে আর চাকরী বাকরী জুটছে না মানুষের? তার জন্য কষ্ট করতে হয়, খোঁজ খবর রাখতে হয়। বাড়িতে যেচে এসে কেউ কাউকে চাকরী দেয় কখনো!

কিন্তু বাড়ীর লোকে কিছুতেই বুঝবে না। দিনের পর দিন সারা শহর চষে ফেলেছে। জানা অজানা সকলের সঙ্গে দেখা করছে। কিন্তু কোথাও সামান্য ভরসাও পায় নি। বি-এ, এম-এ পাশই তল পাচ্ছে না যেখানে, সেখানে ম্যাট্রিক পাশ একটা ছোকরার কি আশা থাকতে পারে।

অনেকে মুরুব্বীয়ানা চালে ব্যবসা করতে ইঙ্গিত দিয়েছে। ব্যবসা ক'রে ফেঁপে ওঠা লোকের নাম ক'রে সমীরকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু খালি হাতে তো ব্যবসা করা চলে না। নিঃশ্বাস ফেলে সমীর সরে এসেছে।

ঘর থেকে বেরিয়ে সমীর দেখল সোমনাথবাবু দেয়ালে হেলান দিয়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছেন। দুটি চোখ বন্ধ, লাঠিটা শক্তহাতে ধরা।

—আমায় ডাকলেন বাবা ?

—হ্যাঁ, একটু ধ'রে আমাকে ঘরে নিয়ে চল তো। ঝোঁকের মাথায় উঠে এসেছি, এখন যেতে কষ্ট হচ্ছে।

সমীর সাবধানে বাপকে ধ'রে তক্তপোষে বসিয়ে দিল। হাত থেকে লাঠিটা নিয়ে আড়াআড়িভাবে রেখে দিল বিছানার ওপর। র‍্যাপার ভালো ক'রে গায়ে চাপা দিয়ে উঠে আসবার মুখেই আবার বাধা পেল।

—শোনো।

সমীর ফিরল।

—বউমা ওপরে ?

সমীর ঘাড় নাড়ল।

অনেকক্ষণ চুপচাপ। বালিসে ঠেস দিয়ে সোমনাথবাবু বাইরের জানলার দিকে চেয়ে রইলেন। ঠোঁটের পাশের মাংসপেশীগুলো

থর থর ক'রে কাঁপছে। স্বাভাবিক অবস্থাতেই কাঁপে, উত্তেজিত হ'লে আরও বেশী।

—এ ছাড়া রমা আর কি করতে পারত? সমীরকে নয়, সোমনাথবাবু যেন নিজের মনের সঙ্গেই কথা বলছেন, এমনি গলার আওয়াজ।

সমীর এগিয়ে বাপের বিছানার ওপর বসল। এক হাত দিয়ে গুটিয়ে যাওয়া চাদরটা ঠিক করতে করতে আস্তে আস্তে বলল, রমা অন্যায় ক'রে নি বাবা।

সোমনাথবাবু স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন সমীরের দিকে। নবজাত শিশুকে বাপ যেমন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঙ্গে নিজের দেহের মিল খোঁজে, অবিকল সেই দৃষ্টি। তারপরেই ভাঁজ ক'রে রাখা খবরের কাগজটা মেলে রইলেন চোখের সামনে। ঝুঁকে পড়লেন সেইদিকে।

কিছুক্ষণ বসে থেকে সমীর উঠে দাঁড়াল। আশা করল চৌকাঠ পার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার পিছন থেকে ডাক আসবে। রমা অন্যায় করে নি, কোন অন্যায় করে নি। এ যুগে জাতের মিল হওয়ার চেয়ে মনের মিল হওয়াই বড় কথা। কিন্তু সোমনাথবাবুর দিক থেকে আর কোন সাড়া নয়। সমীর বাইরে বেরিয়ে এল।

ঘুম ভাঙ্গতেই রমা লজ্জা পেয়ে গেল। জানলা দিয়ে কড়া রোদের ঝলক বিছানার ওপর এসে পড়েছে। বাইরে পথ-চলতি লোকের হাঁক ডাক শোনা যাচ্ছে। পাশের মানুষটাও বিছানায় নেই। রমা ধড়মড় ক'রে উঠে পড়ল।

বাইরে ফটকের কাছে কমল দাঁড়িয়ে। জানলার কাছে শাড়ীর খস খস শব্দ হ'তেই মুখ ফিরিয়ে হাসল। এগিয়ে গরাদের কাছ বরাবর এসে বলল, কি, মহারাণীর ঘুম ভাঙল ?

—আহা, বেশ লোক, কেন, একবার ডাকতে কি হয়েছিল ?

—কি জানি, ডেকে যদি সাড়া না পাই ? সব সময় সবাইয়ের ডাকে কি মানুষ সাড়া দেয় ?

এবার রমা কোন উত্তর দিল না। একটা হাত মুঠো ক'রে কিল দেখাল কমলকে, তারপর বাথরুমের দিকে চলে গেল।

একেবারে স্নান সেরে বেরিয়ে দেখল সুখী বিছানা তুলে ঝাঁট দেওয়া সেরে ফেলেছে। রমাকে দেখে একগাল হাসল, ধন্যি ঘুম বউদি তোমার। কড়া নাড়তে দাদাবাবু দরজা খুলে দিলেন।

আয়নার সামনে পা মুড়ে বসে চিরুণীর উল্টো পিঠ দিয়ে সিঁথের সিঁদুর দিতে দিতে রমা জিজ্ঞাসা করল,—তোমার দাদাবাবু এখনও রাস্তায় দাঁড়িয়ে বুঝি ?

—না, না, রাস্তায় কেন থাকবে ? আমার কাছ থেকে বাজারের খোঁজ নিয়ে এইতো থলি হাতে বাইরে গেলেন।

আয়না সরিয়ে রমা জানলা দিয়ে বাইরে চেয়ে দেখল। না, মানুষটা উধাও। ধারে কাছে কেউ নেই।

—ওপরের বাড়ির সঙ্গে ভাব হল বউদি? ঝাঁট শেষ ক'রে ঝাঁটাটা ঘরের কোণে রেখে দিয়ে সুখী আঁচলটা কোমরে জড়িয়ে নিল। বালতি হাতে এবার জল আনতে যাবে।

—হাঁ, ওপরের বাড়ির কর্তা আর তাঁর মেয়ে কাল এসেছিলেন। বড় চমৎকার মানুষ।

—কে, কর্তা না মেয়ে?

—দুজনেই।

—আমার পোড়া কপাল। সুখী নিজের হাত দিয়ে কপাল চাপড়াল, কর্তা আবার মানুষ না কি। গিন্নীর কথায় উঠছেন আর বসছেন। হাঁ বললে হাঁ, না বললে না।

এই ধরণের আলাপ আলোচনা বাড়ির ঝির সঙ্গে করতে রমার ভাল লাগল না। এই সব ঝিয়ের ব্যাপার সে ভাল ক'রেই জানে। কথা চালাচালি করাই এদের স্বভাব। এ বাড়ির কথা ও বাড়িতে, ও বাড়ির হাঁড়ির খবর এ বাড়িতে। সকালের দিকে রমার খবরও ওপরে দিয়ে এসেছে কিনা, কে জানে।

রমা কথা পাল্টাল, বাজারটা অনেক দুরে বুঝি সুখী।

সুখী মুখ টিপে হাসল, না গো বউদি, ওই তো রেল লাইনের ওপারে একটু গেলেই। দাদাবাবু এখুনি এসে পড়বেন।

—তোমার দাদাবাবুর আসার জন্য তো আমার ঘুম হচ্ছে না।

রমা জানলার কাছ থেকে সরে দাঁড়াল।

সুখী বালতিটা হাতে নিয়ে কি ভেবে আবার দাঁড়িয়ে পড়ল, বাজারের পিছনেই তো আমি থাকি। ও জায়গাটার নাম চণ্ডীতলা।

তোমার বাড়িতে কে কে আছে? নেহাৎ কিছু একটা বলতে হবে এইভাবে রমা কথাটা পাড়ল।

—মামা আছে, থাকবার মধ্যে ওই শিবরাত্তিরের সলতে। টিম টিম করছে। আমি দু বাড়ি গতর খাটিয়ে রোজগার করি। মামা কাঠের মিস্ত্রী, টুকটাক যা রোজগারপাতি করে। ওই যে কোণের দিকে কাঠের তাক, সব আমার মামার হাতের তৈরী। কথা থামিয়ে সুখী বালতি হাতে হন হন করে বেরিয়ে পড়ল। হঠাৎ বোধ হয় খেয়াল হয়েছে টেপাকলের সামনের ভিড়ের কথা। দেরী হলেই লোক বাড়বে।

সুখী চলে যাবার পর রমা গরাদে মাথা রেখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

গাছের ফাঁকে ফাঁকে দু একটা বাড়ি দেখা যাচ্ছে। ভিজে চুলে একটি মেয়ে বারান্দায় কাপড় মেলতে এসে বোধ হয় ওর দিকেই চেয়ে চেয়ে দেখল। একেবারে এ কোণের বাড়ির উঠানে দুটি ছোট বাচ্চা ছেলে মুড়ি ভাগ ক'রে খাচ্ছে। তাদের গা ঘেঁষে পোষা একটি কুকুর। প্রসাদপ্রার্থী। রাস্তা দিয়ে ফেরীওয়ালা চলেছে। কাঁচের চুড়ি, চুলের ফিতে আরও টুকিটাকি জিনিষ নিয়ে। বাপের বাড়ির জানলা দিয়ে এমন দৃশ্য নজরে পড়ত। কতবার দেখেওছে রমা। কিন্তু তবু আজকের এ দেখার সঙ্গে তার মিল নেই। হাতের ওপর সিঁদুরের বিন্দু ঝরে ঝরে পড়ছে। দু রাতেই যেন বয়স কত বেড়ে গেছে রমার। সীতানাথ ঘোষ লেনের মেয়ে আর মজা আকন্দপুরের নববিবাহিতা বউয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ। তুলনাই হয় না।

রেল লাইনের দিকে মাথা উঁচু ক'রে রমা চেয়ে চেয়ে দেখল। ওইদিক থেকেই তো কমল আসবে। আধময়লা সার্ট গায়ে, মালকোচা

বাঁধা ধুতি, হাতে বাজারের থলি। কালকের উড়নচণ্ডী মানুষটা আজ পুরোদস্তুর গৃহস্থ। কথাটা মনে হ'তেই ভারি হাসি পেল রমার। মুখ ফিরিয়ে হাসতে গিয়েই সে থেমে গেল।

জানলার ওপাশে ফালি জমি। রাস্তা থেকে বাঁশের বেড়া দিয়ে আলাদা করা। সেই বেড়ায় ভর দিয়ে একটি ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে। খালি গা, গামছাটা চাদরের মত গলার দু পাশ দিয়ে ঝুলান, পরনের কাপড় লুঙ্গির ভাঁজে জড়ান। উস্কোখুস্কো চুলের রাশ কপালের ওপর পড়ছে, দাঁতের ফাঁকে নিমের দাঁতন। দুটি চোখের নিষ্পলক দৃষ্টি রমার দিকে। চাউনীর ধরণটা বিশ্রী লাগল রমার। পথেঘাটে এ ধরণের দৃষ্টি অনেকবার নজরে পড়েছে। সারা শরীর শিউরে উঠে। মনে হয়, শুধু দৃষ্টি দিয়েই নয়, হাত দিয়েও যেন শরীরের অনাবৃত অংশ ছুঁয়ে যায়।

এক হাত দিয়ে জানলার একটা পাল্লা ভেজিয়ে রমা ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়াল। কি কুৎসিৎ চাউনী। জানলা বন্ধ ক'রেও সোয়াস্তি নেই, মনে হল পুরু কাঠের পাল্লা ভেদ ক'রে দৃষ্টি এসে গায়ে বিঁধছে।

বাইরে সুখীর গলা। কার সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। বালতি উঠানে রাখার আওয়াজ। তার একটু পরেই সুখী ঘরে এসে ঢুকল। মুখে তুবড়ী ছুটছে।

—ভোর থেকে মুখপোড়ারা টেপাকলের সামনে বালতি বসিয়ে যাবে। বাপের কেনা সম্পত্তি পেয়েছে। বাড়ির বৌ-ঝিদের আর জল নিয়ে দরকার নেই। তাই তো বলছিলাম বাবুকে, কেবল সিন্দুকেই পয়সা তুলছ, বাড়ীতে একটা টেপাকল বসাও। কত আর খরচ। ওই পালেদের বাড়ী কি সুন্দর বন্দোবস্ত করেছে। চব্বিশ ঘণ্টা থৈ থৈ করছে জল।

—কাকে বলছিলে ?

—জামাই বাবুকে। ওপরের জামাই বাবু। ওই যে বেড়ার ওপর ঠ্যাং তুলে দিব্বি দাঁতন করতে করতে টেপাকলের সামনে ঠেলাঠেলি দেখছে।

ওপরের জামাই বাবু! মনে মনে বিড় বিড় ক'রে রমা হিসাব নিল। তার মানে যশোদার স্বামী। ছি ছি, ভদ্র ঘরের ছেলে, ও কি নজর! কিন্তু আর কথা বাড়াল না। রান্নাঘরের দিকে পা বাড়াল।

কমল ফিরল প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে। গলদঘর্ম চেহারা, দু হাতে ঝোলান দুই পোঁটলা, পিছনে কুলির মাথায় বিরাট টুকরি। জিনিষ পত্রে ঠাস বোঝাই।

আওয়াজে বাইরে এসে রমা ব্যাপার দেখে গালে হাত দিয়ে দাঁড়াল। কি সর্বনাশ, সারা বাজারটা তুলে এনেছ না কি?

কমলের মুখের হাসি অম্লান, কই আর পারলাম। বাজারের লোকগুলো কিছুতেই আসতে রাজী হল না।

বিকেলের দিকে কমলই কথাটা পাড়ল। যেখানে বাসা বাঁধা হ'ল, তার আশে পাশের জায়গাটা একবার দেখা তো দরকার। চুপচাপ ঘরে বসে থেকে থেকে রমাও হাঁপিয়ে উঠেছিল। কাপড় পরে তৈরী হ'য়ে নিল।

রেল লাইন পার হ'য়ে সোজা ওপারে চলে গেল। ভাঙা শিব মন্দিরের সার, শ্যাওলাছাওয়া ডোবা, লাল ধূলো উড়িয়ে মাঝে মাঝে বাস চলেছে, পথের দু পাশে আকন্দ আর ঘেঁটুর বন। একটু এগিয়ে রাস্তা ছেড়ে দুজনে মাঠের মধ্যে নেমে পড়ল। এবড়ো খেবড়ো জমি, জায়গায় জায়গায় উঁচু মাটির ঢিপি। পাশাপাশি দুজনে বসল। খুব ঘেঁ ঘাঘেষি।

কমল রমার একটা হাত টেনে নিল নিজের হাতে, নতুন জীবন কেমন লাগছে বলো ?

মুখে রমা কোন উত্তর দিল না। ডাগর দুটি চোখ তুলে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে কমলের দিকে চাইল। তৃপ্তির আমেজ দুটি চোখের তারায়। একটু পরে ফিস ফিস করে বলল, ভালো, খুব ভালো। আচ্ছা, ওরা খুঁজতে খুঁজতে আমাদের পেয়েও তো যেতে পারে ?

—পারে বৈ কি, আর তার জন্য খুব খোঁজ করতেই বা কেন হবে ? তোমার ছোড়দা আমার অফিসেই হয় তো ইতিমধ্যে হানা দিয়েছে।

তাই তো, একথাটা রমার মনেই হয়নি। অফিসের ঠিকানা তো জানা। বাসাই না হয় কমল বদলেছে, চাকরী তো আর নয়। অফিসে মুখোমুখি যদি দাঁড়ায় কমলের সামনে ?

—তা হলে কি হবে ? রমার গলায় ভয়ের ছোঁয়াচ।

—কি আবার হবে ! কমল শব্দ ক'রে হাসল, নতুন জীবনই না হয় শুরু করেছি, অজ্ঞাতবাসে তো আর যাইনি। সমীর যদি আসে তো ক্ষতিই বা কি। বলব, খুব ভালো আছি আমরা। চাই কি, একদিন না হয় তোমার ছোড়দাকে' নিমন্ত্রণই করে আসবো, কি বল ?

নিমন্ত্রণ ! কথাটা ভাবতে খুব ভালো লাগল রমার। ভারি চমৎকার হয় তা হলে। কিন্তু এখনই নয়, আরো কিছু পরে। নতুন ঘরগুলো মনের মতন ক'রে রমা সাজাবে। জানলায় জানলায় রঙীন পর্দা, দু একটা ভালো ছবি। ফুলদানীতে রজনীগন্ধার গোছা। পরিপাটি ক'রে আসন পেতে যত্ন ক'রে খাওয়াবে ছোড়দাকে। ফেলে আসা সংসারের মধ্যে ওই একটি মানুষের দিকে ফিরে ফিরে চাইতে ইচ্ছা করে। নিজের দুটো ডানা বিস্তার ক'রে আগলেছে রমাকে। সংসারের দুঃখের ঝাপটা একটু তার গায়ে লাগতে দেয় নি। কিন্তু নিজের দুর্বল

দুটো ডানার পরিমিত শক্তি। সব কিছু আটকান সম্ভব হয় নি। তবু সমীর নিজের যথাশক্তি করেছে।

কিন্তু ঐ কথার পাশাপাশি আরও একটা কথা রমার মনে আসল। বংশের মুখে কালি দেওয়া অন্য পুরুষের হাত ধরে বেড়িয়ে যাওয়া বোনের নতুন সংসারে নাও তো আসতে পারে সমীর। তার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ হয়তো রাখতে চাইবে না। পথে ঘাটে হঠাৎ দেখা হয়ে গেলে মুখ ফিরিয়ে পাশ কাটিয়ে যাবে। তা হ'লে ?

বুক কাঁপিয়ে দীর্ঘ একটা নিশ্বাস। কমল চমকে উঠল, কি হ'ল ?

—না, ছোড়দার কথা ভাবছি।

কি ভাবছে সেটা কমলের বুঝতে একটু দেরী হল না। একটা হাত দিয়ে নিবিড় করে রমাকে জড়িয়ে নিজের কাছে নিয়ে এসে বলল, আমি বলছি রমা, সমীর এতে খুসীই হবে। তোমাকে সে এত ভালোবাসে, তুমি সুখী হয়েছ জানলে তার আনন্দই হবে। তুমি সুখী হওনি রমা ? দু হাতের তালুতে কমল রমার মুখটা তুলে ধরল।

অনেকক্ষণ রমা কোন কথা বলতে পারল না। দুটি চোখ বোজান। ঠোঁট দুটি কাঁপছে থর থর ক'রে। কি একটা বলার চেষ্টা করেও পারল না। মনের সব কথা সব সময় মুখে বুঝি বলা যায়! ভাষার পরিধি কতটুকু। উদ্বেল হৃদয়ের কতটুকু কথায় রূপ দেওয়া সম্ভব ?

রমা এগিয়ে এসে কমলের বুকে মাথা রাখল।

অনেক দূরে লাল ধুলো উড়িয়ে বাসের সার চলেছে। ইঁট বোঝাই। মজা আকন্দপুরকে ঘন বসতি ক'রে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা চলেছে। খানা ডোবা বুঝিয়ে ভরাট করা হচ্ছে মাটি। বাঁশের বেড়া আর ইটের পিলপে গেঁথে ভাগ বাঁটোয়ারা চলেছে। মানুষ বেড়েছে। জনাকীর্ণ নগর ছেড়ে আস্তানার সন্ধানে বেড়িয়ে পড়েছে সবাই। শহর থেকে

গ্রামাঞ্চল ছেয়ে ফেলেছে। মাথা গুঁজবার আস্তানা! হাত পা ছড়িয়ে বাঁচবার প্রয়াস। এই মিছিলের পিছনে কমল আর রমা বেড়িয়ে পড়েছে। ন্যায় অন্যায় নীতি দুর্নীতির প্রশ্ন নয়, বাঁচবার দুর্বার আকাঙ্ক্ষা। মধ্য এশিয়া থেকে মানুষ সরে সরে নানাদিকে ছিটিয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। ঘর বেঁধেছিল আদিম প্রেরণায়। বাঁচবার প্রয়োজনে। কমল আর রমারও তো তাই। শুধু বাঁচবার প্রয়োজনেই নয়, বাঁচাবার প্রয়োজনেও। তাদের প্রেমকে বাঁচাবার প্রয়োজনে।

—এ আবার কি রকম নাম গো? মজা আকন্দপুর? রমা আচমকা জিজ্ঞাসা করল। এটুকু বোঝা গেল, এ প্রশ্ন অবান্তর। মন থেকে আর একটা জটিল চিন্তা দূর করার জন্যই এর অবতারণা।

—এক সময়ে বোধ হয় জমিদারী ছিল কারুর। বিরাট জমিদারী। ওদিকে চণ্ডীপুর থেকে শুরু ক'রে মৌজা আকন্দপুর। লোকের মুখে মুখে মৌজা মজায় এসে দাঁড়িয়েছে। সন্ধ্যা হয়ে আসছে, চল ওঠা যাক।

রমা ওঠবার সামান্য চেষ্টাও করল না।

—হ্যাঁ, অন্ধকার হবার আগে ওঠাই ভালো। গ্রামের ব্যাপার, সাপখোপ থাকাও আশ্চর্য নয়।

—ও বাবা, ওঠ ওঠ, রমা লাফিয়ে উঠল।

সত্যি অন্ধকার নামছে। আসবার সময় খেয়াল হয় নি। হাঁটতে হাঁটতে বেশ খানিকটা দূরে এসে পড়েছে। রাস্তা ছেড়ে বাঁজা মাঠের ওপর দিয়ে।

দুজনে চলতে শুরু করল।

সাপের কথা মনে হলেই রমার মনে আরেক জনের মুখ ভেসে আসে। আজ বলে নয়, চিরকাল। সাপের ছবি দেখলেও এ ভাব

আসে। খুব অস্পষ্ট। কিন্তু চিনতে রমার কোন অসুবিধে হয় না। সে মুখ প্রমীলা বৌদির। আর কিছু নয়, কিন্তু ফণা তোলা আর বিষ ঢালার ব্যাপারে দুজনের কোন অমিল নেই। বলা যায় না, রমার বাড়ি ছেড়ে চলে আসার খবরটা পল্লবিত ক'রে বৌদি নানা লোককে নানা কথা বলে চলেছে। দাদাকেও নিশ্চয়। রোগগ্রস্ত বাবাকেও রেহাই দেয় নি।

বুকের মাঝখানে অসহ্য একটা যন্ত্রণা। ফিক ব্যথার মতন নড়তে চড়তে গেলেই খচ ক'রে ওঠে। রাতের অন্ধকারে এ ভাবে পালিয়ে না এসে, ওদের স্পষ্ট ক'রে বলে এলেই তো হ'ত। হয়তো বাধা দিত, ওকে আটকই ক'রে রাখত ঘরের মধ্যে। কমলকে নিয়ে পড়ত সকলে। ও বাড়িতে ঢোকা বন্ধ করে দিত। না, তার চেয়ে এই ভালো। কলঙ্ক? অরক্ষণীয়া একটা মেয়ের জীবনে কলঙ্কের সীমা আছে নাকি? তাও আবার মধ্যবিত্ত সমাজে। মাসের মধ্যে বার দুয়েক এর শাড়ী ওর গয়না ধার ক'রে বাপের বয়সী দোজবরে লোকেদের সামনে গিয়ে বসা, তাদের অতৃপ্ত কলুষিত দৃষ্টির খোরাক হয়ে? হরিপুরের মেলায় গরু কেনার মতন ক'রে চোখ বুলিয়ে বুলিয়ে দেখবে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। বোকা বোকা প্রশ্ন করবে, তারপর জলপান শেষ ক'রে ওরই সাজা পান চিবোতে চিবোতে রাস্তায় গিয়ে নামবে। রূপের সঙ্গে কতটা রূপো মিশতে পারে তারই দরদস্তুর করবে ওর দাদাদের সঙ্গে। তারপর দিন পাঁচ-ছয় পরে খবর আসবে দাদাদের মারফৎ। না, হ'ল না। বৌদি টিপে টিপে মুচকি হেসে খবরটা শোনাবেন। পছন্দ না হওয়ার লজ্জাটা যেন রমারই সবচেয়ে বেশি। রাত্রে শুয়ে শুয়ে কতদিন পরণের শাড়ী গলায় জড়িয়ে মরার কথা রমা ভেবেছে। তারপর কমল এসেছে ওর জীবনে। বাঁচার মন্ত্র শুনিয়েছে কানে কানে।

হঠাৎ রমার খেয়াল হল। সংগের লোকটা গেল কোথায়। সরু পায়ে-চলা পথ। পাশাপাশি দুটো মানুষের চলার উপায় নেই। পিছনে পিছনে কমল আসছিল।

—তুমি কোথায়? ওগো কই তুমি? কান্নার মিশেল রমার গলার আওয়াজে।

মিনিট দুয়েক। তারপরই খিল খিল ক'রে হাসির আওয়াজ শোনা গেল। মাঠের ওপর ভেঙে পড়ে থাকা এক মোটরলরীর পিছন থেকে কমল গুঁড়ি দিয়ে এগিয়ে এল।

পাশে এসে বলল, কি হ'ল? তুমি একলা পথ চলতে পার কিনা তাই দেখছিলাম।

আচমকা ভয় পাওয়া মানুষের মতন রমা নিবিড়ভাবে কমলের একটা হাত জড়িয়ে ধরল, নাগো, একলা পথ চলবার একটুও সাহস আমার নেই। তুমি পাশে না থাকলে আমি কি যে অসহায়, কথা শেষ না ক'রে রমা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

একটা হাত দিয়ে রমাকে জড়িয়ে ধরে কমল আর একটা হাত ওর মাথায় রাখল। চুলের ওপর আস্তে আস্তে বোলাতে বোলাতে বলল, একেবারে পাগল তুমি। বদ্ধ পাগল।

গেটের কাছ বরাবর যশোদার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

এক চিলতে বাগান। শেফালী, জবা আর বেলফুলের ঝাড়। যত্ন আত্তির বালাই নেই। জল দেবার পাটও নয়। যখন যার খেয়াল হয়, এক বালতি জল এনে ঢালে গাছের গোড়ায়। দুটো হাত পিছনে রেখে যশোদা পায়চারী করছিল, রমাকে দেখে একগাল হেসে এগিয়ে এল। কথা বলতে যাবার মুখেই কমলের ওপর চোখ পড়তেই ঘোমটা টেনে পিছিয়ে গেল।

কমল রমার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ফিস ফিস করে বলল, তোমরা কথাবার্তা বলো, আমি আর একটু ঘুরে আসি।

রমার সম্মতির অপেক্ষা না ক'রে কমল হন হন ক'রে এগিয়ে গেল। বাঁ হাতি শড়ক ধ'রে অন্ধকারে মিশিয়ে গেল মানুষটা।

মাথার ঘোমটা নামিয়ে যশোদা আবার এগিয়ে গেল, বেশ আছো ভাই। তোমাকে দেখলে আমার হিংসে হয়। কথার সঙ্গে সঙ্গে যশোদা গালে হাত দিয়ে জিভ কাটল, ছি, ছি, দেখলেন কাণ্ড! আপনাকে তুমি ব'লে ফেললাম। কিছু মনে করবেন না ভাই।

—এর পর যদি আপনি আজ্ঞে বলেন, তা হলেই রাগ করবো, রমাও মুচকি হাসল।

—বেশ ভাই রাজী, কিন্তু আমাকেও তা হ'লে আপনি-টাপনি বলতে পারবে না, কেমন ?

—আপনাকে ?

—কথা বলবো না কিন্তু। ভাব জমবার আগেই জন্মের মতন আড়ি হয়ে যাবে।

—ও বাবা, দরকার নেই, তার চেয়ে তুমিই বলব। কপট ভয়ে রমা চোখ দুটো বড় ক'রে ফেলল।

—লক্ষ্মী মেয়ে। চল ওপরে যাই। মা তোমাকে দেখতে চান।

—আমাকে ?

—হ্যাঁ ভাই, এই গতর নিয়ে চারবার ওঠানামা করেছি। ওমা, যতবার নামি, এই বড় তালা ঝুলছে। সাহেব বিবি হাওয়া খেতে বেরিয়েছে তাকি জানি! কোথায় গিছলে ভাই ?

—তোমাদের গাঁটা একটু ঘুরে ঘুরে দেখে এলাম।

—কি গাঁ ? খুব সাবধান, মার কাছে এমনি বেফাঁস কথা যেন বলে ফেল না। খাস শহর। শুধু লাইটটা এলেই হ'ল।

দুজনেই হেসে উঠল। সিঁড়ি বেয়ে যশোদা উঠতে শুরু করল প্রথমে, পিছনে পিছনে রমা খুব ধীর পায়ে।

সিঁড়ির পাশেই ঘর। অন্ধকার।

যশোদা চৌকাঠে দাঁড়িয়ে ডাকল, মা আছো?

—হ্যাঁ, আয় ভিতরে আয়। জাঁদরেল গলার আওয়াজ। ভারিক্কি ধরণের।

যশোদা ঘরে ঢুকে পড়ল। মিনিট দুয়েক। তারপরেই পাশের ঘর থেকে হ্যারিকেন এনে তাকের ওপর রাখল। রমার দিকে চেয়ে বলল, এস ভাই।

ঘরে পা দিয়েই রমা থমকে দাঁড়াল। দেয়াল দেখার উপায় নেই। হরেক রকমের দেবদেবীর ছবিতে ঠাসবোঝাই। রাসলীলার পাশে গঙ্গাবতরণ, পুরীর জগন্নাথের গায়ে কালিঘাটের কালী। তেত্রিশ কোটির মধ্যে নামজানা সবকটিই হাজির। দেয়াল থেকে চোখ নামাতেই রমা আরও হকচকিয়ে গেল। প্রথমে কেবল মাংসস্তূপ নজরে ঠেকলো, ধোপার কাপড়ের পোঁটলার সামিল। বালিশে কাত। দুটি পা সামনের দিকে ছড়ান। পায়ে পুরু গরমকাপড় জড়ান, তার ওপর শাড়ীর পাড় শক্ত ক'রে বাঁধা। ইতিহাসের পাতায় দেখা আলেকজান্দারের পাদভূষণের প্যাটার্ন।

মাংসস্তূপ নড়ে উঠল। মহিলা কথা বললেন, আর মা দেখছ কি, বাতে পঙ্গু। বেঁচে মরে আছি। নড়বার চড়বার উপায় নেই। পাশ ফিরতে পর্যন্ত পারি না।

রমা আস্তে এগিয়ে গেল। তক্তপোষের কাছ বরাবর। মৃদু গলায় বলল, ওষুধপত্তর কিছু ব্যবহার করেন না?

থপাস ক'রে একটা শব্দ। যশোদার মা হাত দিয়ে নিজের কপাল চাপড়ালেন, ওষুধপত্তর। হেন ওষুধ নেই যে গিলি নি।

আর মালিশই কত রকমের। বাঘের চর্বি থেকে আরম্ভ ক'রে কাছিমের তেল। যে যা বলেছে করেছি মা। মাদুলী পরে হাতে ঘা হয়ে গেল। এখন রাগ ক'রে সব ছুঁড়ে ফেলে ভগবানের ওপর নির্ভর ক'রে আছি। এ অসুখ সারবার নয়।

—বড়ো পাজী রোগ। কিছুতে সারতে চায় না, রমা আস্তে আস্তে বলল, আমার বাবারও আছে কিনা।

—তাই নাকি? উৎসাহে যশোদার মা বিছানার ওপর কাত হলেন, কতদিনের অসুখ?

—তা প্রায় বছর আট নয়।

—আহা, চলাফেরা করতে খুব কষ্ট?

—কষ্ট নয় আবার, সারা শীতকালটা তো লাঠি ধ'রেই বেড়াতে হয়। অষুধবিষুধে কোন কাজ হয় না। আপনিই বাড়ে, আপনিই কমে।

—যা বলছ বাছা, যশোদার মা একগাল হাসলেন, পোড়ারমুখো ডাক্তারগুলো মুঠো মুঠো টাকাই নিয়ে যায়, সারাবার নাম নেই। সেইজন্যই তো সব ছেড়ে ছুড়ে ভগবানের হাতে ছেড়ে দিয়েছি। তা হাঁগা বাছা,—

রমা বাধা দিল, আমার নাম রমা, আপনি রমাই বলবেন।

—তা বেশ, বেশ, হ্যাঁ রমা, তোমার বাবা অফিস যান কি ক'রে, চাকরী করেন তো?

—করতেন, এখন রিটায়ার করেছেন।

—বটে, তোমরা ভাইবোন কটি? তাকিয়ার ভর দিয়ে যশোদার মা আর একবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু সুবিধা হল না। গালে হাত রেখে আড় হয়ে শুলেন।

—দুই ভাই, এক বোন।

—তুমি তো তা হ'লে বাপমায়ের খুব আদুরে।

রমা মাথাটা হেঁট করল। জানলার গরাদগুলোর ওপর আলতো হাত বোলাল, তারপর বলল, আমার মা নেই, খুব ছেলেবেলায় মারা গেছেন।

—ওমা, আহা, পৃথিবীতে যার মা নেই, তার কেউ নেই।

কথায় ছেদ পড়ল। সিঁড়িতে অনেকগুলো পায়ের শব্দ। যশোদার মা মুখ বিকৃত করলেন। ঠোঁট উল্টে বললেন, ওই আসছে ডাক্তার মুখপোড়া। তোর বাপের যেমন আক্কেল। যত মড়াগুলোকে টেনে টেনে নিয়ে আসবে।

যশোদার মা কথাগুলো বললেন বটে, কিন্তু সংগে সংগে গা মাথায় কাপড় ঠিক ক'রে নিয়ে ভালো হয়ে শুলেন। ভাবটা যেন, এসেছে যখন, দেখেই যাক একবার!

যশোদা রমার হাত ধ'রে টানল, চলো ভাই, আমরা ওদিকের ঘরটায় গিয়ে বসি।

এ পাশে ছোট ঘর। ঘর জোড়া প্রকাণ্ড খাট। আসবাবপত্র কিছু আছে কিন্তু সব কেমন এলোমেলো। গোছগাছ করা নয়, নিতান্ত এখানে ওখানে ঠেস দিয়ে রাখা।

খাটের ওপর যশোদা মাদুর পেতে দিল।

—বসো ভাই।

—না ভাই, বসব না। উনি এখনি ফিরবেন। বাড়ীতে তালা বন্ধ।

—বাবা, বাবা, সুন্দর বর যেন আর কারুর হয় না, তোমারই যা হয়েছে।

মাদুরে বসতে বসতে রমা টিপ্পনী কাটল, তা কেন ভাই, তোমার বরটিও তো বেশ সুন্দর।

—ওমা, এরই মধ্যে নজর দিয়েছ ? কিন্তু কখন দেখলে বল তো ? যশোদার হাসি শুরু হ'ল। নেহাৎ বাবা আর ডাক্তার পাশের ঘরে, তাই যশোদা হাসির উচ্ছ্বাসটা কষ্টে সামলাল।

কখন দেখল, বলল রমা, কিন্তু কিভাবে দেখল তা তো আর বলা যায় না মানুষকে। শুধু ওপরটাই নয়, মানুষটার ভেতর পর্যন্ত দেখে নিয়েছে চাউনীর রকমে।

হঠাৎ কথাটা রমার মনে পড়ে গেল, হ্যাঁ ভাই, কাল অনেক রাত্তিরে সিঁড়িতে জুতোর শব্দ, ওপরে গানের আওয়াজ শুনছিলাম।

কথা শেষ হবার আগেই যশোদা বিছানার উপর লুটিয়ে পড়ে হাসতে লাগল। কোমরের বুকের মাংসের খাঁজ থর থর ক'রে কেঁপে উঠল। মাথার চুল ওলোটপালোট। সারা মুখ লাল হয়ে উঠল। অনেকক্ষণ পরে হাসির বেগ একটু কমলে, হাত দিয়ে মাথার চুল ঠিক করতে করতে বলল, উনি, আমার জীবন-সর্বস্ব !

—অত রাতে ?

—বা, থিয়েটার ভাঙলে তবে তো আসবেন !

—ওঃ, থিযেটারে গিয়েছিলেন বুঝি ?

—হ্যাঁ ভাই, কিন্তু দেখতে নয়, করতে।

আচমকা রমা ঠিক বুঝে উঠতে পারল না কথাগুলো। হঠাৎ কিছু জিজ্ঞাসা করতেও ভয় হল। আবার হয়তো বিছানার ওপর যশোদা লুটিয়ে পড়বে। হেসে কুলকিনারা পাবে না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে হ'ল না।

যশোদাই বুঝিয়ে দিল, আমার কত্তা যে প্লে করেন গো। নবনিকেতন থিয়েটারে। আমার বিয়ের সময় যাত্রা করতেন, 'কালীয়-দমন,' 'শ্রীরামের বনবাস', 'অহল্যা-উদ্ধার' বড় বড় বই। কি রকম পয়মন্ত বৌ আমি দেখো, বিয়ের পরেই একেবারে থিয়েটারে প্রমোশন।

আশ্চর্য, এতগুলো কথা বলার পরেও যশোদা একটু হাসল না। মুচকি হাসিও নয়। বরং রমার যেন মনে হল ছলছলিয়ে উঠল দুটো চোখের পাতা, গালের রঙও ম্লান।

ব্যাপারটা তরল করার চেষ্টাতেই রমা বলল, ভালোই হ'ল ভাই। বিনা পয়সার তোমার কত্তার থিয়েটার দেখা যাবে। নিয়ে যাবে তো?

যশোদা ঘাড় নাড়ল,—ভাল একটা বই হবে যখন, তখন ব'লে দেখবো। খুব উৎসাহ নয়, নেহাৎ দায়সারা ভাব। কিন্তু ভাবান্তর রমার চোখ এড়াল না। ব্যাপার কিছুটা বোঝাই যাচ্ছে, নয়তো সাধ ক'রে ঘর-জামাই পোষে কেউ আজকালকার বাজারে! থিয়েটারের লোক সম্বন্ধে রমার বিশেষ কোন ধারণা নেই। কিন্তু নারী আর সুরার টানাপোড়েনে যে তাদের জীবন জড়ানো এটুকু সে বোঝে। বেদনার ফল্গুধারাটি উদ্দাম হাসির পলিমাটি চাপা দেওয়ার প্রয়াসই হয়তো। সেই জন্যই বুঝি যশোদা একটু বেশিই হাসে।

নিচে কাশির শব্দ হ'তেই রমা খাট থেকে নেমে জানলার ধারে এসে দাঁড়াল। বেচারা কমল। দরজার তালা দেখে রাস্তায় পায়চারি করছে। ঘরে ঢুকতে চায়, কাশির শব্দ তারই জানানো।

—আমি চলি ভাই, উনি এসে গেছেন। রমা চৌকাঠ বরাবর এসে দাঁড়াল।

—আর কি ক'রে থাকতে বলি ভাই, নিচের মানুষটা যে অধীর হ'য়ে পড়েছে। যশোদা হাসতে হাসতে পাশে এসে দাঁড়াল।

একটু এগিয়েই রমা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। বাইরের ঘরে এখনো ডাক্তার রয়েছেন বোধ হয়। জন দুয়েক লোকের গলা শোনা যাচ্ছে। ঘোমটা টেনে রমা একটু পিছিয়ে দাঁড়াল।

—এসো ভাই আমার সঙ্গে। যশোদা রমার পাশে পাশে এগিয়ে গেল।

বোধ হয় বাড়িওয়ালার জিজ্ঞাসু দৃষ্টির উত্তরেই যশোদা বলল, 'নিচের বাড়ির বউ' তারপর রমার সঙ্গে সিঁড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিল।

'এসো কিন্তু রোজ একবার ক'রে।'

সিঁড়ির মাঝ বরাবর গিয়ে রমা ফিরে দাঁড়াল। ঘাড় ফিরিয়ে হাসল। আসবে বৈ-কি, নিশ্চয় আসবে। কমল অফিসে যেতে শুরু করলে, একলা ঘরে কাটানো অসম্ভব রমার পক্ষে। ছুটে ছুটে তখন ওপরেই তো পালিয়ে আসতে হবে।

সকাল থেকেই রমার মুখ যেন, ভার ভার। সংসারের কাজ করার ফাঁকে ফাঁকে কমলের সঙ্গে কথা বলছে বটে, কিন্তু আনমনা ভাব। বেশিক্ষণ দাঁড়াচ্ছে না সামনে এসে।

—কি ব্যাপার, এত গম্ভীর যে? দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম তুলতে তুলতে কমল জিজ্ঞাসা করল।

—কি আবার ব্যাপার। রমা চট ক'রে সরে গেলো সামনে থেকে। কিন্তু অল্পক্ষণের জন্যই। আবার পাশে এসে দাঁড়াল। তোয়ালে মেলে দিতে দিতে বলল, আর গোটা সাতেক দিন ছুটি বাড়ালেই পারতে বাপু। এ যেন দেখতে দেখতে কেটে গেল।

কমল হাসল, খবরের কাগজের অফিসের চাকরি। বেশি ছুটি চাইলে একেবারে ছুটি দিয়ে দেয়। ছাঁটাইয়ের কাঁচি তো উঠিয়েই আছে। তারপর এগিয়ে এসে রমার থুতনিতে একটা হাত রেখে বলল, কিন্তু কেন বল তো? একলা থাকতে হবে তাই ভয়? কিন্তু এখন তো তোমার একগাদা বন্ধু জুটে গেছে। ওপরের যশোদা, আশে-পাশে গোপকন্যার সংখ্যাও কম নয়। ভীড়ে তো আমিই পাত্তা পাচ্ছি না।

—আহা, রমা ভুরু দুটো কোঁচকাল, দিন দুপুরে ভয় আবার

কিসের। তা বলছি না। কিন্তু অফিস যাওয়া মানেই তো চোদ্দদিন পরে আবার নাইট ডিউটি। সারা রাত একলা কাটাতে হবে।

ভবিষ্যৎ নিঃসঙ্গতার কথা ভেবেই রমার মুখ যেন থমথমে।

স্নানের ঘরে ঢুকতে ঢুকতে কমল মুখ ফেরাল, তা সত্যি, গোপ-কন্যারা বড় জোর সন্ধ্যা অবধি থাকতে পারেন। রাত কাটাতে তো আর কেউ রাজি হবেন না। বেশ, অফিসে গিয়ে বদলির লোক একটা ঠিক ক'রে নেব এখন। আমার অফিসের নাইট-ডিউটির বদলে তারা আমার বাড়িতে ডিউটি দেবে।

রমা তেড়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই কমল দরজা বন্ধ করে দিল। তারপর জল ঢালার শব্দ। রমার কথাগুলো যেন কানে না ঢোকে।

জানালার গরাদে মাথা রেখে রমা একদৃষ্টে চেয়ে চেয়ে দেখল। পথের বাঁকে কমল মিলিয়ে যাওয়ার অনেকক্ষণ পর পর্যন্ত। সারা দিনের হৈ-চৈয়ের মধ্যে যে কথাটা চাপা পড়ে গিয়েছিল, সে কথাটাই উঠল মাথা চাড়া দিয়ে। একলা থাকার ভয় রমার মোটেই নয়, লজ্জা। কিসের লজ্জা তাও কমলের অজানা নয়। বলা যায় না, ছোড়দা হয়তো আগেই বসে আছে অফিসে গিয়ে। নতুন বাসার পাত্তা নাই পেল, পুরোনো অফিসের ঠিকানা তো জানা। তারপর হয়তো দুজনে ব'সে ঘর ছাড়ার আলাপ আলোচনাই চলবে। ছোড়দা যে খুশীই হয়েছে এ কথাই জানাবে। পরিবর্তে কমল হয়তো নিমন্ত্রণই করে বসবে তাকে। যে কোন ছুটির দিন। কিম্বা যা পাগল মানুষ অফিস ফেরৎ হয়তো সঙ্গে করেই নিয়ে আসবে তাকে। সিঁথের সিন্দুর, মাথায় ঘোমটা টেনে ছোড়দার সামনে দাঁড়াতে রমার ভারি লজ্জা করবে।

কিন্তু তার চেয়েও অনেক বেশি লজ্জা করবে রমার, ছোড়দা যদি

কড়া কড়া কথা শোনায় কমলকে। একটা ভদ্র পরিবারের মর্যাদা নিয়ে ছিনিমিনি খেলার কৈফিয়ৎ তলব করে। এই বুঝি বন্ধুর কাজ? অন্তরঙ্গতার সুযোগ নিয়ে সর্বনাশ করা।

সত্যি সত্যিই সারাটা দুপুর রমা ছটফট করল। যশোদা দুপুরের দিকে একবার এসেছিল। কিছুক্ষণ গল্প করে চলে গেছে। এদিক ওদিক ঘুরে রমা নিজের বাক্স খুলে সেলাই নিয়ে বসেছিল। তাও ভালো লাগে নি। বেলা গড়িয়ে আসতে গা ধুয়ে চুল বেঁধে জানালার ধারে এসে দাঁড়াল।

সুখী সুখ দুঃখের কথা বলতে এসেছিল, বিশেষ আমল দেয়নি রমা। একদৃষ্টে পথের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছে। সত্যি যদি তাই হয়। কমলের পাশাপাশি ছোড়দাও ঘরে এসে ঢোকে! আধ ময়লা সার্ট, পুরোময়লা ধুতি। এক গাল দাড়ি কিন্তু এক মুখ হাসি।

'বা-রে, নতুন সংসার পেতে বসলি, আমাকে জানালিও না একবার।'

লজ্জায় প্রথম প্রথম রমা কথাই বলতে পারবে না। ঘোমটার ভেতর ঘামে ভিজে উঠবে। আসন পেতে দিয়ে কোন রকমে বলবে, 'বস ছোড়দা।' তারপর একটু একটু ক'রে সহজ হয়ে যাবে। ফেলে আসা বাড়ি ঘরের কথা, নতুন জীবনের কথা সব বলবে ছোড়দাকে। কোন কথা লুকোবে না। কিন্তু সত্যিই কি আসবে ছোড়দা?

ঝাঁকড়া বেলগাছের ফাঁকে কমলকে দেখা যেতেই রমা সরে এল। না, একলা নয় কমল, আরও কে একজন রয়েছে সঙ্গে। আবছা অন্ধকার। চোখ কুঁচকেও ভাল ক'রে দেখা যায় না। কিন্তু কমলকে ঘন অন্ধকারেও রমার চিনতে অসুবিধা হয় না। যত দূরেই থাক। কিন্তু আরও একজন আসছে পাশাপাশি। কথা বলতে বলতে।

গাছটার আড়াল পড়াতে ভালো ক'রে দেখাই যাচ্ছে না। একটু এগোতেই রমার ভুল ভাঙ্গল। উহুঃ, ছোড়দা নয়, কমল আর ওপরের বাড়ির জামাই। যশোদার কর্তা। বেড়ার আগল ঠেলে উঠানে পা দেবার সঙ্গেই রমা জানলার কাছ থেকে একেবারে ঘরের মাঝখানে সরে দাঁড়াল। তাইতো, ভুল হয়েছে। খেয়ালই হয় নি। হ্যারিকেনটা জ্বালানো উচিত ছিল। মানুষটা অন্ধকার ঘরে এসে পা দেবে!

কমল যখন ঘরে ঢুকল তখন রমা হ্যারিকেন জ্বালিয়ে ফেলেছে, কমলের চায়ের জলও চড়ানো শেষ।

কমল দরজার কাছে দাঁড়াতেই রমা বলল, 'বাব্বা'! কথা বুঝি আর শেষ হয় না। সারা রাস্তা গল্প ক'রে হ'ল না, আবার বাড়ীর দরজায় এসে এক ঘণ্টা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গুলতানি।

সার্ট খুলতে খুলতে কমল বলল, ভারি আমুদে লোক নীরেনবাবু। আমাদের বাড়ীওয়ালার জামাই। দেখো, আসল পরিচয়টাই বলতে ভুলে যাচ্ছি, তোমার সইয়ের বর।

—আহা, সই না আরো কিছু, দড়ির আনলা থেকে ধুতিটা পেড়ে এগিয়ে দিল।

—সে কি, এর মধ্যেই ভাব চটে গেল? কদিনের তো আলাপ।

রমা উত্তর দিল না। কাপড় ছাড়তে ছাড়তে কমল বলল, ঘন ঘন ভাবের লোক বদলালে আমার পক্ষে তো ভয়ের কথা, কিন্তু কথা আর শেষ করতে পারল না। রমার ডাগর চোখের জ্বলন্ত দৃষ্টি ওর ওপর। এ দৃষ্টির মানে কমলের অজানা নয়। মান অভিমানের ফাঁকে ফাঁকে এ দৃষ্টির সঙ্গে এর আগেও দু একবার পরিচয় হয়েছে। চেপে যাওয়াই ভালো।

একটু পরে রমাই কথা বলল। ইতস্ততঃ করল প্রথমে। চায়ের

কাপ ডিশ আর জলখাবারের থালা সরিয়ে রাখল কোণে তারপর আস্তে বলল, অফিসে কেউ আসে নি ?

গলার আওয়াজ এত মৃদু যে প্রথমটা কমলের কানেই গেল না কথাগুলো। রমার দিকে আরো এগিয়ে এসে বলল, কিছু বললে ?

—বলছি অফিসে কেউ আসে নি ?

কথাটা বুঝতে কমলের একটুও অসুবিধা হল না। রমার বাপের বাড়ীর লোকের কথাই জিজ্ঞাসা করছে। অফিসে প্রথম কিছুক্ষণ অবশ্য কমলেরও মনে হয়েছিল, নিশ্চয় কেউ আসবে। কেউ মানে অবশ্য রমার ছোড়দা। খোঁজ নেবার আগ্রহ ও বাড়ীতে আর কারুর যে নেই তা কমল ভালো ক'রেই জানে।

তবু বুঝেও কমল না বোঝার ভান করল, কার আসবার কথা ছিল অফিসে ?

এ কথার রমা কোন উত্তর দিল না। কার আসবার কথা থাকবে। কারুর নয়। এতদিন ধরে এইটুকু আশা আঁকড়ে বেঁচেছিল রমা। ছোড়দা ঠিক আসবে খবর নিতে! ছোড়দার কাছ থেকে বাড়ীর আর সকলের খবর পাবে।

উঠে রমা জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

বাইরে অন্ধকার নেমেছে। মাঝে মাঝে সঞ্চরমান দু একটা আলোর বিন্দু। লণ্ঠন হাতে ঝুলিয়ে মানুষ যাওয়া-আসা করছে। বিশ্রী অন্ধকার। দুটো চোখ কুঁচকেও অল্প দূরের কিছু দেখার উপায় নেই। হাতখানেক দূরের জিনিষই নজরে আসে না, ফেলে আসা পুরোনো জীবন তো নয়ই।

এবারে আর একটুও অসুবিধা হল না রমার। বেশ বুঝতে পারল, বংশে কালি দিয়ে বেরিয়ে আসা মেয়ের সঙ্গে কেউ আর সম্পর্ক রাখতে চায় না। বাবা, দাদা, বৌদি ওরা তো নয়ই, ছোড়দাও নয়। সেই

জন্যই খোঁজ নিতে আসা প্রয়োজন মনে করে নি। রমা বলে কোনদিন কোন মেয়ে ছিল ওদের বাড়ীতে, তাও হয়তো ভুলে গেছে ওরা। পাড়াপড়শীর খোঁজ খবরের উত্তরে কিছু একটা ঠিক বানিয়ে বলে দিয়েছে। গঙ্গাসাগরের মেলায় গিয়েছিল, ডুবে মরেছে কিম্বা কোন আত্মীয়স্বজনের বাড়ীতে গিয়ে অসুখে পড়েছিল, আর সেরে ওঠে নি, এমনি ধরণের কথা। বলবার সময় বৌদির গলা হয়তো সদ্যশোকের ছোঁয়ায় আর্দ্র হ'য়ে উঠেছিল, ছল ছল করে উঠেছিল দাদাদের চোখ। কিন্তু এ ছাড়া আর উপায়ই বা কি। সোমত্ত মেয়ে ভিন্ জাতের ছেলের হাত ধরে রাতের অন্ধকারে ঘর ছেড়েছে, এমন একটা কথা কি বলা যায় কাউকে! কিছু বলা যায় না, পথে ঘাটে কোনদিন ছোড়দার সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে হয়তো কথাই বলবে না, কিম্বা চোখ তুলে একবার দেখেই ভিড়ের মধ্যে গা ঢাকা দেবে। এমন একটা চিন্তাও রমার পক্ষে অসহ্য।

চোখের জল গড়িয়ে গাল ভিজিয়ে দিতেই রমা সচেতন হ'য়ে উঠল। কি সব আবোলতাবোল সে ভাবছে। হাত খানেক দূরে আর একটা মানুষ বসে আছে খেয়ালই নেই বুঝি। কি কৈফিয়ৎ দেবে এ চোখের জলের!

আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছে রমা কমলের সামনে এসে বসল। থমথমে মুখের ভাব। মৌশুমি মেঘে ঢাকা বর্ষার আকাশের মতন।

আড়চোখে কমল চেয়ে চেয়ে দেখল। সরে কাছে এসে বসে দরদভরা গলায় বলল, ব্যস্ত হবার কিছু নেই। সমীর ঠিক আসবে একদিন, দেখো। শুধু অফিসে নয়, বাড়ীতেও আসবে। তোমায় না দেখে কদিন থাকবে?

রমা মাথাটা নিচু ক'রে রইল।

অন্য কথা বলার চেষ্টা করল কমল, জানো, ওপরের নীরেনবাবু খুব ভালো থিয়েটার করেন।

—শুনেছি, রমা যেন খুব উৎসাহ প্রকাশ করল না।

—একদিন দেখতে গেলে হয়। ভদ্রলোক তো খুব ক'রে বললেন।

—যশোদাদিও বলছিল। আমি বলেছি, ভালো বই হ'লে যাবো আমরা। একটু থেমেই রমা বলল, ভদ্রলোক ঘরজামাই থাকেন কেন?

—ক্ষতি কি? কমল হাসল, বাড়ীওয়ালার তো একটি মাত্র মেয়েই সম্বল এখন। বাকি সব মরে হেজে ওই শিবরাত্রির সলতেটুকুতে ঠেকেছে। বুড়ো বয়সে মেয়ে জামাইকে নিজের কাছে এনে রেখেছেন।

—কি জানি, ঘরজামাইদের আমার ভাল লাগে না, রমা ঠোঁট উল্টে মুখের অদ্ভুত ভঙ্গী করল।

—আমার কিন্তু বেশ লাগে, কমল গম্ভীর গলায় বলল, আমার মেয়ে হ'লে বাবাজীকে আমি ঘর জামাই রাখব।

—যাও, ভারি অসভ্য তুমি। রমা ঝাঁপিয়ে পড়ল কমলের ওপর।

কমল আদর ক'রে রমাকে কাছে টেনে নিয়ে যাওয়ার মুখেই বাধা। দরজায় ঠক্ ঠক্ শব্দ, সঙ্গে গলার আওয়াজ, কমলবাবু আছেন নাকি? ও কমলবাবু।

কমল উঠে দরজা খোলবার আগেই রমা ভিতরে চলে গিয়েছিল। নীরেনবাবুর গলা। ভদ্রলোক থিয়েটারে যাবার মুখে বোধ হয় খোঁজ খবর নিতে এসেছেন।

—আসুন, আসুন, দরজা খুলে কমল অভ্যর্থনা করল।

—আসব বৈ কি মশায়, একশোবার আসব। এসে এসে জ্বালাতন করে তুলব আপনাদের। কমলের পাশ কাটিয়ে নীরেনবাবু একেবারে পাতা সতরঞ্চে এসে বসলেন। প্রথমে খবরের কাগজ দিয়ে তারপর কমলের এগিয়ে দেওয়া হাতপাখা দিয়ে হাওয়া খেতে খেতে বললেন,

কৈ মশাই, এককাপ চা খাওয়ান। বিশ্রী গরম পড়ে গিয়েছে। ওপরে শাশুড়ী ঠাকুরুণকে দেখতে ডাক্তার এসেছে, ডেকে ডেকে কারুর সাড়াশব্দ পেলাম না।

'বিলক্ষণ'—কমল লাফিয়ে উঠে পড়ল। চৌকাঠের কাছে আসতেই রমা ফিসফিসিয়ে বলল, শুনতে পেয়েছি। তুমি বসো গিয়ে, চা হয়ে গেলেই আমি দরজার শেকল নাড়ব। তুমিও এক কাপ খাবে তো।

কমল বলল, অমৃতে অরুচি আমার হয়েছে কোনদিন?

তা রমা ভালো করেই জানে। হাজার অসুবিধার মধ্যে ছোড়দার ঘর থেকে খবরের কাগজ এনে কতদিন চুপি চুপি চা ক'রে দিয়েছে রমা। চা আর বিলিতী দুধের টিন লুকোনো থাকত ওর বাক্সের তলায়। কমলেরই আনা। সমীর আর কমল—তর্কের ফাঁকে ফাঁকে চা না হ'লে আসরই জমতো না।

কমল ফিরে গিয়ে বসতে বসতে বলল, আপনার থিয়েটার নেই আজ?

—না মশাই, আজ ছুটি। সোমবার আর বুধবার এ দুটো দিন আমাদের রবিবার। স্টেজ বন্ধ থাকে। আর যা দিনকাল ক্রমশঃ হয়ে আসছে, একেবারেই বন্ধ হয়ে যাবে। সিনেমা উঠে না গেলে থিয়েটারে আর মানুষ আসবে না। অথচ ছবিতে কি যে পায় মানুষ। দূর দূর, রুচির বলিহারি। কথার মাঝখানেই সিগারেটের প্যাকেটটা নীরেনবাবু কমলের দিকে এগিয়ে দিলেন।

কমল ঘাড় নাড়তেই বললেন, খান না, বাঁচালেন মশাই। একটাই ছিল প্যাকেটে। আমিই তা হ'লে ধরাই, কি বলেন?

দেশলাইয়ের কাঠিটা জানলা দিয়ে ফেলে দিয়ে নীরেনবাবু কথার খেই ধরলেন, তারপর আর এক মুস্কিল, যে একটু নাম করেছে স্টেজে,

তাকেই অমনি ডিরেক্টররা ছেঁকে ধরছে। মুঠো মুঠো টাকা, চেকদার বিজ্ঞাপন, ব্যস, দুদিনে একেবারে আকাশে উঠিয়ে দিচ্ছে তাকে। খেদি, পটলী, নয়নতারা সব এক একজন জাঁদরেল ষ্টার। এখন দেখা করতে গেলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গেটে দাঁড়িয়ে পা ব্যথা হয়ে যায় মশাই, অথচ প্রথম প্রথম আমাদের এখানে গড়গড় ক'রে এক লাইন পার্ট বলতেও পারত না। যেমনি চেহারা, তেমনি উচ্চারণ, হুঃ—অনেকটা যেন আফশোষের ভঙ্গীতেই নীরেনবাবু জ্বলন্ত আধখাওয়া সিগারেটটা ঝোঁকের মাথায় জানলা দিয়ে বাইরে ফেলে দিলেন।

—সত্যি, থিয়েটারের অবস্থা তো কাহিল তা হ'লে। কমল নেহাৎ কিছু একটা বলা দরকার এই ভাবেই বলল।

বন্ধু-বান্ধবদের পাল্লায় প'ড়ে থিয়েটার সে কয়েকবার দেখেছে বটে, সিনেমা দেখেছে অবশ্য অনেক বেশি কিন্তু তুলনামূলক সমালোচনা করার কথা মনে হয় নি কোনদিন। থিয়েটার থিয়েটার, সিনেমা সিনেমা। একটার রক্ত চুষে অন্যটি পুষ্টিলাভ করছে এ ধরনের কথা কোনদিনই মনে হয় নি। মনে হয়েছে দুটি বিভিন্ন শিল্পকলা। সুষ্ঠুভাবে দুটোরই বাঁচার প্রয়োজন।

কাহিল ব'লে কাহিল, নীরেনবাবু উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, গলার স্বর খাদে নামিয়ে বললেন, তিন মাসের মাইনে বাকী, চাইতে গেলেই ম্যানেজার বিক্রির হিসেব দেখায়। যে টাকার মাসে টিকেট বিক্রী হয়, তাতে হল-ভাড়াই মেটে না। অথচ অভিমন্যু বধ থেকে শুরু করে হালফ্যাসানের রাঙাপথ—দু-তিন মাসের মধ্যে তিনখানা আনকোরা বই নামানো হল, কিন্তু পাবলিক নিল না। পেছনের খান কয়েক বেঞ্চি ভর্তি হয়, সামনের চেয়ার খালি, নয়তো ম্যানেজারের চেনাজানা লোক এনে বসিয়ে রাখতে হয়। অথচ সিনেমায় দেখুন মশাই, বই শুরু হবার তিন দিন আগে থেকে কি ভিড়, কি ভিড়। ট্রাফিক পর্যন্ত বন্ধ

হবার যোগাড়। : নীরেনবাবু দেয়ালে হেলান দিয়ে বসলেন। চোখে মুখে হতাশার আর অবসাদের মিশেল।

—যুগের হাওয়া, এখন সিনেমার ঢেউ উঠেছে, হুজুগে ছেলে বুড়ো সব পাগল, কমল খুব চিবিয়ে চিবিয়ে বলল।

কথাগুলো অবশ্য ওর নয়, ওদেরই কাগজের সিনেমা-এডিটরের মুখে শোনা। কিন্তু কাজ হল। দেয়াল ছেড়ে নীরেনবাবু সোজা হয়ে বসলেন, একেবারে লাখ কথার এককথা বলেছেন মশাই। হুজুগ ছাড়া আর কিছু নয়। বাঙালী জাতটা চলেছে হুজুগের টানে। কিছুদিন 'নেতাজী' 'নেতাজী', ক'রে হৈ চৈ চেঁচামেচি, তারপর সে ভাবটা কমতেই 'রিফুজী' 'রিফুজী' ক'রে চীৎকার। আশ্চর্য জাত। মনের ক্ষোভে নীরেনবাবু আর একটা সিগারেট ধরাবার জন্য পকেটে হাত ঢুকিয়েই অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন। শেষ সিগারেটটি কয়েকটা টান দিয়ে ফেলে দিয়েছেন সে-কথা মনে পড়ল।

নীরেনবাবুর অপ্রস্তুত ভাবটা কমলের চোখ এড়াল না। হেসে বলল, সিগারেট ফুরিয়ে গেছে বুঝি, দাঁড়ান আমি আনবার ব্যবস্থা করছি।

কমল দাঁড়িয়ে উঠতেই নীরেনবাবু হাঁ হাঁ করে উঠলেন, পাগল না মাথা খারাপ! সিগারেট আনাবার জন্য ব্যস্ত হবার দরকার নেই। এমন নেশা নয় মশাই, যে কিছুক্ষণ না টানলে পেট ফুলে উঠবে। আপনি বসুন।

অবশ্য কমলকে বসতেই হল। এ সময় সুখীও নেই, আনতে হলে নিজেকেই দৌড়তে হবে। যাক ভালই হল। মনে মনে কিন্তু কমল ঠিক করে ফেলল, এক টিন সিগারেট এনে রাখতে হবে অতিথি অভ্যাগতদের জন্য। নিজে খায় না বলে মানুষজনকেও দেবে না, তা হতে পারে না।

দরজায় ঠক্ ঠক্ আওয়াজ।

দরজার পাশে রমার শাড়ীর খানিকটা, চুড়িসুদ্ধ হাত নীরেনবাবুর নজর এড়াল না।

কমল ওঠবার আগেই নীরেনবাবু আবার চেঁচিয়ে উঠলেন, কেন আর ভদ্রলোককে টানা হ্যাঁচড়া করবেন, আপনিই নিয়ে আসুন না বৌঠান। আমি তো ঘরের লোক, আমাকে আবার লজ্জা, বিশেষ ক'রে যখন এক বাড়ির বাসিন্দা।

উঠতে গিয়েও কমল বসে পড়ল। দরজার দিকে চেয়ে বলল, ঠিক কথা, রমা, তুমিই নিয়ে এসো চায়ের কাপ। নীরেনবাবু তো সত্যিই ঘরের লোক। এস এস।

কপালে গালের ভাঁজে রমার বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠল। ডান-হাতটা কেঁপে উঠলো থর থর ক'রে। এখনি বুঝি কাপ-ডিশ ভেঙ্গে কেলেঙ্কারীই হবে একটা। খুব সাবধানে রমা মেঝের ওপর চায়ের কাপটা নামিয়ে রাখল। আঁচল আঙুলে জড়িয়ে ঘাম মুছে নিল। পরণের শাড়িটা ঠিক ক'রে নিল হাত দিয়ে। ঘোমটা আরও চার আঙুল নামিয়ে দিল—কপালের মাঝ বরাবর।

—কি হ'ল রমা? কমল অনেকটা যেন সাহস দেবার ভঙ্গীতেই বলল।

আচ্ছা মানুষ! লোকের সামনে কাউকে অপ্রস্তুত করতে পারলে আর কিছু চায় না। কি দরকার ওর যাবার, বিশেষ ক'রে ওই ড্যাবড্যাব ক'রে চেয়ে থাকা লোকটার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে কি বিশ্রী যে লাগে। কি রসিকতা করবে ঠিক আছে!

কিন্তু উপায় নেই। দু-হাতে চায়ের দুটো কাপ নিয়ে খুব সাবধানে রমা এগিয়ে গেল। আন্দাজে বুঝতে পারল পা-দুটো অসম্ভব কাঁপছে। চোখ তুলে চাইবার সাহসটুকুও হারিয়ে ফেলেছে।

কমল প্রস্তুত ছিল। রমা এগিয়ে আসতেই উঠে দাঁড়িয়ে হাত থেকে চায়ের কাপ দুটো নামিয়ে নিল। একটা কাপ সরিয়ে দিল নীরেনবাবুর সামনে, আর একটা রাখল নিজের কাছে।

—নমস্কার বৌঠান, নীরেনবাবু চায়ের কাপ তোলার ফাঁকে বললেন।

—নমস্কার, আড়ষ্ট গলা। রমা ঘোমটার ভিতর ঘেমে উঠল।

—জানো, নীরেনবাবু খুব ভাল অভিনয় করেন। কমল অনেকটা সহজ। বন্ধুর কাছে নিজের স্ত্রীকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে এমন একটা ভাব।

—শুনেছি, রমা কোণে জড়সড় হ'য়ে দাঁড়াল।

—কার কাছে শুনলেন? যশীর কাছে বুঝি? নীরেনবাবু একগাল হাসলেন।

রমা ঘাড় নাড়ল। চুড়ির ঝুনঝুন শব্দ। সরে আসা ঘোমটা টেনে দেওয়ার চেষ্টা।

—একদিন নিয়ে যাব আপনাদের। ভাল বই একটা শুরু হোক।

রমা মুখ তুলেই লজ্জা পেল। নীরেনবাবুর মুগ্ধ দৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়ে থাকতেও যেন অসুবিধা হয়। লাজ-লজ্জার ধার ধারে না লোকটা। কমলের সামনেই বিস্ফারিত দুটি চোখের দৃষ্টি মেলে দেখছে রমার মুখের দিকে। খুঁটিয়ে সৌন্দর্য যাচাই করার ভঙ্গীতে।

—না, যশী সত্যি কথাই বলেছে।

—কি কথা? চুমুক শেষ ক'রে কমল ডিশ নামিয়ে রাখল।

—বৌঠান, লক্ষ্মীপ্রতিমা। নীরেনবাবু চোখ নামালেন না।

আর তিলমাত্র রমা দাঁড়াল না সেখানে। জোর পা ফেলে ওদিকের ঘরে চলে গেল। ছি, ছি, কি ঘেন্না! থিয়েটারের লোকগুলোর কি মুখের আগঢাক নেই? যা মনে আসে তাই বলে। কি মনে করল কমল।

কমল যে কিছুই মনে করেনি তা বোঝা গেল তার উচ্চকিত হাসিতে। দুটো হাঁটু চাপড়ে হাসির যেন আর শেষ নেই। আশ্চর্য, স্বল্পবাক এ মানুষটার এত উচ্ছ্বসিত হবার কি কারণ ঘটল। নাকি মনের আসল ভাব চাপা দেবার চেষ্টা করছে নকল হাসির তোড়ে।

—প্রথম আলাপেই দিলেন তো চটিয়ে? হাসি থামতে কমল কথা বলল।

—চটে গেলেন? কেন, সত্যি কথাই তো বলেছি! নীরেনবাবুর গলায় অকৃত্রিম বিস্ময়।

—সত্যি কথা সব সময়ে সব জায়গায় বলতে আছে? কমলের সুরে হাসির আমেজ।

মিনিট পনেরো। নীরেনবাবু উঠে পড়লেন। থিয়েটার নেই বটে, কিন্তু শহরের দিকে একবার যাওয়া দরকার।

নীরেনবাবু চৌকাঠ পার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রমা ঝাঁপিয়ে পড়ল কমলের ওপর, তোমার আক্কেলটা কি শুনি?

—কেন, বেয়াক্কেলেপণা কি দেখলে?

—ওই সব লোকের সামনে বেরোতে বল কেন? কি বিশ্রী চাউনী, হাড়জ্বালানো কথাবার্তা?

—সে কি গো, তোমার রূপের তো প্রশংসাই করল, কমল মুখ টিপে হাসলো, তোমাকে লক্ষ্মীপ্রতিমা বলা মানেই প্রকারান্তরে আমাকে লক্ষ্মীপেঁচা বলা, তা জানি; কারণ আমি যে তোমার বাহন এ কথাটি আশে-পাশের লোকেরা এ কদিনেই জানতে পেরেছে।

—আহা, ন্যাকামী করতে হবে না, রমার গলার আওয়াজে বেশ বোঝা গেল রাগ অনেকটা পড়ে এসেছে। ঝাঁজও অনেকটা কম।

—যাক, কাজের কথা শোন, এসে অবধি গোলমালে আর বলাই হচ্ছে না। কমল জানলার গরাদ ধ'রে ঘুরে দাঁড়াল।

রমা কাছে সরে এল। কি আবার দরকারী কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেল। অকাজের মানুষের আবার কাজের কথা।

—সামনের বুধবার আমার ছুটির দিন। অফিসের ডিপার্টমেন্টের সবাই ধরেছে, বিয়েতে নাকি ফাঁকি দিয়েছি, সেইদিন খাওয়াতে হবে। কি করি বলতো? ভুরু কুঁচকে কমল রমার দিকে চেয়ে রইল। অথৈ জলে পড়েছে এমনি ভাব চোখ মুখের। রমা ছাড়া হাত ধ'রে টেনে তোলবার আর যেন কেউ নেই।

রমা এমন সুযোগ ছাড়ল না। মুখ টিপে হেসে বলল, তুমি বললে না কেন, বিয়েতে নিজেই ফাঁকিতে পড়ে গেছি, তোমাদের আর কি ফাঁকি দিয়েছি?

—ফাঁকিতে পড়ে গেছি, কেন?

—বা রে, এক তো কুশ্রী মেয়ে, তার ওপর বিয়ে ক'রে লাভের অঙ্ক তো ছাই, লোকসানের ভাগই ষোলআনা—

রমার আর বলার উপায় রইল না। কমল এগিয়ে এসে হাত দিয়ে চেপে ধরল মুখ। আর এক হাত দিয়ে বেচারীর বিকালের সযত্নে বাঁধা খোঁপা টান দিয়ে খুলে দিলো। বহুকষ্টে রমা মুখ থেকে হাতটা সরিয়ে দিয়ে কাতর অনুনয় করল, দোহাই তোমার, পায়ে পড়ছি গো, আর বলব না। দরজা খোলা রয়েছে, ঘরে কেউ ঢুকে পড়লে কেলেঙ্কারী হবে।

কিন্তু কমল নাছোড়বান্দা। হোক কেলেঙ্কারী। দুষ্টুমী করার উপযুক্ত শাস্তি রমার পাওয়া উচিত। খোলা দরজার সামনে কাতার দিয়ে দাঁড়াক নীরেনবাবু, শ্বশুরশাশুড়ী সকলকে নিয়ে। লক্ষ্মীপ্রতিমার হেনস্তাটা স্বচক্ষে দেখুক।

অনেক মিনতি করার পর কমল ঠাণ্ডা হল। রমাকে ছেড়ে কাগজ পেন্সিল নিয়ে নিমন্ত্রিতের হিসাব শুরু করল।

বাদ সাদ দিয়েও প্রায় জন পনেরো লোক দাঁড়াল। অবশ্য কমলের ইচ্ছা অফিসসুদ্ধ লোককেই বলে। আনন্দবাবুকে কি বাদ দিলে চলে, রোজ চোখাচোখি হচ্ছে, ক্যাস ডিপার্টমেণ্টের কানাইবাবু, তারপর স্পোর্টসের মৃত্যুঞ্জয় সেন, ভারি আমুদে লোক, মানুষকে হাসিয়ে মারে। তিল কুড়োতে কুড়োতে তাল। এমনভাবে বলে কমল, ছেঁটে বাদ দিতেও রমার লজ্জা করে। জায়গার অকুলান, রান্নার বাসনপত্রের অভাব, বেশি হৈ চৈ করে লাভ নেই এ সব ওজর কাটিয়ে দেয় কমল। এক কথা। বাদ ছাঁট দেওয়া আবার কেন। জানাজানি হয়ে গেলে অফিসে মুখ তুলে চাইতে পারবে না কমল। ঠাট্টা মস্করার চোটে কান পাতাই দায় হবে।

বহু আলোচনার পর ওই জন পনেরো বহাল রইল। কেবল সব-শেষে কমল নীরেন বাবুর নামটা জুড়ে দিল।

—বারে, তাহলে আমার বন্ধুই বা বাদ কেন? রমা চেঁচিয়ে উঠল।

—কেন আবার মেয়েছেলের হাঙ্গামা করা, কমল আড়চোখে চাইল রমার দিকে।

—বেশ, তাহ'লে সেদিন ভোরে উঠে আমি যেদিকে দুচোখ যায় চলে যাব, তোমরা পুরুষরা মিলে সব বন্দোবস্ত করো।

এখনি চলে যাবে এমন একটা ভঙ্গী করে রমা উঠে দাঁড়াল।

সর্বনাশ, তোমাকেই দেখতে সব আসছে, আমি তো নিমিত্তমাত্র। তোমার গেলে কখনও চলে? বেশ, এই দেখো লিখলাম, শ্রীমতী যশোদাদুলালী দাসী।

—দুলালী আবার কেন?

—তোমার আমার নাই হল। ওর বাপ মায়ের তো বটে।

কমল উঠে পড়ল। দড়ির আলনা থেকে জামাটা তুলে নিয়ে গায়ে পরল। তারপর দরজা খুলে বেরোতে বেরোতে বলল, হাতে তো

সময়ও আর নেই। যাই গণেশালয়ে একবার খোঁজ করে আসি। আগে থেকে বলে না রাখলে জিনিস পাওয়াই মুস্কিল হবে।

কমল ফটক খুলে বেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত দরজার কবাটে হাত রেখে রমা চেয়ে চেয়ে দেখল। অজস্র জোনাকীর সার। ফিকে অন্ধকার। তার মাঝখানে অপসৃয়মান সাদা জামা কাপড়ের আবছা আভাস।

সকাল থেকে রমার নিঃশ্বাস ফেলার অবকাশ নেই। প্রায় এক হাতেই সব। অবশ্য সকাল থেকেই ঘোরাফেরা করেছে যশোদা। জিনিসপত্তর এগিয়ে এগিয়ে দিচ্ছে। গতর নিয়ে ভারি কাজ করতে গেলেই হাঁপিয়ে পড়ে। ঘামে ভিজে একশা। অবস্থা দেখে রমা তাকে পানের সরঞ্জাম সামনে দিয়ে বসিয়ে দিল। তাড়াহুড়া নেই, আস্তে আস্তে সাজলেই হবে।

নীরেনবাবু সকালের দিকে একবার উঁকি ঝুঁকি দিয়েছিলেন, কিন্তু কমল বড্ড ব্যস্ত থাকায় মজলিশ জমাবার সুবিধা হয় নি। আড় চোখে স্ত্রীর দিকে চেয়ে মুচকি হেসে বলেছে, কিগো, নেমন্তন্নর গন্ধে ভোর থেকে যে এসে জুটেছ?

আঁচল ঘুরিয়ে হাওয়া খেতে খেতে যশোদাও উত্তর দিতে ছাড়ে নি, তুমিই বা কি বাদ রয়েছ। কমলবাবুকে খোঁজবার ছুতোয় কেবল তো রান্নাঘরের কাছে ছোঁক ছোঁক করছ।

কথাটা যশোদা পরিহাসের ছলে বললেও উনানের সামনে দাঁড়িয়ে রমার মুখ চোখ লাল হয়ে উঠল। কি জানি লোকটাকে কেন যে সে বরদাস্ত করতে পারে না। চালচলন চাউনি সব যেন কেমন কেমন। হয়তো যশোদার কথাই ঠিক। কমলের সঙ্গে দেখা করার ছুতোয় রমাকেই দেখে যাচ্ছে। থিয়েটারের লোকের ওপর রমার চিরকালের বিতৃষ্ণা।

কজনই বা লোক। কমল পরিবেশন করল। চৌকাঠ পর্যন্ত রমা জিনিস এগিয়ে দিল। হৈ হল্লা নয়, চেঁচামেচি নয়। চুপচাপ করে খেয়ে গেল সবাই। খুব ভাল লাগল রমার। শুধু নিছক ভাল লাগাই নয়, ওর মনে হলো এই উৎসবের মধ্য দিয়ে ও যেন জাতেও উঠল। সাধারণ বিয়ের পরে বউভাতের একটা অনুষ্ঠানের মতন। আত্মীয়স্বজন বন্ধু বান্ধবের পাতে ভাত দিয়ে বউ নিজের আসন কায়েমী করে নেয়। আরও ভালো লাগল রমার, কমলের সহকর্মীরা উপহারও বয়ে এনেছে। শাড়ি, সিঁদুর-কৌটা থেকে শুরু ক'রে রজনীগন্ধার গোছা। তিন আইনের সরুপাক বড়ো যেন কমজোর, পলকা। মন খুঁত-খুঁতুনির অন্ত ছিল না রমার। আজ যেন বাঁধন শক্ত হল। আগুন সাক্ষী রেখে নয়, মানুষ সাক্ষী রেখে। রমা আজ কমলের ঘরের ঘরনী। এত দিন শুধু মনের কারসাজী ছিল, আজ সমাজও স্বীকার করে নিল।

নিমন্ত্রিতদের সঙ্গে কমলও বেরিয়ে গেল। এগিয়ে দেবার নাম করে বেরোল বটে, কিন্তু রমা জানে এ বেলা আর বাড়ি ফিরছে না কমল। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে ঠিক তাদের কারো মেসে গিয়ে উঠবে কিংবা তাদের কারো পাল্লায় পড়ে কোন সিনেমায়। এমন মানুষ, কারোর উপরোধ এড়াবার মতন জোর নেই।

খেতে বসে যশোদা কথাটা বলল, আমার এমন লজ্জা করছে ভাই কি বলব ?

কলাপাতা টেনে নিয়ে রমাও বসে পড়েছিল সামনে। বেলা হয়ে গিয়েছে। রান্নাঘরে সুধীকেও খেতে দেওয়া হয়েছে। তাড়াতাড়ি সব পাট চুকিয়ে ফেলাই ভাল। ভোর ভোর উঠে রমা কাজে লেগেছে, সব শেষ করে একটু জিরোতে পারলে যেন বাঁচে।

যশোদার কথায় মুখ তুলে চাইল, কেন, লজ্জা কিসের ?

—তোমাদের বিয়ের ব্যাপার তা কি জানি ভাই। আমরা একেবারে খালি হাতে খেয়ে গেলাম।

—আহা হা, রমা তেড়ে উঠল, তুমি আবার খালি হাতে না আসবে কেন? খুব তাড়াতাড়ি বিয়েটা হয়ে গেল বলে, ওর বন্ধুদের বলা-ই হয় নি, সেই জন্যই নেমন্তন্নর আয়োজন। তুমি তো বাড়ির লোক, তুমি আবার জিনিস হাতে ক'রে খেতে আসবে? সে রকম করলে ঝগড়া হয়ে যেত।

যশোদা ছাড়ল না। খাওয়ার ফাঁকে বলল, তবু ভাই, ছোট বোনকে আমার কিছু দেওয়া উচিত বৈ কি।

—ছোটবোনকে? জল খেয়ে মাটির ভাঁড় নামিয়ে রাখল, ছোটবোনকে একটা সিঁদুর-কৌটো আর রঙীন শাড়ী দেওয়াটাই বুঝি বড়ো কথা। কেন মন উজাড় ক'রে ভালোবাসা দিতে নেই, বুক ভরে স্নেহ?

রমার গলার আওয়াজে যশোদা চমকে মুখ তুলল। শুধু গলার আওয়াজটাই ভিজে নয়, রমার চোখ দুটোও যেন চিক চিক করছে। আরক্তিম দুটি গাল।

যশোদা হয়ত বুঝবে না, কিন্তু কি ক'রে বোঝাবে রমা, মানুষের কাছে সে শুধু স্নেহের কাঙাল, ভালবাসার প্রার্থী। বাবা, দাদা, বৌদি সকলের কাছে সে উপেক্ষা আর অবহেলা পেয়েই মানুষ। উঠতে বসতে শুধু কড়া কথা। রুক্ষ সেই ধু ধু বালির মাঝখানে চিক চিক করে সোনার টুকরো। তার ছোড়দার ভালোবাসা। সেদিন সেটুকুই সম্বল ছিল কিন্তু সে সংসার থেকে সরে এসে মনে হচ্ছে যে, সেদিনের চাকচিক্য, যা সে সোনার টুকরো মনে করেছিল, তা হয় মরীচিকা নয় বালিরই কণা। তার ওপর নির্ভর করা যায় না। তা না হলে এতদিন হ'য়ে গেল, ছোড়দা কি সামান্য একটা খবরও নিতে পারত না। শুধু একটু মুখের কথা। রমা কেমন আছে সেটুকু সংবাদ!

সম্বল শুধু কমলের বুকভরা ভালোবাসা, আর আজকের মানুষ-গুলোর শুভেচ্ছা আর প্রীতি। তার নতুন ঘর বাঁধবারই প্রেরণা কেবল নয়, মন বাঁধবারও। তাই আজ আর অন্য কিছু নয়, অফুরন্ত ভালোবাসা চায় রমা। সকলে তাকে কাছে টেনে নিক, মিষ্টি কথা বলুক, নতুন ক'রে শোনাক আশার সঞ্জীবনী বাণী। জিনিষপত্রে তার প্রয়োজন নেই। দাঁড়াবার আস্তানা শক্ত হোক, দৃঢ় হোক পায়ের তলার মাটি, তারপর আর সব।

সব চুকতে বিকেল গড়িয়ে গেল। কমলের বন্ধুদের দেওয়া উপহারগুলো তুলে রেখে মেঝের আঁচল পেতে সবে রমা একটু শোবার আয়োজন করছে এমন সময় দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ।

ধড়মড় ক'রে রমা উঠে পড়ল। কমল নয়। কমলের কড়া নাড়ার ধরণই আলাদা, মানুষটার মতনই মৃদু। একবার ঠুক ক'রেই চুপ। আর কড়া ছোঁয় না। সংসারের কাজ সেরে এক সময়ে রমা এসে খুলে দেবে। তাড়াহুড়ো নেই। এ কিন্তু জোর আওয়াজ কড়ার। বিলম্ব সইবে না এমন একটা ভাব। বলা যায় না, নীরেনবাবুই আবার এসে জুটল কি না। কমলের ছুতো করে আর একবার উঁকি দিতে।

গায়ে মাথায় কাপড় ঠিক করে দিয়ে আস্তে রমা দরজার পাল্লা একটু খুলল। চৌকাঠের এপারে ঢুকতে দেওয়া নয়। একেবারে ধুলো পায়েই বিদায়। কমল বাড়ী নেই, কখন ফিরবে তাও জানা নেই রমার। ব্যস।

খুলেই রমা অপ্রস্তত।

দেয়ালে হেলান দিয়ে যশোদার মা দাঁড়িয়ে। দিন কয়েক হলো খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে তিনি চলাফেরা করছেন তা রমা লক্ষ্য করেছে। কিন্তু একেবারে ওপর থেকে নিচেয়!

—একি আপনি, এত কষ্ট করে নেমে এলেন, আমায় ডেকে পাঠালেই পারতেন? রমা তাড়াতাড়ি হাত দিয়ে দরজার দুটো পাল্লাই খুলে দিল। ঘরের কোণে গোটানো মাদুরটা খুলে মেঝের ওপর পেতে দিল।

—আসুন মাসিমা!

—আসুন বললেই বুঝি আসা যায়? মানী অতিথি, এগিয়ে এসে হাত ধর। যশোদার মা হাসতে লাগলেন।

ব্যাপারটা বুঝল রমা। সিঁড়িতে রেলিং ধরে কোন রকমে নেমেছেন, এখন সাহায্য না করলে এগোন মুস্কিল।

মেঝের ওপর বসে যশোদার মা এদিক ওদিক চেয়ে দেখলেন, সাজানো আলনা থেকে টেবিলের ওপরে রাখা ফুলদানী পর্যন্ত। জানলার রঙীন পর্দার দিকে চোখ রেখে বললেন, বাঃ, ঘরটা তো বেশ গুছিয়েছ। ছেলে বুঝি খুব সৌখীন!

রমা মুখ নীচু করে রইল। মনে মনে ভাবল, হ্যাঁ, খুব সৌখীন ছেলে! কেবল জিনিষ কিনে এনে দিয়েই খালাস। সারা দুপুর খেটে-খুটে রমা নিজে সব সাজিয়েছে, গুছিয়েছে। অবশ্য দামও পেয়েছে পুরো মাত্রায়। কমলের মুগ্ধ চোখের চাউনির দাম রমার কাছে অনেক।

যশোদার মা আসল কথায় এলেন, আজ তোমাদের বাড়ীতে কিসের ঘটা ছিল বল দিকিনি। যশোদা তো একপেট খেয়ে আইঢাই করতে করতে উঠল। জিজ্ঞাসা করলাম, হ্যাঁরে কি ব্যাপার, কি এত খেলি, তা মেয়ে হ্যাঁও নয়, হুঁও নয়, বিছানায় গিয়ে শুল। এত খাওয়া দাওয়া কিসের জন্য?

রমা একটু ইতস্ততঃ করল। লজ্জা লজ্জা ভাব, তারপর আস্তে আস্তে বলল, হ্যাঁ ঘটা না ছাই, ওই বিয়ের সময় ওঁর যে সব বন্ধুদের বলা হয় নি, তাদের খেতে বলা হয়েছিল।

—'অঃ' যশোদার মা পা দুটো ছড়িয়ে দিলেন। বেশীক্ষণ একভাবে বসলে টনটন করে। রোগে শরীরে আর কিছু রাখে নি, একেবারে ফোঁপরা করে দিয়েছে।

—তা ভাইদেরও বলেছিলে তো? জানালায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম। সবই ক্যালো চেহারা। কোন্ দুটি চিনতে পারলাম না। ভাইদের রং বুঝি তোমার মতন নয়?

কয়েকটা মুহূর্ত। রমার মনে হল বিরাট একটা যন্ত্র দিয়ে কে যেন ওর শরীরের সমস্ত রক্ত শুষে নিল এক নিমেষে। শুধু রক্ত নয়, সমস্ত শক্তিও। চোখের সামনে চাপ চাপ অন্ধকার। বাড়ীর দেয়াল, আসবাবপত্র, যশোদার মার তীক্ষ্ণ কঠিন মুখ, সব তালগোল পাকিয়ে ঘুরতে লাগল। মেজেটাও দুলছে, খুব আস্তে।

কিন্তু একটু পরেই রমা সামলে নিল। আঁচল দিয়ে মুখটা মুছে নিয়ে বললে, না, ভাইরা কেউ আসে নি।

—আসে নি? কেন? যশোদার মা নাছোড়বান্দা। স্পষ্টকথার পক্ষপাতী। কোন কিছু একটু জেনে তাঁর সুখ হয় না। চিনেবাদামের মতন ছিঁড়ে ছাড়িয়ে তবে থামেন।

রমা তাড়াতাড়ি নিজের ভুলটা শুধরে নিলো, আসে নি মানে ওদের বলা হয় নি।

—ওমা, সে কি গো, এমন একটা কাজে নিজের বাপের বাড়ির লোককে বল নি? যশোদার মা বিস্ময়ে হাঁ করে রইলেন।

অবশ্য নিমন্ত্রণ না করার স্বপক্ষে বলবার অনেক কথা ছিল। শুধু কমলের অফিসের বন্ধু বান্ধবদেরই বলা হয়েছে, বাইরের কাউকে নয়, তাছাড়া রমার বিয়েতে যাদের বলা সম্ভব হয়ে ওঠে নি, তাদেরই খাওয়াতে হয়েছে আর এক দফা। কাজেই ওর ভাইদের বলার দরকার হয় নি। কিন্তু ব্যাপারটা সহজ হ'লে, কোন অসুবিধা ছিল

না রমার। দিব্যি গুছিয়ে বলতে পারতো। তাতো নয়, নিজের বুকের দগদগে ঘাটা রমা এতদিন শাড়ির আঁচল দিয়ে চেপে বেড়াচ্ছিল, সেটার দিকেই আজ যশোদার মা ইঙ্গিত করেছেন! অজান্তে ব্যথার ওপরই আঘাত করেছেন। ক্ষতটা চেপে ধরে নীরবে চোখের জল ফেলা ছাড়া রমার বুঝি আর কিছু করার নেই।

যশোদার মা থামলেন না। তূণীর বোঝাই তীর নিয়ে যেন তৈরী হ'য়েই এসেছেন। তুমি আমার পেটের মেয়ের মতন। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, কিছু মনে করবে না তো?

রমা মাথা নাড়ল বটে, কিন্তু ভয় কাটল না। ঈশান কোণের মেঘের টুকরোটাই বুঝি সারা আকাশ ছেয়ে ফেলবে। ছোট্ট সন্দেহের বিন্দু, ক্রমে ক্রমে সংশয়ের রূপ নেবে। আঘাত সামলাবার চেষ্টাতেই রমা নড়ে ঠিক হ'য়ে বসল।

—বাপের বাড়ীর সঙ্গে রাগ ক'রে এসেছ, না? সত্যি বল তো?

রমা হাসবার একটা চেষ্টা করল। ম্লান হাসি। ঠোঁটের আকুঞ্চনেই শেষ। মনের সঙ্গে কোন সংযোগ নেই।

—না, না, রাগ হবে কেন? বাপের বাড়ির ওপর রাগ? রমা হাসতে আর একবার আপ্রাণ চেষ্টা করল।

—কি জানি বাপু, এতদিন তোমরা এসেছ, প্রায় বিয়ের কনে, কিন্তু বাপের বাড়ি থেকে কাউকে তো একবার আসতেও দেখলাম না। যশোদাকে প্রায় জিজ্ঞাসা করি, হ্যাঁরে, নিচের বৌয়ের ভাইরা কেউ আসে না? ও বলে, না মা, কাউকে তো আসতে দেখি নি।

কোথাও যেন একটু হাওয়া নেই। দম বন্ধ হয়ে এল রমার। সমস্ত দিনের ক্লান্তির পরে একি নির্যাতনের পালা শুরু হলো!

—বাপের বাড়ির অবস্থা তো জানেন। বাবা বাতে পঙ্গু। নড়ে বসতেই পারেন না, তা আবার মেয়ের খবর নেওয়া। বড় ভাইয়ের

এমন অফিস, ভোরে বেরোয়, ফেরে রাত আটটায়। খবর নিতে কেবল ছোড়দা। সেও ওর অফিসে প্রায়ই আসে। খোঁজ খবর নিয়ে যায়।

কথাগুলো বলার সময়ই ফাঁকটা রমার নিজের কান এড়াল না। ছোড়দা বুঝি কেবল অফিসেই খোঁজ খবর নিতে আসে, কেন, বোনকে দেখতে বাড়ি অবধি আসতে কিসের কুণ্ঠা, কিসের অসুবিধা! বাপের বাড়ীর লোকের আসার সুবিধা নেই তো রমা আর কমলের যেতে অসুবিধাটা কোথায়। অফিস কাছারী তো সকলেরই আছে, তা বলে বোনের খোঁজ নেওয়া যায় না ছুটি ছাটার মধ্যে!

কিছুক্ষণ চুপচাপ। দুজনেরই যেন বলার মতন কিছু নেই। লুকোচুরি খেলায় একজন ধরা পড়ে গেছে, আর একজন ধরে ফেলেছে। খেলার ইতি। নতুন ক'রে অন্য কোন কথা শুরু করা যায় কি না তাই বোধ হয় ভাবছে দুজনে।

সত্যিই যশোদার মা অন্য কথা পাড়লেন, এসব অফিসের বন্ধুরা আজ দিয়ে গেলো?

চৌকো টেবিলের ওপর রাখা জিনিষগুলোর দিকে যশোদার মা নজর ফেরালেন।

রমা উত্তর দিলো না। ঘাড় নাড়ল।

—যশোদা বুঝি খালি হাতে খেয়ে গেল? আচ্ছা মেয়ে তো!

—ওমা, সে কি? রমা গলার আওয়াজ চড়াল, বাড়ীর লোককেও জিনিষ দিতে হবে? যশোদাদি কোন জিনিষ হাতে ক'রে এলে, জন্মের মতন ঝগড়া হয়ে যেত। কক্ষনো আর কথা বলতাম না।

যশোদার মা উত্তরে একটু হাসলেন। শাড়ী গুছিয়ে নিয়ে বললেন, এবার উঠি। এক জায়গায় একটু বসলেই পা-দুটো ধরে যায়। নাও, হাতটা একটু ধরো তো বাছা।

—একটু বসুন। রমা আগে উঠে পড়ল। দেয়াল আলমারী থেকে কাচের ডিশ বের ক'রে দুটো সন্দেশ সাজিয়ে বাইরের ঘরে এসে দাঁড়াল,—একটু কিছু মুখে দিন।

আচমকা সাপ দেখলে যেমন আঁৎকে ওঠে মানুষ, গিন্নী তেমনি চমকে উঠলেন,—এই অবেলায় ওই সব গিললেই হয়েছে আর কি। ঢেঁকুর তুলে তুলে প্রাণ বেরিয়ে যাবে। ওসব তুমি তুলে রাখ রমা।

কুঁজো কাত ক'রে গেলাসে জল ভরে রমা সামনে এনে রাখল। হেসে বললো,—কিছু হবে না। ভারি তো মিষ্টি! খেয়ে নিন।

যশোদার মা মুখ তুলে রমার দিকে চেয়ে দেখলেন। কি দেখলেন কে জানে। মাথা নিচু করে সন্দেশের টুকরো ভেঙ্গে মুখে দিতে শুরু করলেন।

রমা পা মুড়ে পাশে বসল।

—তুমি আমার মেয়ের মতন বাছা, একটা কথা তোমায় বলি, খাওয়ার ফাঁকে ফাকে যশোদার মা বলে চললেন, নিজের লোকের সঙ্গে মন কষাকষি রাখতে নেই। হাজার হোক রক্তের সম্বন্ধ। পৃথিবীতে তারা যতখানি টেনে করবে, আর কেউ সে রকম নয়। ওসব মিটিয়ে ফেল। ভাই ভাজের সঙ্গে আবার ঝগড়া।

রমা প্রাণপণ চেষ্টা করল। গলার কাছে কি যেন ঠেলে ঠেলে উঠছে। পুরোনো যন্ত্রণা, অনেক দিনের ব্যথা। কিন্তু কিছু একটা বলতে হবে। মানুষকে অন্যায় সন্দেহ করার সুযোগ দেওয়া ঠিক নয়।

—বিশ্বাস করুন, ঝগড়াঝাটি কিছু হয় নি, একটু মন কষাকষিও নয়।

যশোদার মা হাত তুলে রমাকে থামিয়ে দিলেন, আমি জানি মা, সব জানি! ওই এক মেয়ে নিয়ে জ্বলে মরছি। কারুর সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারলো না। তেমনি বরাত করেও এসেছিলো। দেখে শুনে

খোঁজ খবর নিয়ে অত টাকা ঢেলে বিয়ে দিলাম, ওই তো জামাইয়ের ছিরি। চাকরী বাকরী ছেড়ে দিয়ে 'এ্যাক্টো' ক'রে বেড়াচ্ছেন। যত নবাবী শ্বশুরের ঘাড়ে চেপে। মেজাজ কি, যেন লাটের পুষ্যি। তাই বলছি মা, মানুষের কখন কি হয় কিছু বলা যায় না, সকলের সঙ্গে মিলে মিশে থাকাই ভালো। একদিন জামাইকে নিয়ে বাপের বাড়ি গিয়ে ওঠ, সব ঠিক হ'য়ে যাবে। বুড়ো বাপের মনে কষ্ট দেওয়াই কি ভালো। নাও ধর।

রমা যন্ত্রচালিতের মত যশোদার মার প্রসারিত হাতটা নিজের হাতের মধ্যে নিল। মেঝেয় ভর দিয়ে যশোদার মা সাবধানে উঠে পড়লেন।

দরজার কাছ বরাবর গিয়ে আবার ফিরে দাঁড়ালেন, এত সব কথা বলে গেলাম, তুমি কিছু মনে করলে না তো বাছা?

—না, না, মনে করব কেন? আপনি আমার মায়ের বয়সী, সংসারের কত কিছু দেখেছেন, ঠিক কথাই তো বলেছেন।

যশোদার মা একটা হাত বাড়িয়ে রমার থুতনিটা নেড়ে আদরের ভঙ্গী করলেন, লক্ষ্মী মেয়ে, চলি মা আজ।

যশোদার মা চৌকাঠের ওপারে যেতেই রমার দু-চোখ ছাপিয়ে বন্যা নামল। আস্তে দরজাটা বন্ধ ক'রে ঘরের কোণে জড়ো করা বিছানার ওপর মুখ গুঁজড়ে পড়ল। ফুলে ফুলে কান্না। খোঁপা খুলে পিঠের ওপর ভেঙ্গে পড়ল। কপালের সিঁদুরের টিপ লেপে একাকার।

কমল ফিরল প্রায় রাত সাড়ে নটা। সিনেমা-থিয়েটার নয়, এক বন্ধুর মেসে ব'সে এলোমেলো তর্ক। রাজনৈতিক পরিস্থিতি দিয়ে শুরু, শেষ অবশ্য বাংলা সিনেমার ভবিষ্যত নিয়ে। খাওয়া-দাওয়ার বালাই নেই, সেই জন্য ওঠার বিশেষ তাগিদ ছিলো না। অবশ্য তর্ক পেলে কমল এমনিতেই নাওয়া খাওয়া ভুলেই যায়।

ঘড়িতে আটটা বাজতেই কমলের চমক ভাঙল।

—উঠি যাই, রাত হ'য়ে গেল।

উঠি, উঠি করেও আটটা পনেরো, তারপর বাংলা রঙীন ছবির বাজার সম্বন্ধে গোটা কয়েক কথা বলতে গিয়েও আরো পনেরো মিনিট। কমল উঠে পড়ল। নটায় শেষ বাস। সহর থেকে মজা আকন্দপুর ছুঁয়ে সোজা চালতা বাগান। এটা না ধরতে পারলে কেলেঙ্কারী। মাঝরাতে ঘোড়ার গাড়ি চড়ে গিয়ে পৌঁছতে হবে।

বাড়ির দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কমল সন্তর্পণে কড়া নাড়লো। আহা, রমা বেচারী সারাদিন খাটাখুটি ক'রে ক্লান্ত হ'য়ে ঘুমিয়েই হয়তো পড়েছে। ব'সে ব'সে অপেক্ষা করতে করতে বিছানায় ঢলে পড়েছে। বন্ধ দরজার মধ্য দিয়েও কমল যেন দেখতে পেল রমার শোয়ার অবসন্ন ভঙ্গী। একটা হাত মাথার তলায় দিয়ে পা দুটি গুটিয়ে বুকের কাছে এনে জড়োসড়ো অবস্থায়।

কমল আর একবার আলতো কড়াটা ছুঁল। খুব সজাগ ঘুম রমার। খুট ক'রে কোথাও আওয়াজ হলেই ধড়মড় ক'রে উঠে পড়ে। অবশ্য মানুষকে জব্দ করার জন্য কেউ যদি জেগে ঘুমায়, সে কথা আলাদা।

ফিকে চাঁদের আলো। শহরে এতটা বোঝা যায় নি, কিন্তু বাস ঘন বসতি পার হ'য়ে খোলা মাঠের এলাকায় ঢুকতেই কমলের সারা গা জ্যোৎস্নায় ভ'রে গিয়েছিল। শুধু গায়ের ওপরই নয়, কেমন ক'রে কোনখান দিয়ে আলোর টুকরো ওর মনকেও ছুঁয়ে দিয়েছিল। গানের শখ নেই, কিন্তু মন মানেনি সে কথা। সীটে হেলান দিয়ে কমল গুণ গুণ ক'রে গানের কলি ধরেছিল।

অবশ্য মন আজ ভরপুর থাকারই কথা। বন্ধুর মেস থেকে বেরিয়ে পথ চলতে চলতে কমল থেমে পড়েছিল। ফুলের দোকান সবে বন্ধ

হচ্ছিল। দুটো একটা কাঠের পাটাতন দেওয়া বাকি। কমল জোর পায়ে গিয়ে কিছু রজনীগন্ধা আর দু ছড়া বেলফুলের মালা কিনেছিল। ভাগ্যিস বাস ফাঁকা, নয়তো এমন ভাবে ফুলের গোছা বুকে জড়িয়ে বসতে কমলের লজ্জাই করত।

নতুন করে ফুলশয্যা। বিছানার চার পাশে ফুল ছড়িয়ে মালা বদল করবে দুজনে। প্রথমে রমা নিশ্চয় রাজি হ'বে না। ঠোঁট ফুলিয়ে সরে যাবে ঘরের কোণে। কিন্তু রমাকে রাজি করানর মন্ত্র কমলের জানা। ফুলশয্যার রাত্রি নতুন বৌ কিছুতেই মুখ ভার ক'রে থাকবে না।

দরজা ছেড়ে কমল এবার জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। আবছা আলো। চোখ কুঁচকে কুঁচকে দেখল। বিছানা পাতাই হয় নি। গোটানো বিছানার ওপর মাথা রেখে রমা শুয়ে আছে।

এদিক ওদিক চেয়ে কমল আস্তে ডাকল, রমা, রমা।

বার তিনেক। তারপরই রমা উঠে বসল। খুলে যাওয়া খোঁপা দু হাত দিয়ে কোন রকমে ঘাড়ের ওপর জড়িয়ে নিল। শ্লথ আঁচল টানতে টানতে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। কমল কিন্তু জানালার কাছ থেকে সরল না।

দরজা খুলেই রমা অবাক। একি, গলার স্বর শোনা গেল, অথচ মানুষটা উধাও। এদিক ওদিক চেয়ে রমা বাইরে চাতালে এসে দাঁড়াল। ভুলই শুনল নাকি! ওর নাম ধ'রে ডাকার আওয়াজটা এখনও যে বাজছে কানে।

সরে থাকতে কমলের আর সাহস হ'ল না। পা টিপে রমার সামনাসামনি দাঁড়িয়েই কিন্তু অবাক হয়ে গেল।

আর কোন আড়াল নয়, আকাশে একটু মেঘের টুকরোও নেই। চাঁদের আলো এসে পড়েছে রমার মুখে চোখে, সারা দেহে। কপালের

দু পাশে উস্কোখুস্কো চুলের রাশ। নিস্তেজ দুটি চোখের চাউনি। ঠোঁটের রঙ দেয়ালের রঙের সামিল। ফ্যাকাশে। সারা গাল বেয়ে অশ্রুর শীর্ণ ধারা। মনে হল সারা বিকাল বোধ হয় রমা কেঁদেছে। কেঁদে কেঁদেই হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছিল এক সময়ে।

ফুলশয্যার রাতের জন্য আনা ফুলগুলো কমল শক্ত হাতে ধরে রমার দিকে এগিয়ে এল।

—একি রমা, চোখে জল যে? রমার হাত ধরে কমল ঘরের মধ্যে নিয়ে এল। রমার চোখে জল ছিল না, দু'গালে ছিল জলের শুকনো ধারা। কমলের কথায় আবার নতুন করে জলের ধারা নামলো। কমলের কোলে মাথা দিয়ে রমা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

কমল বাধা দিল না। হাতের ফুলগুলো ঘরের কোণে ছুঁড়ে ফেলে একটা হাত দিয়ে আলতো রমার পিঠের ওপর বোলাতে লাগল। খুব সন্তর্পণে। ঝোঁকটা কেটে যাক। তারপরই জিজ্ঞাসা করলে চলবে। নতুন করে কান্নার আজ আবার কি হ'ল। বাপের বাড়ির কথা মনে করে এমন উচ্ছ্বসিত হয়ে কাঁদবার কারণ ঘটবে না সেটুকু কমল বোঝে। একমাত্র ছোড়দা ছাড়া আর কাউকে ছেড়ে আসতে যে একটু কষ্ট হয়েছে এতদিনে কমল তার কোন পরিচয়ই পায় নি। তবে! আর কি হতে পারে! অনেকক্ষণ পরে খুব কোমল গলায় কমল ডাকল, রমা।

উত্তর নেই। তবে কান্নার বেগ অনেকটা কম। কমল দু'হাতে রমার মুখটা চাঁদের আলোয় তুলে ধরল। নিমীলিত দুটি চোখ। গালের ওপর আঁকাবাঁকা জলের রেখা চিক চিক করছে।

—কি হয়েছে বলো লক্ষ্মীটি? আশে পাশের কেউ কিছু বলেছে?

আরো কিছুক্ষণ। সাধ্যসাধনা নয়। কমল রমার চুলের মধ্যে হাত ঘষতে লাগল, খুব আস্তে আস্তে, তারপর রমার দিকে ঝুঁকে পড়ে বললে, কি, বলবে না? আমায় পর্যন্ত লুকোবে তোমার কথা?

কমলের গলার আবেদনের ভঙ্গীতে কাজ হ'ল।

রমা উঠে বসল। আঁচলের প্রান্ত দিয়ে চোখ দুটো মুছে নিয়ে কমলের আরও কাছে ঘেঁসে বসল। একটু একটু করে সব কথা বলল। যশোদার মার হুল ফোটান প্রত্যেকটি কথা।

কমল খুব মন দিয়ে শুনল। রমার কথা শেষ হ'লে এক হাতে তাকে টেনে নিজের কাছে এনে বলল, এই ব্যাপার, আমি ভাবলাম না জানি কি! নাও বিছানাটা পাতো। অনেক রাত রয়েছে। কাল ভোরে উঠে আবার শুনব ভাল করে।

রমার জন্য অপেক্ষা না ক'রে কমল নিজেই বিছানা ঠিক করতে শুরু করল। রমাও উঠে পড়ল সাহায্য করতে। দুজনে মিলে টানাটানি করে বিছানা পেতে যখন শুতে যাবে তখন রেললাইনের ওপারে তেলকলের পেটা ঘড়িতে ঢং ঢং ক'রে এগারটা বাজল।

কমল হাই তুলল, শুনলে তো কটা বাজলো?

রমা ঠোঁট ওল্টাল, ভারি তো রাত!

—শহরে অবশ্য এগারটা এমন কিছু রাত নয়, কিন্তু মজা আকন্দপুরে নিশুতি বলতে পার। মানুষের সাড়া শব্দ পাচ্ছ কোথাও?

এ কথার রমা কোন উত্তর দিল না। দুজনেই কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর কমল এক সময়ে বলল, অবশ্য যশোদার মার কথা বলার ধরণটা হয়ত খারাপ, কথাগুলো কিন্তু তিনি খুব অন্যায় বলেন নি।

রমা কোন উত্তর না দিয়ে কমলের দিকে ঘুরে শুল। একটা হাত রাখল কমলের গায়ের ওপর।

—এমন একটা সন্দেহ মনে হওয়া পড়শীদের পক্ষে মোটেই আশ্চর্যের নয়। নতুন বিয়ের কনে। বাপের বাড়ি এমন কিছু হাজার ক্রোশ দূরে নয়। সেখান থেকে খোঁজখবর নিতে লোক আসবে, মাঝে মাঝে আমরা যাব,—এটাই তো স্বাভাবিক। এবারেও রমা চুপ।

—মাঝে মাঝে দুজনের বেরোতে হবে। বাপের বাড়ি যাবার নাম করে এধারে ওধারে ঘুরে আসতে হবে, না হলে তোমার যশোদার মার কাছে রেহাই নেই।

এতক্ষণে রমা মুখ খুলল, এক তরফা ব্যাপারটা হলেই বুঝি মানুষের সন্দেহ মিটবে? বাপের বাড়ির লোকেরা আনাগোনা করবে না?

—তাইতো, কমল যেন সত্যই চিন্তিত হয়ে উঠল, সমীরকে খুঁজে বের করতে হবে কোন রকমে। মাঝে মাঝে সে এলে তবু সম্মানটা বাঁচে। আচ্ছা ছেলে যা হোক। বোন ভগ্নিপতির খোঁজ খবর নেবার চেষ্টা পর্যন্ত নেই। শেষ দিকে কমল গলায় পরিহাসের সুর আনলেও শেষ অবধি ধরা পড়ে গেল। আর একজনের নতুন করে ফুঁপিয়ে ওঠার শব্দে সব গোলমাল। বুকের কাছে এমন ভাবে কাঁদলে গুছিয়ে কোন কথা বলার উপায় থাকে না।

কমল চোখ বুজল।

ঘুম যখন ভাঙল তখন বেশ বেলা। রমা আগেই উঠে পড়েছে। কমল ওঠবার মুখেই নজরে পড়ে গেল। রাতে ব'য়ে আনা ফুলগুলো অবহেলায় ঘরের এক কোণে পড়ে আছে। বেলফুলের মালাটা টেবিলের পায়ে লেগে ছিঁড়ে গেছে। চারধারে ছড়িয়ে পড়েছে ফুলের রাশ। রাতের আলোয় অমন তাজা ফুলগুলো সকালের রোদে কেমন ম্লান আর নিস্তেজ।

নিচু হয়ে ফুলগুলো জানালা দিয়ে ফেলতে গিয়েই কমল দাঁড়িয়ে পড়ল। বাগানে নীরেনবাবু। দাঁতন মুখে দিয়ে পায়চারী করছেন। হয়ত বাগান তদারক। জানলা দিয়ে ফুলের মালা পড়ছে দেখলে, এখনি সাত সতেরো প্রশ্ন করে বসবেন, হাজার কৈফিয়ৎ। তার চেয়ে

কোণেই পড়ে থাক ফুলগুলো। রমার জন্য বয়ে আনা ফুলের গোছা রমার যা ইচ্ছা বিহিত করুক। সযত্নে বুকেই তুলে নিক কিংবা উপেক্ষায় ছু ড়ে ফেলুক বাইরে, কমলের দেখবার দরকার নেই।

প্রায় বছর খানেক ক'রে চেষ্টা চরিত্র চলছিল, সে দিন সমীর অফিসে ঢুকতেই আশ্বাসবাণী শুনতে পেল। বড় বাবুর সঙ্গে দাদার শ্বশুর বাড়ির লতায় পাতায় কি একটা সম্পর্ক। সে সূত্রেই সমীর এসে ধরেছিল।

—খাইয়ে দাও হে সমীরচন্দ্র, বড়বাবু একগাল হাসলেন।

অন্য অন্যদিন সিটের কাছ বরাবর সমীর আসবার আগেই বড়বাবু ঘাড় নেড়েছিলেন।, উঁহু, কিছু হবার নয়। আরও মাসখানেক পরে একবার খোঁজ খবর যেন নেয়। সমীরও আর দাঁড়ায় নি। কোঁচার খুঁটে কপালের ঘাম মুছে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসেছে।

আজকের খবরে বেশ একটু হকচকিয়েই গেল। চেয়ারে বসতে বসতে বললে, কি ব্যাপার রায় মশাই ?

—ব্যাপার ভালো। অবশ্য মাস ছয়েক এখন অন্য একজনের জায়গায় কাজ করতে হবে, ছুটির বদলি। তবে নেই মামার চেয়ে কানামামা তো ভালো। কি বল ?

একবার ব'লে। হাজার বার। সমীর মনে মনে বিড় বিড় করল। শুধু বেকারত্বের অবসানই নয়, সেই সঙ্গে লাঞ্ছনা গঞ্জনারও। অবশ্য একটু হুল বিঁধে থাকবেই। চাকরি যদি হ'য়ে থাকে তবে তা তো

প্রমীলার সুবাদেই। রায়মশাই প্রমীলার আপন সেজোমাসীর জামাইয়ের দাদা। পর তো আর নয়।

—দোমনা করো না তুমি, ঢুকে পড়। একবার ঢুকলে আর তাড়ায় কে। একজন না একজন তো সব সময়ই রয়েছে ছুটিতে। সমীরের ইতস্ততঃ ভাবটা দেখেই রায়মশাই কথাটা পাড়লেন।

দোমনা! মনে মনে হাসি এল সমীরের। ভিক্ষার চাল—তার কাড়া না আকাড়া।

নিয়োগপত্র নিয়ে রাস্তায় বেরতে প্রায় সাড়ে বারোটা। রোদ থেকে সরে সমীর গাছের ছায়ায় গিয়ে দাঁড়াল। পকেট থেকে চিঠিটা বের করে বার তিনেক পড়ল। সামনের সোমবার থেকে যোগ দিতে হবে কাজে। সব মিলিয়ে প্রায় শ-খানেক। বন্ধু-বান্ধবের কাছে ছুটকো ছাটকা ধার, সেটা শোধ করতে হবে আগে। পয়সার অভাবে বাপের দামী কয়েকটা ওষুধ কেনা বাকি রয়েছে, নিজের জামা-কাপড়। তারপর অবশ্য প্রথম মাইনে পেয়ে বৌদির জন্য কিছু কিনে নিয়ে যাওয়া উচিত। শাড়িই হোক অথবা অবস্থা বুঝে হালকা প্রসাধনের সামগ্রী। আরো একটা কাজ করলে হয়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সমীর সেই কথাই ভাবতে লাগল। রমার জন্য ভালো একটা শাড়ি, কমলের জন্য উপহার জাতীয় কিছু। বাড়ির আর কেউ না স্বীকার করুক, সমীর মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে, একটু অন্যায় করে নি রমা, সামান্য ভুল নয়। মন যাকে চায়, তার হাত ধরে ঘর ছেড়েছে নতুন ঘর বাঁধার সঙ্কল্প নিয়ে; সমীরের যে সমস্ত ব্যাপারটার সমর্থন আছে এটুকু জানাবার এমন অবসর আর পাওয়া যাবে না। তা ছাড়া, ভাইয়ের কর্তব্যও রয়েছে বৈ কি। চিরাচরিত প্রথায় বিয়েই যদি হ'ত রমার। খালি হাতে বোনকে আশীর্বাদ করত নাকি সমীর।

রমার খোঁজ পাওয়া এমন কিছু শক্ত ব্যাপার নয়। চাকরি নিশ্চয় ছাড়ে নি কমল! 'কালান্তর' অফিসে গিয়ে খবর নিলেই হবে। তারপর কমলের সঙ্গে রমার নতুন সংসারে গিয়ে দাঁড়ালেই হল। ক্ষতিটা কি!

ক্ষতি কিছুই নয়, শুধু মনটাকে একটু তৈরী করে নিতে হবে। সামান্য একটু। সঙ্কোচ শুধু নয়, একটু অভিমানও। রমা সব কথা ওকে খুলে বললেই পারত। নিশ্চয় বাধা দিত না ওদের! হয়ত সমস্ত ব্যাপারটা এমন নাটকীয় হ'ত না। বাড়ির সকলের সঙ্গে একটা বোঝাপড়াও হতে পারত। আজকাল তো গলিতে গলিতে ঘটছে এমন ব্যাপার, অহরহ। সিভিল ম্যারেজের ইয়ত্তা নেই।

ভাবনার মুখেই সমীর চলতি বাস থামিয়ে উঠে পড়ল। প্রায় একটা বাজে। স্নান সারাই আছে, গিয়ে খেতে বসতে যা একটু দেরী। অবশ্য এতে কারুর কিছু অসুবিধা হবার কথা নয়। বাবা খাওয়া দাওয়া সেরে বিছানার শরণ নিয়েছেন। বউদিও ভাত তরকারী ঢাকা দিয়ে ওপরে উঠে গেছেন। দেরী হলে দরজার কাছে যে মেয়েটি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওর আসার অপেক্ষা করত সে নেই।

দরজা ভেজানই ছিল, হাত দিয়ে ঠেলতেই খুলে গেল। সামান্য শব্দ, তাতেই সোমনাথবাবুর গলার আওয়াজ শোনা গেল, কে?

খিল বন্ধ করতে করতে সমীর খুব নরম গলায় বলল, আমি!

ব্যস, ওই পর্যন্ত। খবরের কাগজের আওয়াজে বোঝা গেল সোমনাথবাবু ঘুমোন নি, কাগজ পড়ছেন।

বাপের দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে সমীর কিছুক্ষণ ভাবল, তারপর কি মনে করে এগিয়ে গেল। থাক, খবরটা পরে দিলেই চলবে। মাসের শেষে একেবারে মাইনের টাকা হাতে এনে।

জামাকাপড় বদলে খেতে বসার মুখেই সমীর বাধা পেল। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ। ওপর থেকে, প্রমীলা বউদি নিচে নামছে। কি ব্যাপার। এমন সময়ে দিবানিদ্রা ছেড়ে রান্নাঘরে আসার হেতু!

রান্নাঘরের মধ্যে ঢুকল না, দাঁড়াল চৌকাঠ বরাবর। এক হাত দরজার পাল্লায় রেখে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, কাল থেকে তুমি খেয়েই বেরিয়ো ঠাকুরপো। আমার যত কষ্টই হোক তোমার দাদার সঙ্গেই তোমার যোগাড় করে দেব।

খেতে খেতেই সমীর মুখ তুলল।

আক্রমণের ভঙ্গীটা নতুন, আঘাতটা আকস্মিকভাবে কোনদিক থেকে আসবে ভেবে সমীর একটু শঙ্কিতই হয়ে উঠল। মায়া মমতার যেমন বালাই নেই বৌদির, মুখেরও তেমনি আগঢাক নেই।

—সেই ভাল হবে, কি বল ঠাকুরপো? শুধু প্রশ্নই নয় উত্তরও চায় প্রমীলা।

কথাটা সমীর চেপে রাখবে ভেবেছিল, অন্ততঃ মাসখানেক কিন্তু বেকায়দায় পড়ে ফাঁস করে দিতে হল।

—আর এই কটা দিন বউদি। জল খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে সমীর বলে ফেলল।

কথা হয়তো সম্পূর্ণ কানে যায় নি প্রমীলার। কিন্তু খানিকটা আঁচ করেছিল বৈ কি। শাড়ী সামলে চৌকাঠের ওপরই ব'সে পড়লো। দু হাতে খুলে আসা খোঁপা জড়াতে জড়াতে বলল, এ ক'টা দিন কি বললে ঠাকুরপো ঠিক বুঝতে পারলাম না।

সমীর আরো খাদে নামাল গলার স্বর। খুব মিহি গলায় বলল, চাকরীর ঠিক হয়েছে একটা।

—বল কি ঠাকুরপো? প্রমীলার গলার আওয়াজ বেশ জোর, চাকরী হয়েছে, আর তুমি কি ব'লে একেবারে খালি হাতে বাড়ী ঢুকলে?

বৌদি না হয় পরের মেয়ে, কিন্তু বুড়ো বাপের জন্যও তো সন্দেশ নিয়ে আসতে হয়!

সমীর কিছুক্ষণ চুপচাপ। মাথা নিচু ক'রে খাওয়ায় ব্যস্ত। এমন একটা কথা উঠবে কিছুটা আন্দাজ করেছিল বৈ কি।

—কি গো, গরীব মানুষের কথাটা যে কানেই উঠল না?

গণ্ডুষ ক'রে সমীর উঠে পড়ল। মিহি সুরেই বলল, আর লজ্জা দিও না বৌদি। আমার পকেটের খবর তো আর তোমার অজানা নয়। মাইনে পেলে, বাবার জন্য না হোক, তোমার জন্য মিষ্টি আমায় নিশ্চয় নিয়ে আসতে হবে।

কমল সিঁড়ি দিয়ে নামতেই চোখে পড়ে গেল। সিঁড়ির মাঝ-বরাবর দাঁড়িয়ে একবার ভাবল, পা টিপে টিপে ওপরে উঠে আসে। কিন্তু তাতেই কি রেহাই আছে। সোজা গিয়ে ওর টেবিলের সামনে হাজির হবে। তার চেয়ে মুখোমুখি দাঁড়ানই ভালো। ভয়ই বা কিসের?

নোটিশ বোর্ডে টাঙানো খবরের কাগজের ওপর সমীর চোখ বোলাচ্ছিল, আচমকা কাঁধে হাত পড়তেই ফিরে দাঁড়াল। মিনিট দুয়েক। অস্বাচ্ছন্দ্যের কাঁটা-তার, সঙ্কোচের বেড়া। কথা বলতে বার দুয়েক ঢোঁক গিলল।

—কিহে, একেবারে বোবা হয়ে গেলে যে? কমল সহজ হবার চেষ্টা করল, সুরে অন্তরঙ্গতার আমেজ।

—চলো ওপরে যাই, কথা আছে তোমার সঙ্গে, সমীর বহু কষ্টে উচ্চারণ করল কথাগুলো। অথচ কমলের সঙ্গে কথা বলতেই সে এসেছে। বাড়ীতে অনেকবার ভেবেছে, অফিসেও কাজের ফাঁকে ফাঁকে চিন্তা করেছে, 'কালান্তর' কার্যালয়ের সামনে অনর্থক পায়চারি করেছে অনেকক্ষণ ধ'রে। এত সবের পরেও কিন্তু সাহস ক'রে ওপরে উঠতে পারে নি; নিচে দাঁড়িয়ে নোটিশবোর্ডে নজর দিচ্ছিল।

—ওপরে নয়, কমল সমীরের কাঁধ থেকে হাত সরাল না। আলতো চাপ দিয়ে বলল, তার চেয়ে চা-খানায় গিয়ে বসি। এখন ভিড় কম। নিরিবিলি দু'জনে কথা বলা যাবে।

কম্পাউণ্ডের মধ্যেই চা-খানা। বিরাট বটের ছায়াঘন আঁওতায়। জনবিরল অবস্থা। ভিড়ের চাপ ভোরের দিকে। রাত-জাগা

কর্মচারীরা বাড়ী ফেরবার মুখে ঠোঁট ভিজিয়ে যান। কিছুটা ভিড় হয় টিফিনের সময়। 'কালান্তর'-এর কর্মচারী ছাড়াও আশে পাশের এলাকা থেকে মানুষ এসে জোটে। ধারে কাছে অফিস ইস্কুলের বালাই নেই, একেবারে বেপাড়া। তা না থাক, এ-ধারে ও-ধারে দোকান, কারখানা আছে, কাঠ-চেরাইয়ের কল, দপ্তরীর দপ্তর, সেখান থেকে লোক এসে হাজির হয়। শুধু সস্তাই নয়, চা-খানায় চা সুস্বাদুও।

কমল আর সমীর একেবারে কোণের দিকে গিয়ে বসল। নড়বড়ে চেয়ার, ক্যাঁচকোঁচ শব্দ হয়। দেয়ালে হেলান দিয়ে দুজনে বসল। শুধু চা নয়, কমল একটা ক'রে চপের অর্ডার দিল। কথা আরম্ভ হল চা চপ আসার পর।

চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে সমীর খুব আস্তে বলল, অন্য দিকে চেয়ে, রমা কেমন আছে?

—ভালোই, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কমল উত্তর দিল। তারপর চপের টুকরো ভেঙে মুখে দিয়ে বলল, আমি তো খুব আশা করেছিলাম যে তুমি অন্তত একদিন এসে দেখা করবে। আজ প্রায় দেড় মাসের ওপর হয়ে গেল।

—আমি? সমীর চোখ তুলল না। চায়ের কাপে চুমুক। খুব বিলম্বিত লয়ে। রুমালের কোণ দিয়ে মুখ মুছে বলল, ঠিকানা জানব কোথা থেকে। সব কিছু জানিয়ে তো আর আস নি।

—দুজনের তো আর আলাদা আলাদা ঠিকানা নয়। আমার ঠিকানা তো তোমার জানাই। আজ যেমন এলে, তেমন ক'রেই তো আরো আগে আসতে পারতে। রমা প্রায় রোজই তোমার কথা জিজ্ঞাসা করত।

রমা! রমা জিজ্ঞাসা করত ওর কথা! পিছনের সব কিছু মুছে-ফেলে-আসা মেয়ের ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে দেখার প্রয়াস!

—যাবে নাকি আজকে ? কমলের প্রশ্নে সমীর চমকে উঠল। অবশ্য যাবে ব'লে প্রায় তৈরী হয়েই এসেছে। অফিস থেকে একটু সকাল সকাল বেরিয়েছে। ইচ্ছা, কমলকে সঙ্গে নিয়ে নতুন গৃহস্থালী দেখে আসবে।

—তোমার ছুটি কখন ? সমীর সোজাসুজি চাইল। জড়তার ভাব প্রায় কাটিয়ে উঠেছে। অসুবিধার কুয়াশা অনেকটা মিলিয়ে এসেছে।

—কাল ভোরে, কমল হাসল, পরশু থেকে নাইট ডিউটি শুরু হয়েছে।

নাইট ডিউটি! তা হ'লে একেবারে একলা আছে রমা! সারা রাত। কোমরে আঁচল জড়িয়ে যতই সে গিন্নিবান্নি সাজুক, রমাকে তো চেনে সমীর। খুব চেনে। পাড়ায় কোথাও চুরি হ'লে পর পর তিন রাত রমার চোখে ঘুম আসত না। এমনি ইঁদুরে খুটখাট শব্দ করলেই ধড়মড় ক'রে উঠে বসত। ফিসফিস করে ডাকত সমীরকে। ছোড়দা ও ছোড়দা, একটু উঠে দেখ না ভাই, জানলার কাছে কিসের আওয়াজ হচ্ছে।

কোন কোন দিন সমীর উঠেছে। বাতি জ্বালিয়ে তন্নতন্ন ক'রে খুঁজেছে ঘরের কোণ। ইঁদুর তাড়িয়েছে, কিংবা আরশুলার ঝাঁক। আবার কোন কোন দিন পাশ ফিরে শুতে শুতে বলেছে, ও কিছু নয়, বোধ হয় চোরটোর জানলার গরাদ কাটছে, তুই ঘুমো।

পরিহাসের সুরটা বুঝতে হয়তো রমার অসুবিধা হয়নি, কিন্তু সারা রাত এপাশ ওপাশ করেছে। ছিটেফোঁটা ঘুম নয় সারাটা রাত।

সেই মেয়ে! বলা যায় না, যে দৃঢ় হাতে সমাজের বাঁধন সরিয়েছে, সরিয়েছে লোকলজ্জার বাধা, সেই হাতেই মন থেকে হয়তো ভয়ও নির্মূল করেছে। কিন্তু কমলের সঙ্গে না হ'লে একলা সমীর যেতে পারবে না। অন্তত প্রথম দিন।

সমীরের ইতস্ততঃভাব কমলের নজর এড়াল না। হেসে বলল, কোন অসুবিধা নেই। আমি তোমায় হদিস বাতলে দিচ্ছি। বাস স্টপেজের খুব কাছে।

—কিন্তু একলা, সমীর আমতা আমতা করল।

—ভালোই তো, ভাইবোনে নিরিবিলি ব'সে মনের আনন্দে আমায় গালাগাল দিতে পারবে। কমল হাসি থামাল না।

প্রথম দু এক মিনিট কি ভাবল সমীর। বোধ হয় মনে মনে বলবার কথাগুলো আউড়ে নিল। তারপর ঝুঁকে পড়ে বলল, তুমি আমাদের উপকারই করেছ কমল। বাড়ীর লোকদের কথা জানি না, তারা মনে বুঝলেও মুখে হয়তো স্বীকার করবে না, কিন্তু আমার মনে হয় নরককুণ্ড থেকে রমাকে তুমি উদ্ধার করেছ। এ ছাড়া বোধ হয় রমারও বাঁচবার কোন উপায় ছিল না।

—অত কথা ভাবি নি সমীর, কমল খুব আস্তে বলল, মেয়েটিকে ভাল লেগেছিল, মনে হ'য়েছিল একে নিয়ে ঘর বাঁধতে পারলে বোধ হয় সুখী হব। তাই তার মত নিয়ে যখন জানতে পারলাম, আমার জীবনের সঙ্গে জীবন জড়াতে তার আপত্তি নেই, একেবারে সঙ্গে নিয়ে পথে পা দিলাম।

কথার সঙ্গে সঙ্গে কমল উঠে দাঁড়াল। পকেটে হাত দেওয়ার মুখেই বাধা পেল। সমীর হাত চেপে ধরল।

—কি ব্যাপার ?

—ব্যাপার কিছু নয়। চা-চপের দামটা আমিই দেব।

—সে কি, তুমি দিতে যাবে কেন ?

সমীর হাসল, একটা চাকরী পেয়েছি। মাইনেও পেয়েছি দিন তিনেক।

—তাই নাকি ? এমন সুখবরটা এত পরে দিলে ?

—আগে আর সুযোগ পেলাম কই! তোমার সুখবর শুনতেই তো ব্যস্ত ছিলাম।

সমীর এগিয়ে দামটা মিটিয়ে দিল। তারপর পয়সা পকেটে রাখতে রাখতে বলল, তা হ'লে আজ চলি। আর একদিন না হয় আসব।

—কেন? আজ কিসের অসুবিধা? আমি তোমায় ঠিকানা বলে দিচ্ছি।

—ঠিকানা জানলেই কি সব জায়গায় যাওয়া যায়? সমীর মুচকি হাসল।

—বুঝেছি, একলা যেতে তুমি রাজী নও। কিন্তু একলা যাওয়াই তো ভালো।

এ কথার সমীর কোন উত্তর দিল না। কেবল বলল, তোমার নাইট ডিউটি শেষ হচ্ছে কবে?

—আরো দিন চারেক।

—ঠিক আছে, সামনের শনিবার আমি আসব তোমার কাছে। এখান থেকে এক সঙ্গে বেরোব।

—কেন?

উত্তরে কমল ঘাড় নাড়ল, তোমার যা অভিরুচি। কিন্তু তুমি অনায়াসেই আজ যেতে পারতে। রমা তোমায় দেখলে ভারি খুসী হত।

—আর তো কটা দিন মাঝখানে। তুমি বলো রমাকে।

সমীর পাশ কাটিয়ে যাবার মুখেই কমলের মনে পড়ে গেল। কেবল নিজেদের কথাই হ'ল। বাড়ীর আর সকলের খোঁজখবর নেওয়াও তো উচিত।

—তোমার বাবার শরীর কেমন?

—বাবার শরীর?

একটু ইতস্ততঃ করল সমীর। গত দু'দিন থেকে ভাল যাচ্ছে না। মাঝরাতে ঘুম ভেঙ্গে যেতে একটানা কাতরানি সমীরের কানে এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে কাশির আওয়াজ। অসুখটা আবার বেড়েছে। আশ্চর্য কি! সেবাযত্নের অভাব। দেখাশোনা করার কেউ নেই। কিন্তু নিজেকে সামলে নিল সমীর। এসব কথা কমলকে বলে লাভ কি? রমার কানে গেলে মিছিমিছি উদ্বিগ্ন হ'য়ে পড়বে। উদ্বিগ্নই শুধু হবে, কাছে গিয়ে সেবাশুশ্রূষা করার অবকাশ পাবে না। অন্তত ওই বাড়ীতে তো নয়ই। বিশেষ ক'রে দাদা বৌদি থাকতে। কোনদিন যদি আলাদা বাসা করতে পারে সমীর, বাবাকে নিয়ে যেতে পারে সেখানে, তা হ'লে কমল আর রমার অবাধ যাওয়া-আসা করার কোন বাধা থাকবে না।

—বাবার শরীর মাঝামাঝি।

—দাদা বৌদি ভাল আছেন?

সবই বুঝল সমীর। নেহাৎ প্রশ্নের জন্যই প্রশ্ন। নয়তো দাদা বৌদির সম্বন্ধে এমন কিছু ঔৎসুক্য নেই কমলের। কমলকে তাঁরা কোনদিনই বিশেষ আমল দেন নি। নিতান্ত চোখাচোখি হলে মাপা হেসেছেন। তাও প্রথমদিকে। ইদানিং এড়িয়ে যেতেন। দেখেও দেখতেন না। তার ওপর এই ব্যাপারের পরে তো কথাই নেই। বংশের মর্যাদা ডুবিয়েছে কমল, কুলে কালি দিয়েছে, ঘরের মেয়েকে পথের ধুলোয় নামিয়েছে, তার সঙ্গে সম্পর্ক!

কমল সমীরকে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিল। ছাড়াছাড়ি হবার মুখে আর একবার মনে করিয়ে দিল সামনের শনিবারের কথাটা। কমল অপেক্ষা করবে। অফিসের ছুটি হলেই যেন সোজা সমীর এখানে চলে আসে।

ডিউটি শেষ ভোর তিনটেয়। কিন্তু অত সকালে তো আর ট্রাম

বাস পাবার উপায় নেই। কাজেই টেবিলের ওপরই খদ্দরের চাদর মুড়ি দিয়ে কমল লম্বা হ'ল। শুধু কমলই নয়, আশে পাশের অনেকেই। টানা ঘুম সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত। তারপর গরম চায়ে চুমুক দিয়ে ছটা নাগাদ কমল বাস-স্ট্যাণ্ডে এসে পেঁৗছল। মজা আকন্দপুর পেঁৗছতে প্রায় সাড়ে সাত।

প্রথম প্রথম একেবারে বাজার সেরেই কমল বাড়ী ফিরত কিন্তু আজকাল রমা সুখীর সঙ্গে বন্দোবস্ত করেছে। বাড়তি পয়সা হাতে ঠেকিয়ে বাজারটা তাকে দিয়েই করিয়ে নেয়। সারারাত জেগে একটি মানুষ ঘরে ফিরছে, কোথায় স্নান সেরে একটু গড়িয়ে নেবে,- তা নয় হাট বাজার করতে করতে বাড়ি ফিরবে বেলা গড়ালে!

অবশ্য স্নান সেরে কমল কোনদিনই ঘুমোবার চেষ্টা করে না। বিছানা পাতা থাকলেও নয়। সারা সকাল রমার পিছন পিছন ঘোরে। সাহায্য করে ঝাড়পোঁছ করতে কিংবা রান্নাবান্নার কাজে হাত লাগাতে যায়। সাহায্য করা তো নয়, কাজ বাড়ান।

হাত জোড় করে রমা বারণ করে, দোহাই তোমার, খুব হয়েছে। যে কাজ আমি এক ঘণ্টায় সারতাম, তোমার পাল্লায় পড়ে আমার দু ঘণ্টা লাগছে। তার চেয়ে তুমি চুপচাপ বস দিকি নি। আমি তোমার সঙ্গে গল্প করতে করতে কাজ করছি।

কমল নাছোড়বান্দা। তা কখনও হয়, চোখের সামনে দুধের মেয়ে একটা খেটে মরছে, জোয়ান মদ্দ হয়ে সে শুধু দেখবে চেয়ে চেয়ে! ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে বসে থাকবে, কুটোটি নাড়বে না!

দরজা খোলাই ছিল। চৌকাঠ পার হতেই সুখীর সঙ্গে দেখা। বালতি হাতে এগিয়ে আসছিল, কমলকে দেখে বালতি নামিয়ে মাথার ঘোমটা টেনে দিল।

—বউদি কোথায় রে?

—রান্নাঘরে।

সুখী বালতি তুলে নিয়ে পাশ কাটিয়ে বাইরে চলে গেল।

জামা আলনায় রেখে বাথরুমে ঢোকবার মুখে কমল একবার রান্নাঘরে উঁকি দিল। আঁচল কোমরে জড়িয়ে রমা দুধ জ্বাল দিচ্ছে। আগুনের লালচে আভা কিছুটা মুখের ওপর। হাতা দিয়ে দুধ নাড়ার তালে তালে হাতের চুড়ির ঝুনঝুন শব্দ।

পায়ের আওয়াজ হতেই রমা ফিরে দেখল, তারপর আঁচল খুলে মাথায় দেবার চেষ্টা করতেই কমল বাধা দিল, ব্যস্ত হ'য়ো না, ঠিক সময়ে মাথায় ঘোমটা টানতে না পারলেও স্বামীভক্তির মাত্রা কমবার সম্ভাবনা নেই। চায়ের বদলে রোজ সকালে দুধ বরাদ্দ করেছ, আদর যত্নেরও ত্রুটি নেই, 'পতিপ্রাণা' উপাধি তোমায় মারে কে!

—আহা, ভুরু কুঁচকে রমা কপট ক্রোধে মুখ ফেরাল, সারাটা রাত বুঝি বসে বসে ঠিক করো ভোরবেলা আমায় কি বলবে এসে? আমার পিছনে না লাগলে কি তোমার সুখ হয়!

—সারাটা রাত না হ'লেও, প্রহরে প্রহরে তোমার কথা ভাবি বৈকি। তুমি একদিন আমার সঙ্গে চল অফিসে, দেখবে ব্লটিং-প্যাডটা তোমার নামে ঠাসবোঝাই। একেবারে নামাবলী হ'য়ে আছে।

—ওমা, সেকি গো? আশে পাশের লোকেরা কি মনে করে?

—কি মনে করে তারাই জানে। কি আর মনে করবে? বড়ো জোর ভাববে লোকটা স্ত্রৈণ, এই তো! কিন্তু আমার সে কলঙ্ক তো তোমার ভূষণ! কথার সঙ্গে কমল চৌকাঠ চেপে বসল।

—ওকি, এমন দরজা চেপে বসছ যে। উঁহু, আড্ডা দেওয়া চলবে না। আগে মুখ হাত ধুয়ে দুধটা খেয়ে নাও। রাতজাগা কম কথা!

কথাটা ব'লেই কমলের খেয়াল হ'ল, ভুল হ'য়ে গেছে। বাপ মারা গেছে শনিবার, তা তিন দিন প'রে শোক উথলে উঠল তাঁর জন্য। খবর পেয়ে একবার বাপের বাড়ী যাওয়ারও বুঝি ফুরসুৎ হয় নি। তবু বলতে চায় রমা, বাপের বাড়ীর সঙ্গে কিছু হয় নি। সামান্য মন কষাকষিও নয়।

কমল নিজেকে সামলে নিল।

ফিসফিসিয়ে বলল, খবরটা এ ক'দিন আমিই চেপে রেখেছিলাম। অনর্থক কান্নাকাটি ক'রে নিজের শরীর খারাপ করবে। কাল চতুর্থী, তাই আজ বলতেই হ'ল।

কমল আর দাঁড়াল না। অন্ধকার ঘরে একটা মানুষকে দাঁড় করিয়ে কতক্ষণ আর কথাবার্তা চলে। রান্নাঘরে হ্যারিকেন ছিল। পলতে কমান। কমল সেটাই একটু উস্কে দিয়ে বাইরের ঘরে নিয়ে এল। ততক্ষণে রমা উঠে বসেছে। কোঁকানীর শব্দ কম। আঁচল দিয়ে মুখ ঢেকে দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসেছে।

হ্যারিকেন জানলার ওপর বসাতেই যশোদা পায়ে পায়ে বিছানার কাছে এগিয়ে এল। রমার পাশে বসল পা মুড়ে।

যশোদা বসতেই কমল বেরিয়ে পড়ল। রমার সঙ্গে সঙ্গে যশোদাও হয়তো চোখের জল ফেলবে। কান্না না এলেও। মেয়েদের ধারাই এই। সান্ত্বনা দিতে এসে নিজেরাই হাপুস নয়নে কাঁদতে শুরু করে। পরের চোখ মোছাবে কি, নিজেদের চোখ মুছেই কুল পায় না। এই সময়টা একটু পায়চারি করবে রাস্তায়। বেশীদূর নয়, কাছাকাছি। ওদের বাড়ীর সামনে থেকে মোল্লার দিঘি পর্যন্ত।

কমল ফিরল প্রায় আধ ঘণ্টার মধ্যেই। ফটকের মুখেই বাড়ীওয়ালার সঙ্গে দেখা। ভদ্রলোক হাতের লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন, কলমকে দেখেই একটু এগিয়ে এলেন, এই যে কমলবাবু, শুনলুম

আপনার বিপদের কথা। আমার পরিবার মেয়ে সবাই নিচে নেমে এসেছে! বৌমা নাকি খুব কান্নাকাটি করছেন। তাতো করবেনই, শেষ সময়ে একবার চোখের দেখা পর্যন্ত হ'ল না।

কথা থামিয়ে ভদ্রলোক সজোরে নিশ্বাস ফেললেন। পাঁজর কাঁপিয়ে, এই জীবন রে ভায়া। পদ্মপত্রে ওর নাম কি বিষ্টির জল। এই আছে, এই নেই। তারা, তারা, নৃমুণ্ডমালিনী।

এবার নিঃশ্বাস শুধু জোরেই নয়, আরো ঘন ঘন।

—একেবারে হঠাৎ হয়ে গেল। একটু আগে খবর পেলে রমাকে নিয়ে যেতে পারতাম। হিল্লি, দিল্লী তো আর নয়। ক' ঘণ্টারই বা মামলা। কমল থেমে থেমে হিসাব ক'রে ক'রে বলল।

—আরে ভায়া, ভবিতব্য। কপালে শেষ দেখা নেই, আপনি কি করবেন! ভদ্রলোক হঠাৎ যেন কিছু মনে পড়ে গেছে এমন ভাবে ব'লে উঠলেন, যান, যান, অফিস থেকে এসে তো এখনও জল পর্যন্ত মুখে দেন নি। মুখ হাত ধুয়েছেন তো?

কমল ঘাড় নাড়ল তারপর বাড়ীওয়ালার পাশ কাটিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল।

সব নিঃঝুম। যশোদা আর তার মা বোধ হয় ওপরে উঠে গিয়েছে। রমার কান্নার শব্দও আর কানে এল না। হ্যারিকেনের ম্লান দীপ্তি। জানলার কাছে রমা চুপচাপ দাঁড়িয়ে। কমল প্রথমে দরজায় খিল দিলো তারপর এগিয়ে এসে একটা হাত রাখলো রমার পিঠের ওপর।

—তোমার মনের অবস্থা আমি সবই বুঝতে পারছি রমা। কিন্তু সবই সহ্য করতে হবে। পঙ্গু হ'য়ে সারাটা জীবন যন্ত্রণাভোগ করার চেয়ে, এ ভাবে সরে যাওয়া অনেক ভাল। শেষ সময়ে শুধু একবার দেখতে পেলে না, এ ক্ষোভ অবশ্য হওয়া স্বাভাবিক কিন্তু সব ছেলে মেয়ে কি

দেখতে পায় শেষসময়ে বাপমাকে ? তোমার যদি দূরদেশে বিয়েই হ'তো, তা হলে ?

রমা একটি কথাও বলল না। শান্তশিষ্ট ছাত্রের মতন চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে শুনল কথাগুলো ! কেবল এগিয়ে এসে মাথাটা রাখল কমলের বুকের ওপর। ওর সব কিছু বেদনা আর যন্ত্রণার উপশম হবার একমাত্র আশ্রয় !

সমীর কদিন ধ'রেই কথাটা ভাবছিল। বাড়ী ভর্তি লোক। দাদার শ্বশুরবাড়ী থেকে মেয়ে পুরুষ একগাদা এসে জুটেছে। কাজের ভার তারাই তুলে নিয়েছে নিজের হাতে। কাজের চেয়ে ব্যস্ততার ভাবটাই প্রকট। প্রমীলার পাত্তা পাওয়া দুষ্কর। শ্বশুরের কাজ। একটু খুঁত থাকলে পাড়া-প্রতিবেশীর কাছে মুখ থাকবে না। তবু ওরই মধ্যে সুযোগ সুবিধা ক'রে সমীর প্রমীলাকে হাত নেড়ে ডাকল।

—কি বলো ঠাকুরপো, আমার এখন মরবার সময় নেই। প্রমীলা হাতে বাসনের গোছা নিয়ে ওপর থেকে নিচে নামছিল। মাঝপথেই দাঁড়িয়ে পড়ল।

—না, বলছিলাম কি, সমীর আমতা আমতা করল।

—বল ঠাকুরপো। চট ক'রে বলো, ওসব ইনিয়ে বিনিয়ে থিয়েটারি ঢংয়ের কথা আমার ভাল লাগে না।

—আমার দু একজন লোককে নিমন্ত্রণ করার আছে।

—কেন আর লোক বাড়াচ্ছ ঠাকুরপো ? টাকা ঢালতে তো ওই একটি মানুষ। বাদ দিতে দিতেও লোক বড় কম বলা হয় নি। তোমাদের অফিসের রেবতীবাবু তো আসছেনই ?

তা আসছেন। সমীর মনে মনে ভাবল। রেবতীবাবু আসছেন অফিসের বড়বাবু ব'লে নয়, বউদির আত্মীয়তার সূত্র ধ'রে। কিন্তু এ সব মনে করিয়ে দিয়েও লাভ নেই। তা ছাড়া সব টাকা সমীরের দাদাই খরচ করছে না, সাধ্যমত টাকা সমীরও দিয়েছে। মিষ্টি আর দইয়ের মোটা খরচই তার ঘাড়ে। কিন্তু এ সব চুলচেরা হিসাব নিকাশের সময় এ নয়, তা হ'লে আসল কথাটাই বলা হবে না।

—ভাবছিলাম, সমীর আবার শুরু করল, রমাকে বললে হয়, রমা আর কমলকে।

আর একটু হ'লে বাসনের গোছা হাত থেকে পড়ে চুরমার হ'য়ে যেত। প্রমীলা শক্ত মেয়ে, তাই এমন একটা খবরে বিচলিত হ'লেও সামলে নিল নিজেকে। নামতে নামতে বলল, বিছানা-বাঁধা দড়ি আছে ঠাকুরপো, খুলে গলায় দাও। এমন কথা মুখ ফুটে বললে কি ক'রে ? একটু লজ্জা হ'ল না ?

সিঁড়ির কয়েক ধাপ নেমে আবার ঘুরে দাঁড়াল, আত্মীয়কুটুম্ব নানা জায়গা থেকে আসছে। অনেকেই তোমার বোনের খোঁজ করবে, তাদের কি বোঝাবে, বুঝিও।

সমীর আস্তে নেমে নিজের ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকল।

সত্যি, এ দিকটা ওর মনেও পড়ে নি। কি বলবে লোককে ? জলজ্যান্ত মেয়েটা ফুসমন্তরে উধাও। এমন কোথায় গেল যে বাপের কাজের দিনও আসতে পারল না ! আসল ব্যাপারটা কারুরই অজানা থাকবে না, অন্ততঃ বৌদির আত্মীয়দের কাছে। তিলকে তাল ক'রে বলতে ছাড়বে না বৌদি। রং ফলিয়ে সবিস্তারে বলবে মেয়েমহলে।

উটকো মানুষটাকে সমীরই যে ঘরে ঢুকিয়েছিল, একথাও বলতে ছাড়বে না। বেনো জল ঢুকিয়ে ঘরের জল বের ক'রে নেওয়ার সামিল।

রমা আর কমলকে নিমন্ত্রণ করলে হয়তো এসব প্রশ্নের কদর্যতার দিকটা এড়ান যেত। রমার সিঁথির সিঁদুর দেখে যারা চমকে উঠত, প্রয়োজন হ'লে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলা যেত তাদের। সিভিল ম্যারেজ এখন তো অলিতে গলিতে প্রায়ই হচ্ছে। অনবরত। সোমত্ত বয়সের মেয়ের নিখোঁজ হ'য়ে যাওয়ার চেয়ে ভিন্নজাতের পুরুষমানুষের গলায় মালা দেওয়া ঢের ভালো। গ্লানির পঙ্কিলতা নেই তাতে, নেই অপমানের কালি, হয়তো স্বেচ্ছাচারিতার আভাস আছে, আছে স্বয়ংবৃতা হওয়ার দুর্জয় সাহস।

কিন্তু এত সব কথা সমীর শুধু মনে মনেই আওড়াল। নিজের স্বল্পপরিসর কামরায় ব'সে ব'সে। দাদাকে বলবার চেষ্টা করল না। করলেও বিশেষ লাভ হত না। বিরক্তিতে ভুরু কোঁচকাত প্রথমে তারপর স্ত্রীর পরামর্শে প্রস্তাব বাতিল করে দিত।

বাপের কাজ চোকবার পরের দিনই অফিস ফেরত সমীর কমলের অফিসে গিয়ে হাজির হ'ল। মাঝপথে একবার নামল শাড়ীর দোকানে। অনেক বেছে বেছে একটা শাড়ী কিনল। আকাশী রংটা রমার ভারি পছন্দ, আর ফর্সা রঙে মানায়ও চমৎকার। ছোটখাটো সিঁদুর কৌটোও একটা কিনলো। রূপোর কৌটো, ডালার ওপর হালকা মিনের কাজ করা। কমলের কাছে যখন পেঁাছোল, তখন প্রায় সাড়ে ছটা। কমলের চেয়ার খালি। পাশেই হারাধনবাবু বসেন। আইবুড়ো লোক। অমায়িক। সরকার এত করছেন, অথচ দোক্তার উৎপাদন বাড়াবার কিছুই করছেন না, ভদ্রলোকের এই এক আক্ষেপ। মাঝারী গোছের হরলিকস্ এর শিশিতে দোক্তা আনেন। সারা দিনে পঞ্চাশের ওপর পান নিঃশেষিত হয়, সেই অনুপাতে দোক্তা।

সমীরকে দেখেই হারাধনবাবু হাসলেন, বন্ধু বাড়ী পালিয়েছে। বুঝলেন না, নতুন বিয়ে এখন কি আর অফিসে মন বসে। এক চোখ নিজের কাজে, আর এক চোখ সামনের ঘাড়ির কাঁটার দিকে। সময় হলেই চোঁচা দৌড়।

সমীরও হাসল। কি ভাগ্যি, হারাধনবাবু কমল আর সমীরের বন্ধুত্বটাই জানেন, নতুন গড়ে ওঠা সম্পর্কটার বিষয় জানেন না কিছু।

—তবে তো মুস্কিল হ'ল। কমলকে যে আমার বিশেষ দরকার।

—মুস্কিল আর কি! দিল্লী মক্কা তো আর নয়। সোজা চলে যান মজা আকন্দপুর।

—সে ঠিকানাও যে জানি না। আপনি জানেন?

—জানি বৈ-কি, ঠিকানা অফিসের খাতাতেই লেখা আছে, তাছাড়া বিয়ের পরে ভোজ খেয়ে এলাম যে। বিয়ের সময় ফাঁকি দিয়েছিল, প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে তবে ছেড়েছি।

শুধু ঠিকানাই নয়, হারাধনবাবু কাগজের ওপর ছক কেটে যাবার হদিসও বাতলে দিলেন। মোল্লার দিঘি ছাড়িয়ে বাঁ-হাতি রাস্তা। দোতলা বাড়ীর নিচের তলায়। সামনে আবার একটু বাগানের মতন আছে।

সমীর আর দাঁড়াল না। চিরকুটটা তুলে নিয়ে যেতে বাধা পেল।

—বগলে কি ? শাড়ী নাকি ?

সমীর ঘাড় নাড়ল।

—ও, বুঝেছি, সেদিনের ভোজে যেতে পারেন নি বুঝি ? যান, দেখে আসুন মেয়েটিকে। ভারি সুন্দরী। যেমন মুখচোখ তেমনি গায়ের রং। আর স্বভাবটিও চমৎকার। একেবারে লক্ষ্মী প্রতিমা। কমলবাবুর পছন্দ আছে মশাই।

দুটো কান যেন জুড়িয়ে গেল সমীরের। কটা দিন ধ'রে চলেছে রমার কুৎসা কীর্তন। সমাজের মুখে কালি লেপে দেওয়া মেয়ে, দুনিয়ার কলঙ্ক। বুড়ো বাপ মরল নাকি ওরই জন্য। রুগ্ন বাবাকে ফেলে নাগরের হাত ধ'রে নাচতে নাচতে বেরিয়ে গেল মেয়ে।

একটি কথাও সমীর বলে নি! বললেই প্রতিবাদের ঝড় উঠত। ধুলোয় চারদিক অন্ধকার। সারা শরীর বালি আর কাঁকরে আচ্ছন্ন হ'য়ে যেত। সেই ধু ধু রুক্ষতার মাঝখানে হারাধনবাবুর কথা যেন সবুজের আঁচড়, ব্যথার ওপরে সান্ত্বনার হস্তাবলেপ।

—বাবার শরীর খারাপ ছিল সে সময়ে তাই যেতে পারি নি। ঘুরে আসি আজ। নমস্কার।

সমীর সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। পা চালিয়ে যেতে হবে। নয়তো কিছুক্ষণ ব'সে গল্প করাই যাবে না।

বাস থেকে নেমে মোল্লার দিঘি পর্যন্ত যেতে সমীরের কোন অসুবিধা হ'ল না। ম্লান জ্যোৎস্নায় চিক চিক করছে দিঘির জল। শান বাঁধানো ঘাট। দু' একটা গাছের জটলা। একটু থামল সমীর। খোয়া ওঠা রাস্তা। আশে পাশে প্রচুর বাড়ী উঠছে। বাঁশের ভারা বাঁধা। চূণের উগ্র গন্ধ। হ্যারিকেনের ম্লান দীপ্তি জানালার ফোকরে ফোকরে।

পকেট থেকে চিরকুট বের ক'রে চাঁদের আলোয় একবার পড়ে নিল। ঠিক আছে। বাঁ-হাতি রাস্তা। সামনে বাগানের ইসারা। গেট বরাবর গিয়ে থমকে দাঁড়াল। ভিতরে আলো দেখা যাচ্ছে বটে, কিন্তু ধারে কাছে কেউ নেই। কি ব'লে ডাকবে? রমার নাম ধরে কিংবা কমলের নাম ধ'রে। কি আর অসুবিধা। বার দুয়েক কেশে সমীর গলাটা ঠিক ক'রে নিল। কোঁচার খুঁট দিয়ে কপালের ঘাম মুছে ডাকতে যাবার মুখেই বাধা পেল। এতক্ষণ লক্ষ্য করে নি, বাগানের গন্ধরাজ ঝোপের পাশ থেকে একটি মহিলা একদৃষ্টে তাকে লক্ষ্য করছে। আবছা অন্ধকার। ঝোপের ওপাশে থাকার দরুণ কেবল দেহের কাঠামোটা দেখা যাচ্ছে। কিন্তু আগুনের মতন জ্বলছে দুটি চোখ। রাতের আঁধারে বেড়ালের চোখের মতন।

—রমা থাকে এখানে? রমা আর কমল? কি ভেবে সমীর মেয়েটির দিকে চেয়েই বলল।

এ বাড়ীতে যদি রমা থাকে, তবে ঠিকই বলতে পারবে। মেয়েতে মেয়েতে ভাব হতে দিন তিনেকও লাগে না।

সরাসরি কথা বলতেই যশোদা ত্রস্তহাতে ঘোমটা টেনে দিল মাথায়, সরে যেতে যেতে বলল, কে আপনি? কোথা থেকে আসছেন?

সমীর আরও কয়েক পা এগিয়ে এল। যাক, নিশ্চিন্ত, রমার পাত্তা যখন পাওয়া গেছে, তখন সব ঠিক হয়ে যাবে।

গলা একটু চড়িয়ে বলল, আমি রমার দাদা। কলকাতা থেকে আসছি।

যশোদা খবর দেবার আগেই রমা জানালায় এসে দাঁড়াল। রান্না-ঘরে কাজে ব্যস্ত ছিল, কাজ শেষ করে গা ধুতে যাবার আগে গামছা নিতে এসেছিল, চেনা মানুষের গলার আওয়াজ কানে যেতেই থমকে দাঁড়াল গরাদ ধরে। কমলের ফিরতে দেরি আছে। কোন বন্ধুর বাড়ি নিমন্ত্রণ। খাওয়া দাওয়া সেরে রাত্রে আসবে। শুধু একজনের মতন রান্না, তাই একটু বেলা করেই রমা রান্নাঘরে ঢুকেছিল।

কথাগুলো কানে গেলেও ঠিক বুঝে উঠতে পারে নি রমা। এমন একটা সৌভাগ্য বুঝি সে কল্পনাও করতে পারে নি। দরজা খুলে প্রথমে চাতালে গিয়ে দাঁড়াল তারপর চীৎকার করে উঠল, ছোড়দা তুমি!

সমীর এগিয়ে এসে রমাকে ধরে না ফেললে সে বোধ হয় পড়েই যেত মেঝের ওপরে। সারা শরীর কেঁপে উঠলো থর থর করে, নিরক্ত দুটি ঠোঁট, দু গালের রং কাগজের মত সাদা। মিনিট দুয়েক, তারপরই নিজেকে সামলে নিল। ঘরে ঢুকে হ্যারিকেনের পলতেটা উস্কে দিয়ে গোটানো শতরঞ্চটা পেতে দিল সামনে, তারপর অল্প হেসে বলল, এস ছোড়দা।

বলবার আগেই সমীর ঘরে ঢুকে পড়েছিল। চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখল এদিক ওদিক। রমার সংসার। ফিটফাট, সাজানো গোছানো দেয়ালে টাঙানো ছবিগুলো থেকে শুরু করে আলনায় সাজিয়ে রাখা শাড়ীজামাগুলো পর্যন্ত। যত্ন আর পারিপাট্যের ছোঁয়াচ। রমার

দিকে চেয়ে চেয়ে দেখল। আরো সুন্দর হয়েছে রমা, আরো পরিপূর্ণ, সিঁথির সিঁদুরের ছোঁয়াচ দুটি গালে।

রমার সঙ্গে সঙ্গেই সমীর হাত বাড়িয়ে মোড়কটা এগিয়ে দিল রমার দিকে।

—কি ছোড়দা ?

—খুলেই দেখ।

শাড়ী আর সিঁদুর কৌটা। বিয়ের পর এই প্রথম দেখা, তাই আশীর্বাদ নিয়ে এসেছে ছোড়দা।

বিবাহিত জীবনের প্রতীক তো বটেই, আর একটা মানুষেরও ইঙ্গিত। শাড়ীটা বুকে চেপেই রমা কেঁদে ফেলল। প্রথমে ফুঁপিয়ে, তারপর অঝোর ধারায়। যে কাজ ওর বাপ করতেন তাই আজ করল ছোড়দা। এ উপহারের মধ্যে শুধু ছোড়দার প্রচ্ছন্ন স্নেহই নয়, ঘর ছেড়ে যাওয়া মেয়েকে ক্ষমা করার ইসারাও রয়েছে। তার বিবাহকেও স্বীকার করা।

কমল যখন ফিরল তখন ভাই বোনে পাশাপাশি বসে গল্পে মত্ত। জ্ঞান নেই দুজনের।

কমল জানলা দিয়ে দেখে হেসে ফেলল, তারপর আস্তে টোকা দিল দরজায়।

—কে ?

—বাইরের লোক। কমলের গলা পরিহাসতরল।

দরজা খুলতেই সমীরের দুটো হাত কমল নিজের হাতে টেনে নিল, এতদিনে আসবার কথা মনে হ'ল ? বাড়ী চিনলে কি করে ?

সমীর উত্তর দেবার আগেই রমা কথা বলল, রক্তের টান গো মশাই। এ কি আর কাউকে চেনাতে হয় !

খাওয়া দাওয়া সেরে সমীর যখন ছাড়া পেল তখন রাত অনেক। অন্ততঃ মজা আকন্দপুরে, যেখানে আটটার মধ্যে সব নিঃঝুম। কোন রকমে দৌড়ে সমীর শেষ বাস ধরল।

লোহার কারখানার এক শিফটের ছুটি হয় রাত দশটায়। সাইরেন বাজে পাঁচ মিনিট আগে। মজুরদের দল কাছাকাছি ব্যারাকে চলে যায়, কিন্তু গোটা কুড়ি বাবু আসে শহর থেকে। তারাই অনেক লেখালেখি করে শেষ বাস করেছে দশটা দশে। আগে শেষ বাস ছিল ঠিক ন'টায়। নয়তো সমীরকে এখানেই রাত কাটাতে হত।

পরের দিন কমল বেরিয়ে যেতেই যশোদা এসে দাঁড়াল। তেল মেখে রমা স্নান করতে যাবে এমন সময় একগাল হেসে যশোদা কাছে এগিয়ে গেল, যাক বাপু, এতকালের ঝগড়া মিটমাট হল শেষকালে।

ঝগড়া! ঝগড়া আবার কার সঙ্গে! রমা ভুরু কুঁচকে যশোদার দিকে চাইল। শেষকালে বললও মুখ ফুটে, ঝগড়া আবার কার সঙ্গে গো যশোদাদি?

—কেন ভাইয়ের সঙ্গে, যশোদা মুখ টিপে টিপে হাসল, নইলে আর অত কান্নার ঘটা। যাক বাপু, সব ভালো যার শেষ ভালো। আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে মনোমালিন্য রাখতে আছে!

রমা কিছু বলল না। একটি কথাও নয়। কাল রাতের ব্যাপারটা একটু বাড়াবাড়িই হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু নিজেকে রমা

সামলাতে পারেনি। এতদিন পরে ছোড়দাকে দেখে রাজ্যের কান্না চোখ ফেটে বেরিয়ে এসেছিল। ওর দুঃখ যশোদা বুঝবে না। পৃথিবীর আর কোন মেয়েই বোধ হয় পারবে না বুঝতে। তাছাড়া রমাও কাউকে বোঝাতে পারবে না।

গুটানো মাদুরটা পেতে নিয়ে যশোদা বসল। রমার স্নান করার দফা শেষ। কতক্ষণ গালগল্প চালাবে ঠিক আছে! শুধু গালগল্প? খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে কেবল কথা বের করবার চেষ্টা।

—দিব্বি দেখতে তোমার ছোড়দাকে। যেমন রং তেমনি মুখচোখ। তোমাদের ভাইবোনে চেহারায় বেশ মিল আছে।

ছোড়দার প্রশংসা শুনলে নিজেকে আর চাপতে পারে না রমা। মেঝের ওপর বসে বলল, এখন আর কি চেহারা দেখছ। রোদে পুড়ে কি ছিরিই হয়েছে, তাছাড়া এখন তো ন্যাড়া মাথা, মাথায় ঢেউ খেলানো কি চুলের বাহার ছিল।

—কাল গরমের জন্য আমি যখন বাগানে পায়চারি করছিলাম, তখন দেখলাম ভদ্রলোক উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছেন সামনেটায়। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হ'তেই তোমার কথা জিজ্ঞাসা করলেন।

—আচ্ছা, এবার ছোড়দা এলে তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবো যশোদাদি। দেখবে কেমন আমুদে লোক। কি রকম মজার মজার সব কথা বলতে পারে।

—তাই বুঝি? যশোদা আরো জাঁকিয়ে বসল। দেয়ালে হেলান দিয়ে। তোমার ছোড়দার নাম বুঝি সমীর, না? কাল রাতে তোমার কর্তা ডাকছিলেন ওই নামে, ওপর থেকে শুনছিলাম। খুব হাসাহাসি হচ্ছিল তিনজনে!

—হ্যাঁ, আমাদের তিনজনে খুব জমে। ছোড়দার নাম সমীর বন্দ্যোপাধ্যায়। কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই রমার মুখ বিবর্ণ হ'য়ে

গেল। পলকের মধ্যে মুখের রক্ত কে যেন শুষে নিল। সর্বনাশ !

সত্যিই সর্বনাশ। কারণ কথাগুলো যশোদা মন দিয়ে শুনছিল। রমার কথা শেষ হতেই গম্ভীর হ'য়ে গেল। থমথমে ছায়া নামল মুখের ওপরে। চোখের দৃষ্টিতে সন্দেহের ছোঁয়াচ।

—কি রকম হল ? তোমার স্বামীর পদবী ঘোষ অথচ তোমার ভাই বামুন ?

অনুভব করতে পারল রমা, আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে পায়ের তলার মাটি। শেষ অবলম্বনটুকুও যেন সরে যাচ্ছে। একবার মনে হল প্রাণপণে চীৎকার ক'রে উঠবে। মানি না কিছু, তোমাদের হাতে গড়া জাতিভেদ, তোমাদের স্বার্থান্ধ দৃষ্টিভঙ্গী, তোমাদের কলুষ প্রথা। মনের মিলের চেয়ে বড়ো মিল আর কিছু হতে পারে না। হৃদয়ের নির্দেশের কাছে আর সব মিথ্যা, সব ভঙ্গুর।

কিন্তু মনে যা অনুভব করা যায়, তা সব সময় বলা যায় না মুখ ফুটে, বিশেষ ক'রে যশোদার কাছে।

রমার আপাদমস্তক তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে নিরীক্ষণ ক'রে ঠোঁট মুচকে যশোদা হাসল। দেয়াল ধরে উঠে দাঁড়াল প্রথমে, তারপর চাবির গোছা ঝনাৎ ক'রে পিঠের ওপর ফেলে বলল, গোলমাল যে আছে তা আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল। এত ঢলাঢলি কি আর বিয়ে করা বৌয়ের সঙ্গে কেউ করে। দিনরাত মুখোমুখি গলাগলি ভাব। হুঁ ! বাবারও যেমন কাণ্ড ! খোঁজ নেই, খবর নেই, ভাড়াটে অমনি বসালেই হ'ল।

যতক্ষণ সিঁড়িতে যশোদার পায়ের শব্দ শোনা গেল, ততক্ষণ কাঠ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল রমা। আঁচল বুকের কাছে জড়ো করে। পায়ের আওয়াজ মিলিয়ে যেতেই মেঝেয় উপুড় হয়ে পড়ল।

কি সর্বনাশ হ'য়ে গেল। সামান্য একটু ভুলে, সাজানো সংসার তচনচ। আসল যা ব্যাপার তার ওপরে কালির রাশ বুলিয়ে বিশ্রী এক ছবি এঁকে তুলবে সবাই। অন্তঃপুরবাসিনীকে তুলনা করবে হয়তো বারনারীর সঙ্গে। অসবর্ণ বিবাহ, যশোদার কাছে তো বিবাহই নয়। বোঝালেও বুঝবে না। সব কিছুর কুৎসিৎ অর্থ করবে। তাছাড়া, কমলই বা শুনলে কি বলবে! বার বার ব'লে গেছে, সাবধান হ'য়ে চলাফেরা করতে, খুব খেয়াল ক'রে কথাবার্তা বলতে।

কোন রকমে স্নান সেরে রমা ভাত নিয়ে বসল। গ্রাস দুই। পেটের মধ্যে ঘুলিয়ে উঠল। বমি বমি ভাব। কিছুতেই আর মুখে দিতে পারল না।

সারাটা দুপুর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল। গড়াল গোটা মেঝেয়। মাঝে মাঝে ওপর থেকে মা মেয়ের অস্ফুট গুঞ্জন শোনা গেল, কিন্তু কান পেতেও রমা কথাগুলো বুঝতে পারল না কিছু।

এটুকু বুঝলো, আসন্ন ঝড়ের পূর্বাভাষ। যশোদার বাবা নেই। জমিজমার ব্যাপারে বুঝি দেশে গেছেন। ফিরতে আরো দিন চারেক। তারপর বোঝাপড়া শুরু হবে। পুরোহিত নেই, মন্ত্রপড়া নেই, সামাজিক কোন অনুশাসন নয়, নিছক দুটো কালির আঁচড় বুলিয়ে বিয়ে। এমন টলমলে ভিত্তির ওপর স্থায়ী কিছু গড়ে উঠতে পারে কখন!

বিকালের দিকে কমল ফিরতেই রমা সব বলল একটু একটু করে। গোড়া থেকে শেষ।

দুটো হাত বুকের ওপর আড়াআড়ি রেখে কমল সব শুনল, তারপর হেসে বলল, ঠিক আছে। এর জন্য কেঁদে ভাসাচ্ছো তুমি। আর

কাউকে গ্রাহ্য করি না। সমীর যখন মেনে নিয়েছে, তখন কোথাকার কে মুখ ফিরিয়ে থাকলো, তাতে কোন ক্ষতি হবে না আমাদের। তাছাড়া, সিভিল ম্যারেজ তো অলিতে গলিতে হচ্ছে আজকাল। ওদের চেঁচামেচিতেই বিয়ে অসিদ্ধ হয়ে যাবে ?

তেপান্তরের মাঠে দিশাহারা পথিকের সামনে আলোর ইসারা। ডুবন্ত মানুষের পায়ে মাটির আশ্বাস। রমা যেন নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল। তবু মনের কোণে ছোট্ট সন্দেহের কণা। যশোদাদির বাপ ফিরলে যদি হৈ-চৈ ক'রে এই নিয়ে ? পাড়ার লোক জড় ক'রে ?

—মাথা খারাপ, কমল ঠোঁট উল্টে হাসল, যার জামাই থিয়েটারে নটীদের সঙ্গে অভিনয় ক'রে রাতের পর রাত, সে আসবে পরের খুঁত ধরতে ? চুপচাপ মুখ বুজে থাকবে, দেখো না।

কটা দিন রমা বেশ ভয়ে ভয়েই রইল। ওরই মধ্যে আশা করল হয়তো যশোদাদি কড়া নাড়বে দুপুর বেলা। মেয়েমানুষের মন, কদিন থাকবে এড়িয়ে এড়িয়ে ? কিন্তু মিছা আশা। যশোদা এ পথও মাড়াল না। ওপরে মা মেয়ের কথা শোনা গেল। হাসির আওয়াজ পাওয়া গেল। কিন্তু দুজনের কেউ নিচে নামল না।

চারদিনের দিন যশোদার বাপ এসে পৌঁছালেন। ভাগ্য ভালো রমার। কমলের ছুটির দিন। খোলা দরজার সামনে ব'সে কমল খবরের কাগজ পড়ছিল, বাড়িওয়ালা সামনে এসে দাঁড়ালেন, তারপর মশাই, কি খবর ? ছুটি বুঝি আজ ? বেশ আছেন কিন্তু।

—তাতো বলবেনই। যখন সারাটা রাত অফিসে কাটিয়ে আসি, তখন তো নজরই দেন না সেদিকে।

বাড়িওয়ালা হাসলেন। অনেকক্ষণ ধ'রে। পেঁচিয়ে, পেঁচিয়ে। তারপর মেঝেয় রাখা কাপড়ের ব্যাগটা তুলে নিয়ে বললেন, চলি মশাই।

চার ঘণ্টা রেলে কেটেছে। চান টান না ক'রে ফেলতে পারলে স্বস্তি পাচ্ছি না। বিকেলের দিকে আসবো, বাড়ীতে আছেন তো?

—হ্যাঁ, আছি। আজ আর কোথাও বেরবো না।

সিঁড়িতে দু-ধাপ উঠেও বাড়িওয়ালা আবার ঘুরে দাঁড়ালেন, বৌমাকে বলবেন বেশ কড়া ক'রে এক কাপ চা দিতে বিকেলে। বৌমার চায়ের হাতটি ভারি সরেশ।

রমা সব শুনল দরজার পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। এও বুঝল, একবার ওপরে উঠে সব কথা শুনলে আর বিকেলে চা খেতে নামবেন না। শেষে কি জাতহারানো কুলখোয়ানো মেয়ের তৈরি চা খেয়ে চোদ্দপুরুষ নরকস্থ করবেন!

বিকেলে কেন, রমার ভয় হল কথাটা শুনে এখনি না ভদ্রলোক হন্তদন্ত হ'য়ে নিচে নেমে আসেন। পাড়ার মধ্যে এমন কেলেঙ্কারী, তাও আবার তাঁরই বাড়িতে। বাঘের ঘরে ঘোগের বাসার সামিল।

পুরো বিকেলও নয়, সবে পৌণে চার। সিঁড়িতে চটির শব্দ।

রমার চোখ মুখ শুকিয়ে গেল। অবশ্য বাড়ির মানুষ বাড়িতেই রয়েছে। সেদিকে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু কি কথায় কি কথা ওঠে ঠিক আছে। এমনি কমল নিরীহ প্রকৃতির মানুষ, মুখে হাসি লেগে আছে সর্বদা। তবে চটে উঠলেই সর্বনাশ। বিশেষ ক'রে ওর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে ইঙ্গিত করলে আর জ্ঞান থাকে না।

দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হ'তেই রমা রান্নাঘরে গিয়ে দাঁড়াল। ভেজানো কপাটের আড়ালে।

কমল তেঁতুল দিয়ে ফুলদানীটা বসে বসে মাজছিল, উঠে দরজা খুলে দিল।

—আসুন, আসুন!

—বৌমার হাতের চা খাবার লোভে আর তর সইল না। চারটে বাজার আগেই নেমে এলাম।

—বেশ করেছেন। আমিও চা খাই এই সময়ে। ওগো, কমল রান্নাঘরের দিকে চোখ ঘোরাল, আমাদের চা পাঠিয়ে দাও।

রমার যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। ফাঁড়া কেটে গেল। এ নিয়ে আর নাড়াচাড়া করতে চান না যশোদার বাবা। কমলের কথাই বোধহয় ঠিক। যাঁর বাড়িতেই গলদ তিনি আবার কোন সাহসে পরের খুঁত ধরতে যাবেন?

মহা উৎসাহে ষ্টোভ জ্বালিয়ে রমা চা করতে বসল।

রমা একবার ভাবল চায়ের কাপ হাতে ক'রে নিজেই নিয়ে যাবে। বাপের বয়সী ভদ্রলোকের কাছে আবার কিসের সঙ্কোচ। কিন্তু এগুতে সাহস হল না। মুখে কিছু না বললেও যশোদার বাবা মনে মনে কি ভাববেন। বামুনের মেয়ে আর কায়েতের ছেলে বাধা নিষেধের গণ্ডী পার হ'য়ে ঘর বাঁধল এক সঙ্গে। ওদের যুগে এ সবের জন্য ঢি ঢি পড়ে যেতো চারিদিকে, একঘরে করতো সমাজ। এ বিয়েই তো অসিদ্ধ।

মনে সাহস আনল রমা। অন্যায় যখন নয়, তখন কেন সে কুঁচকে ছোট হয়ে থাকবে। কিসের লজ্জা, ভয়ই বা কিসের।

চায়ের কাপ ঠিক ক'রে ষ্টোভটা নিভিয়ে উঠতে গিয়েই থেমে গেল রমা। এতক্ষণ ষ্টোভের আওয়াজের জন্য বাইরের কথাবার্তা কানে আসছিল না, এবারে স্পষ্ট সব কিছু শোনা গেল।

—ওসব আমি মানি না ভায়া। সে যুগ পাল্টে গেছে। বারো বছরের মেয়েকে যার তার হাতে গছিয়ে দেওয়া চলত যখন তখন মেয়েদের লেখাপড়া শেখা বারণ ছিলো, বাড়ির চৌকাঠ পার হ'লে লোকে ছি ছি করতো। এখন মেয়েরা লেখাপড়া শিখছে, চোখ

ফুটেছে, এখন হাত-পা বেঁধে যে কোন লোকের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া কখন চলে ?

কমল কথা বলল না, কেবল সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ল।

—বাড়িতে একটু ইয়ে করেছিল, যশোদার মা। কিন্তু আমার ওসব বালাই নেই। এই তো দেখে শুনে পাল্টা ঘরে একরাশ টাকা খরচ ক'রে মেয়ের বিয়ে দিলাম, হলো কি? দু দিন যেতে না যেতে জামাইয়ের আমার রাংতা উঠে আসল রূপ বেরিয়ে পড়ল। শুনেছিলাম খুব জমিজমা আছে, মস্ত বনেদী ঘর, ওই নামেই তালপুকুর, ঘটি ডোবে না। এখন বাবাজী বাজারের মেয়েদের সঙ্গে নেচে বেড়াচ্ছেন, আরও যা সব করছেন সে আর মুখে বলবার নয়।

বাড়িওয়ালা একটু থামতেই রমা কড়ার আওয়াজ করল। ঠুক ঠুক।—

—ওই নাও বাবাজী, টেলিগ্রাম এসে গিয়েছে, চা বোধ হয় তৈরী।

কমল রান্নাঘরের চৌকাঠ বরাবর এসে চায়ের কাপ দুটো নিয়ে এল।

—এ নিয়ম থাকবে না দেখবেন, এতক্ষণ পরে কমল কথা বলবার সুযোগ পেল, আজকাল ছেলেমেয়েদের বিয়ে দেওয়াই এক সমস্যা। বর মেলে তো ঘর মেলে না, আর ঘর মেলে তো বর পছন্দসই নয়। কৌলিন্য প্রথা তো উঠেই গেছে এক রকমের, অসবর্ণ বিয়েও চালু হয়ে যাবে।

বাড়িওয়ালাকে নয়, কমল যেন নিজেকেই বোঝাচ্ছে। রমাকে ঘরের বাইরে নিয়ে আসবার আগে রাতের পর রাত যে ভাবে নিজেকে বুঝিয়েছে, সেই কথাগুলোই আউড়ে যাচ্ছে।

প্রবল বাধা আসবে, অনেক লোক মুখ ফিরিয়ে থাকবে, ক্রমে সব সয়ে যাবে। সতীদাহ প্রথার মতন বর্বর প্রথা কোন দেশে কোন

কালে ছিল কি না জানি না, কিন্তু আশ্চর্যের কথা, সে প্রথা তুলে দেবার সময়ও আপত্তি উঠেছিল, বাধা দেবার চেষ্টাও বড় কম হয় নি।

মনে পড়ে গেল রমার। ছোড়দার ছোট্ট ঘরে বসে এমনি তর্কের তুফান তুলত কমল।

বাড়িওয়ালা বেরিয়ে যেতেই রমা কমলের কাছে গিয়ে দাঁড়াল, কি ব্যাপার? ভেবেছিলাম, সব শুনে ভদ্রলোক তেতে উঠবে, কিন্তু এ যে একেবারে ঠাণ্ডা জল।

কমল হাসল, বুদ্ধিমান লোক হৈ চৈ করে যেখানে সুবিধা হবে সেখানে চেঁচামেচি করেন। শক্ত মাটিতে আঁচড় কাটেন না। এই বাজারে এত দূরে ভাড়াটে পাওয়া তো সোজা কথা নয়; দেখছ তো আশে পাশের অবস্থা। শহর ছেড়ে এত দূরে কে আর এত ভাড়া গুণতে আসবে।

তা ঠিক। আশে পাশের ভাড়া অনেক কম। তার ওপর খিটিমিটি লেগেই আছে। বাড়িওয়ালা থামে তো ভাড়াটে শুরু করে। জল নিয়ে, আলো বাতাস নিয়ে, গেটের দরজা বন্ধ নিয়ে, গোলমালের অন্ত নেই। সে তুলনায় তো রমারা মুখ বুজিয়ে থাকে। জোরে নিঃশ্বাসও নয়।

কিন্তু এ ত একরকম হ'ল। সারাদিন রমা একলা থাকে। প্রায়ই আজকাল যশোদা আর মাঝে মাঝে তার মা এসে জুটত। কথায় বার্তায় সময় কেটে যেত। আশপাশে আর কারুর সঙ্গে তেমন ভাব হয় নি রমার। মুখচোরা মেয়ে, কেউ আগ বাড়িয়ে কথা না বললে আলাপই করতে পারে না। কি আর করা যাবে। মানুষ যদি বিনা কারণে মুখ ফিরিয়ে থাকে তো রমা আর কি করবে! ছোড়দা

যখন ফিরে এসেছে, তখন সব ক্ষতি, সব দুঃখ রমা হাসিমুখে সহ্য করবে। একটু টলবে না।

সত্যিই তাই। ওপরে কথাবার্তা হাসি হুল্লোড় সবই হল, কিন্তু ওপরের মানুষ নিচে নামল না। যশোদার মা তো নয়ই, যশোদাও নয়।

বাসন মাজতে মাজতে সুখী বিড়বিড় করতে লাগল। শুরুতে ফিসফিসিয়ে, তার পর বেশ জোর গলায়।

প্রথমে রমা কানেই তোলে নি, কিন্তু তারপর চুপ ক'রে থাকা আর সম্ভব হল না।

—কি লা সুখী, কি বকর বকর করছিস ?

—ঝঁ্যাটা মার অমন ভদ্দরলোকের মুখে। নিজের ছিদ্দির কে দেখে তার নেই ঠিক, ওঁরা আবার পরের ছিদ্দির খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

সবটা না বুঝলেও রমা আভাসে বেশ কিছুটা বুঝল। তবুও জিজ্ঞাসা করল একবার, কি, হ'ল কি ? কার সঙ্গে ঝগড়া করে এসেছিস ?

—তুমি তো কেবল আমার দোষই দেখ বউদি। গরীব কিনা, আমাদের সবই মন্দ। আর যারা দুতলা বাড়ি হাঁকিয়ে মানুষকে অকথা কুকথা ব'লে বেড়াচ্ছে, তাদের কোন দোষ নেই।

—কি হ'ল ভেঙে বলবি তো ? আমি তো আর হাত গুণতে জানি না, হাত দিয়ে চুলের জট ছাড়াতে রমা সুখীর কাছে গিয়ে বসল।

—ওই দেখ না, ওপরের বাড়ির সব বলে কিনা তোমাদের নাকি জাত নেই, দাদাবাবুর সঙ্গে নাকি তোমার বিয়ে হয় নি, তোমাদের বাড়ি কাজ করলে নাকি আমারও জাত যাবে ! শোন একবার কথা !

—কেন, ঠিকই তো বলেছে।

—কি বলেছে ? বাসন মাজা থামিয়ে সুখী চোখ কটমট করে চাইল।

—তোমার দাদাবাবুর সঙ্গে বিয়ে তো আমার হয় নি।

—তবে? সুখী ভুরু কোঁচকাল।

—তোর দাদাবাবুর হাত ধরে আমি এক রাতে বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছি।

কি বুঝল সুখী কে জানে। অনেকক্ষণ চেয়ে চেয়ে দেখল তারপর একগাল হেসে বলল, বেশ করেছ, অমন মহাদেবের মত মানুষের হাত ধ'রে শুধু ঘর কেন সব কিছু ছাড়া যায়।

রমা আরো একটু এগিয়ে এল, ওপরের যশোদাদি কিছু বলছিল বুঝি?

—শুধু যশোদাদি কেন, তার মাও কি কম যায় নাকি! সুখী খর খর করে উঠল।

—যশোদাদির বাবা তো কাল বিকেলে এসেছিলেন, চা খেয়ে গেলেন।

—ওই তো মজা বউদি। দরকারের সময় খাবে দাবে, দাঁত ছরকুটে হাসবে আবার পিছনে চিমটি কাটতে ছাড়বে না।

এ সব কথা নিয়ে ঝি চাকরের সঙ্গে আলোচনা করতেও রমার বিবেকে বাধে।

—যাক গে সুখী, নিজের বাড়িতে বসে যার যা ইচ্ছে বলুক—

—কেনই বা বলবে? সুখী সুর সপ্তমে চড়াল, নিজেদের গুণপণার কথা সব জানি আমি। হাটে হাড়ি ভেঙে দেব না? ওই জামাইবাবু থিয়েটার ক'রে ক'রে বেড়ায়, সিঁড়ির কোণে একলা পেয়ে হাত জাপটে ধরে নি আমার? কিন্তু এ বড় শক্ত ঠাঁই। এখানে সুবিধে হবে না। কথাটা মাকে বলতে তাড়াতাড়ি মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে পান খেতে আট আনা পয়সা হাতে ঠেকিয়ে দেয় নি? কি করবো বউদি, অভাবের সংসার, নয়ত অমন বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে আমি আর পা দিই?

—আঃ সুধী, চাপা গলায় রমা ধমক দিয়ে উঠল। বড় বাড়াবাড়ি হচ্ছে। ছোট মুখে বড় কথা।

তাছাড়া এ সব শুনতে রমার কোনদিন ভাল লাগে না। পাড়ার পাঁচজনের পাত কুড়নো। নোংরা যত কথা। ছি ছি।

রমা সেখান থেকে সরে বাইরের ঘরে এসে দাঁড়াল। জানালার ধারে।

ঠিক গেটের পাশে ঘাসের ওপর চোখের সামনে খবরের কাগজ মেলে ধরে নীরেনবাবু বসে আছেন। চোখ দুটি কিন্তু কাগজের ওপর নয়, নিমীলিত। মুখে গুণ গুণ ক'রে গানের সুর ভাঁজছেন। সামান্য একটু চুড়ির আওয়াজ হতেই চোখ খুলে চাইলেন। গান থামিয়ে একগাল হেসে বললে, প্রাতঃপ্রণাম বউঠান, মুখটা অমন থমথমে যে? ঝগড়ার পালা চলছে না কি?

অন্যদিন হলে কি হত বলা যায় না। রমা হয়তো সরেই আসত জানালা থেকে। কিন্তু এখন ব্যাপার অন্য। যশোদার বাবা চা খেয়ে গেছেন যেচে, যশোদার স্বামী হালকা রসিকতা শুরু করেছেন, আস্তে আস্তে হয়তো যশোদা আর তার মাও নেমে আসবে সিঁড়ি দিয়ে। মান অভিমানের পালা চুকিয়ে পুরোনো আলাপের খেই ধরবে।

রমা হাসল, বালাই ষাট, ঝগড়া হতে যাবে কোন দুঃখে?

কাগজটা ভাঁজ ক'রে নীরেনবাবু উঠে দাঁড়ালেন। একটু এগিয়ে এলেন জানালার দিকে, তারপর চোখের কোণ কুঁচকে হেসে বললেন, সব শুনলাম বউঠান। সারারাত বকবক করেছে। খুব করেছেন, ভালবাসার মানুষকে নিয়ে ঘর ছাড়বার সাহস কটা মেয়ের থাকে? ওই তো লুকিয়ে চুরিয়ে দেখা, আর জানালা দিয়ে চিঠি ছুঁড়ে দেওয়া, তারপর একদিন বাপের পছন্দ করা ছেলের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে গুটি গুটি গাড়িতে গিয়ে ওঠে। রামঃ, রামঃ, এসব কাদার তাল নিয়ে ঘর করা যায়?

বিপদে পড়ল রমা। সব লোকের মুখেই এক কথা। কানু ছাড়া বুঝি গীত নেই।

নীরেনবাবু আরো দু-এক পা এগোলেন, আমাদের থিয়েটারেও দু-একটি মেয়ে ছিটকে ছুটকে আসে। প্রেম করে ঘর ছেড়েছে তারপর শখ ফুরোতে প্রেমিকবর ফেলে পালিয়েছে। দু-কূল খুইয়ে আসা মেয়েদের আশ্রয়স্থলই হচ্ছে থিয়েটার আর সিনেমা। বুঝলেন? নীরেনবাবু আকর্ণ হাসলেন।

ওমা, কি অমঙ্গলের কথা! রমা শিউরে উঠল। কাঁটা দিয়ে উঠল সারা গা। কথার মধ্যে কি বিশ্রী ইঙ্গিত লুকান রয়েছে তা কি বুঝতে পারছেন না নীরেনবাবু, না কি বুঝতে পেরেই বলছেন ইনিয়ে বিনিয়ে। রমাকে আশ্বাস দিচ্ছেন। কোন দিন যদি কমল ফেলেই পালায় রমাকে কিম্বা এঁটো পাতার মতন রাস্তার ওপর ছুঁড়ে দিয়ে সরে দাঁড়ায় তখন ভাববার কিছু নেই রমার। নীরেনবাবুদের থিয়েটারের দরজা তো খোলা রইলই। কোন অসুবিধা নেই। নিজের হাতে নিজের মুখে কালি লেপে বেরিয়ে আসা মেয়ের পক্ষে নতুন ক'রে নিজের মুখে রং লেপে দেওয়া আর শক্তটা কি?

অভিনয়! মেয়েদের পক্ষে অভিনয় করাটা তো খুবই সোজা। বিশেষ ক'রে এমন ধরণের মেয়ে। বউ সেজে ঘোমটা টেনে সাজান সংসারে চলাফেরা, সত্য মিথ্যা মিশিয়ে নকল একটা অতীত জীবন সৃষ্টি করা—সব কিছুই তো অভিনয়ই।

চোখে জল ভরে আসতেই রমা সরে এল জানালা থেকে। দাঁড়িয়ে থাকলে আরো কি সব কথা শুনতে হবে ঠিক আছে? এতক্ষণ যে-কথা আভাসে ইংগিতে নীরেনবাবু বলার চেষ্টা করছিলেন, সে-কথাই হয়তো বলবেন সোজাসুজি মুখ ফুটে।

দিন দশেক। অনেক ভেবে চিন্তে দুপুর বেলা রমা কাগজ কলম নিয়ে বসল। ঠিকানা তো জানাই। ছোড়দাকে চিঠি লিখবে একটা। সেই কবে এসেছে, আর আসার নামই নেই। বোনকে এমনি ক'রেই বুঝি ভুলে যেতে হয়! তা ছাড়া একলা একলা প্রায় হাঁফিয়ে উঠেছে রমা।

যশোদ, আর যশোদার মা কেউ এদিক মাড়ায় না। হঠাৎ চোখা-চোখি হ'য়ে গেলেও ঘুরে দাঁড়ায় কিম্বা ঘোমটা টেনে দেয় মাথায়।

কমল অবশ্য বলেছে, কেন, পাড়ায় কি মেয়েছেলের অভাব। আশে পাশের মেয়েদের সঙ্গে ভাব করলেই হয়। জানালা দিয়ে রমা ভাব করেছে লাল বাড়ীর দুটি বউয়ের সঙ্গে। ছোট ছোট বউ, দুই জা-ই বুঝি হবে। হাত নেড়ে ডেকেছে তাদের। এক গলা ঘোমটা দিয়ে বেড়ার কাছ বরাবর তারা এসেছে। মুচকি হেসেছে। কিন্তু বেড়া ডিঙ্গিয়ে রমাদের বাড়ী আসে নি। একটুও সময় নেই। শ্বশুর শাশুড়ী দেওর বাচ্ছা-কাচ্ছা নিয়ে উনিশজন মানুষ। ভোর পাঁচটা থেকে শুরু করে রাত সাড়ে আটটা পর্যন্ত সংসারের জোয়াল কাঁধে। একটু নিশ্বাস ফেলার সময় নেই। অবসর মত রমা দু-একদিন গিয়েছিল কিন্তু ভাল লাগে নি। ভারি নোংরা। কোথাও হাত পা ছড়িয়ে বসবার জো নেই। তাছাড়া দু'দণ্ড ব'সে কথা বলবার উপায় নেই বউ দুটির। ডাকের ওপর ডাক। তার ওপর ছেলেপুলেদের চেঁচামেচি, কান্নাকাটি। সুস্থির হয়ে কথা বলারও সময় নেই।

তবু ছোড়দা এলে তিনজনে সময়টা কাটে। শনিবারও তো আসতে পারে ছোড়দা! দু-রাত কাটিয়ে একেবারে এখান থেকে সোমবার অফিসে যাবে। এ কথাগুলোই রমা গুছিয়ে লিখল।

প্রমীলা খেয়ে দেয়ে নিচে নামছিল, উদ্দেশ্য সমীরের ঘরে যদি কোন বইয়ের সন্ধান মেলে। তবু দুপুরটা কাটবে। আগে

আগে বেশ গল্প উপন্যাসের বই নিয়ে আসত সমীর ঠাকুরপো, মজার মজার কাহিনী ; আজকাল কি যে হয়েছে—যত রাজ্যের মোটা মোটা প্রবন্ধের বই। একটি বর্ণও বোঝবার উপায় নেই।

সিঁড়ির চাতালে নেমে প্রমীলা এদিক ওদিক দেখল। সোমনাথ বাবুর ঘরটা বসবার ঘর হয়েছে। দু'একটা চেয়ার, পায়া ভাঙা নড়বড়ে তক্তপোষটা তো আছেই। অফিসের দু-একজন লোক আসে। তাসের আড্ডা হয়, এমনি গল্পগুজব। মাঝে মাঝে কর্তার পাল্লায় পড়ে ওকেও নামতে হয়!

চৌকাট পেরিয়ে প্রমীলা সমীরের ঘরে ঢুকল। কি ছিরি ঘরের। বালিশটা মেঝেয় গড়াগড়ি খাচ্ছে। স্তূপীকৃত বই আর কাগজ বিছানার ওপরে। একোণে ওকোণে সিগারেটের টুকরো, ছাইয়ের রাশ। বাডণ্ডুলে হলে যা হয়! এখন তো চাকরি-বাকরি করছে, মাইনে কম হোক, তবু মাস গেলে আনছে কিছু, দাঁড়াবার আস্তানাও একটা রয়েছে, বিয়ে থা করে সংসারী হলেই হয়। প্রমীলা অনেকবার বলেছে। ওর নিজের মাসতুতো বোন! দেখতে এমন কিছু নিন্দার নয়। এক সংসারে দুজনে পড়লে ভালই হ'ত। কিন্তু সমীর মুচকি হেসেছে। ঘাড় নেড়ে বলেছে, পাগল নাকি বউদি। নিজে খেতে পাই না, আবার শঙ্করাকে ডাকব।

—কেন খাওয়া-দাওয়ার কি অসুবিধাটা হচ্ছে তোমার? দুবেলা হাত পুড়িয়ে রান্না তো ঠিক করে দিচ্ছি। তবে এখন বোনের শোকে তুমি যদি খাওয়া-দাওয়া কমিয়ে দাও তো কি করতে পারি?

খোঁচাটাও সমীর গায়ে মাখে নি। খবরের কাগজের ভাঁজ খুলতে খুলতে বলেছে, খাওয়া কমিয়েছি কি বউদি? দেখছ গায়ে গতরে কি চেহারা হচ্ছে। এর পরে বাসে হয়তো নিতেই চাইবে না, বলবে মাল নেহি লেগা।

হাসি পেলেও, হাসি চাপল প্রমীলা। কাজের সঙ্গে খোঁজ নেই, কেবল এলোমেলো বাক্যের বাহার।

—সত্যি, তুমি যদি কথা দাও তো আমি মেসোমশাইকে আজই খবর পাঠাই। কিংবা যদি নিজে দেখতে চাও, তোমার দাদার সঙ্গে গিয়ে দেখতেও পার। টুনিকে দেখলে অপছন্দ হবে না।

প্রমীলার কথা শেষ হবার আগেই সমীর চীৎকার করে উঠেছে, ইস, দেখ বউদি, চীনে আবার গোলমাল শুরু হয়ে গেল। সেই ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি চীনে লড়াই লেগেছে, এর আর শেষ নেই। জাতটাকে বাঁচতে দেবে না দেখছি। শোনো বৌদি, কি লিখছে, হংকংয়ের এক সংবাদে প্রকাশ যে আনুমাণিক বারো হাজার সৈন্যসহকারে—

প্রমীলা আর দাঁড়ায় নি। দ্রুত পদক্ষেপে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে চলে এসেছে। কথায় আছে না, সাধলে মানুষের মান বাড়ে। এ তাই। ভারি তো গুণের পাত্র। মাস গেলে ক'টা টাকা মাইনে। তাও প্রমীলারই আত্মীয়ের দৌলতে। কৃতজ্ঞতা ব'লেও কি কিছু নেই? টুনির যে রংটা একটু চাপা আর মেসোরও টাকার জোর নেই, নইলে ও মেয়ে কবে পার হয়ে যেত। এমন ক'রে প্রমীলাকে যেচে অপমান সইতে হ'ত না।

বিছানার ওপর আড়চোখে নজর বুলিয়ে প্রমীলা টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল। বইটই আজকাল বুঝি সমীর আর আনেই না। এলোমেলো হয়ে পড়ে থাকা খবরের কাগজটা সরিয়েই প্রমীলা থমকে দাঁড়াল। একটা খাম। মুখ খোলা। সমীরের চিঠি। বাড়িতে কেউ নেই, তবু প্রমীলা এদিক ওদিক দেখল। খামটা সাবধানে তুলে নিয়ে তক্তপোষের ওপর বসল। গোটা গোটা মেয়েলী হাতের লেখা। ব্যাপারটা কি, সেই জন্যই বুঝি বিয়েতে মন নেই সমীর ঠাকুরপোর!

চিঠিটা খুলে দু-এক লাইন পড়েই প্রমীলা ভুরু কোঁচকাল। দাঁত দিয়ে চেপে ধরল নিচের ঠোঁট। ওঃ, তলায় তলায় এত। ভাই বোনে গোপনে পত্র চালাচালি। চিঠির কোথাও রমা নিজের ঠিকানা লেখে নি। ধড়িবাজ মেয়ে। কিন্তু বোনের আস্তানায় যে ভাইয়ের যাতায়াত আছে তার স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে চিঠিতে। ক'দিন ভাইকে না দেখে উতলা হয়ে পড়েছে রমা। সমীর যেন সামনের শনিবার নিশ্চয় আসে। শনি, রবি, দু'রাত কাটিয়ে একেবারে সোমবার ওখান থেকে অফিস যাবে!

চিঠিটা ভাঁজ করে প্রমীলা সেমিজের ভিতর রেখে দিল, তারপর তর তর ক'রে ওপরে চলে গেল।

বুকে বালিশ চেপে প্রমীলা উপুড় হয়ে শুল।

আর নয়। একটা হেস্তনেস্ত করতেই হবে। সেই রাত্রেই। স্পষ্ট কথা, এ বাড়িতে থাকতে হলে বোনের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা চলবে না। বোনের মুখ থেকে কালি নিয়ে বাড়ির সকলের মুখে মাখাবে, প্রমীলা বেঁচে থাকতে তা হ'তে দেবে না। বাউণ্ডুলে সমীরের হয়তো ভাবনা চিন্তা করার কিছু নেই, কিন্তু আত্মীয় স্বজন আছে প্রমীলার, মর্যাদাবোধ আছে। শ্বশুরের কাজের সময়ই তো টি-টি পড়ে গেছে। ক'জনের মুখে আর প্রমীলা হাতচাপা দেবে। মানুষ তো আর অন্ধ নয়, এমন মূর্খও নয় যে যা বোঝাবে তাই বুঝবে। কানাঘুষো, ফিসফাস কথা। আন্দাজে ব্যাপারটা সবাই আঁচ করেছিল। নেহাৎ বোধ হয় প্রমীলার মুখ চেয়ে কেলেঙ্কারী করে নি, নয়তো অন্য বাড়ি হ'লে হাতে-পাতে কেউ করত না। জলস্পর্শ পর্যন্ত নয়।

সারাটা দুপুর প্রমীলার অস্বস্তিতে কাটল। ব্যাপারটা সাজিয়ে

গুছিয়ে বাড়ির লোককে বলতে হবে। সমীরের না পোষায়, শহরে মেসের অভাব নেই। অসুবিধা তো নেই, রোজগার করছে এখন, নিজের ভার নিজে বেশ নিতে পারবে। চোখের সামনে থেকে সরে গিয়ে বোনের সঙ্গে যতই ঢলাঢলি করুক, কেউ তো আর দেখতে আসছে না।

অভয়াপদ আর সমীর। নামে যেমন মিল নেই, চেহারাও তেমনি। অভয়াপদ খর্বকায়, স্থূলত্বের দিকে ঝোঁক। রং ঘনশ্যাম না হলেও শ্যামলকান্তি তো বটেই। বয়সের চেয়েও ভারিক্কি ধরণের। চাকরী ভালো, মাইনে নিন্দের নয়, পদমর্যাদা সম্বন্ধে মানুষটি সর্বদা সচেতন। সব কিছু সৌভাগ্যের কারণ যে স্ত্রী-রত্নটি এবিষয়ে অভয়াপদ নিঃসন্দেহ। পারলে প্রতি বৃহস্পতিবার লক্ষ্মীর পটের বদলে স্ত্রীরই পূজার আয়োজন ক'রে এমনি ভাব।

অভয়াপদ বাড়ি ফিরতেই প্রমীলা গিয়ে সামনে দাঁড়াল। ভার ভার মুখ, জলটলটল দুটি চোখ। বিষণ্ণতার প্রতিমূর্তি।

—কি, শরীর খারাপ নাকি? টাইয়ের ফাঁসে আঙুল গলিয়ে অভয়াপদ বলল, এ ক' মাস একটু সাবধানে থাকতে হয়। আমার তো মনে হয় এই সময়টা বরং তোমার মার কাছে গিয়ে থাকাই ভাল।

প্রমীলা ফেটে পড়ল, আমাকে বিদেয় করতে পারলেই তোমাদের আপদের শান্তি হয়। আমিই হয়েছি যত আবর্জনা। আমাকে দূর করে দিয়ে দুভায়ে বোন ভগ্নিপতি নিয়ে একটু আমোদ আহ্লাদ কর। কথার শেষে প্রমীলা চোখে আঁচল চাপা দিল।

অভয়াপদ টাই খোলা শেষ ক'রে সরে কোটের বোতামে হাত ঠেকিয়েছিল, ব্যাপার দেখে থমকে দাঁড়াল। হল কি? বোন তো নিজের ব্যবস্থা নিজে করেছে। পরপুরুষের হাত ধ'রে চৌকাঠ পার হয়েছে। তাকে নিয়ে আবার কিসের আমোদ প্রমোদ?

অভয়াপদ এগিয়ে এসে প্রমীলার পিঠে হাত রাখল, কি হ'ল বলো দিখিনি। ভেঙে না বললে বুঝবো কি ক'রে। রমা কোন চুলোয় যে আমোদ আহ্লাদ করব তাদের নিয়ে।

চিঠিটা সেমিজের ভিতর থেকে এক সময়ে প্রমীলা বালিশের তলায় রেখেছিল। অভয়াপদর কথা শেষ হবার আগেই চিঠিটা হাতের মুঠোয় করে নিল। ফোঁপানো গলায় বলল, এক ভাই তো মেতেছে বোনকে নিয়ে। একদিন অন্তর যাচ্ছে বোনের বাড়ী, খাওয়া দাওয়া করছে। তুমিই বা বাকি থাক কেন। ঠাকুরপোর কাছ থেকে ঠিকানা জোগাড় করে দু' ভায়ে সাধ্য সাধনা ক'রে বোনকে নিয়ে এস ফিরিয়ে। কেবল তার আগে আমাকে কোথাও থেকে বিষ এনে দিও। চোখের সামনে বেলেল্লাপনা সইতে পারব না। তেমন বাড়ীর মেয়ে নই।

ততক্ষণে অভয়াপদ চিঠিটা পড়ে ফেলেছে। চিঠিটা প্রমীলার হাতে ফেরৎ দিয়ে গম্ভীর গলায় বলল, হুঁ, চিঠিটা পেলে কোথায় ?

দু-এক মিনিট। ঢোঁক গিলে প্রমীলা ইতস্ততঃ ভাবটা কাটিয়ে উঠল, তারপর বলল, পাবো আর কোথায় ? ছোটবাবুর সিন্ধুক থেকে চুরি করেছি।

—আমি কি তাই বলছি ? অভয়াপদ মোলায়েম ক'রে ফেলল গলার আওয়াজ, মানে সমীর চিঠিটা পকেটে করে নিয়ে যায়নি বড়, তাই বলছি।

—কেন নিয়ে যায় নি, সেকথা ছোটভাই অফিস থেকে ফিরে এলেই জিজ্ঞাসা কর। রোজকার মতন নিচে থেকে বই এনেছি পড়বার জন্য, হঠাৎ ঠক করে চিঠিটা পড়ল মেঝেয়। তুলে রাখতে গিয়ে দেখি বেশ হাতের লেখা। খুলে পড়া বোধ হয় আমারই অন্যায় হয়েছে।

—অন্যায় হয়েছে ? কি বলছ তুমি ? অভয়াপদ তেতে আগুণ।

কোটপরা অবস্থাতেই বেতের চেয়ারে বসে পড়ল, ভাগ্যিস তুমি চিঠি দেখলে তাই তো জানতে পারলাম সব কিছু। নয়তো ওই কালামুখির সঙ্গে সমীরের চিঠিপত্র দেওয়া নেওয়ার ব্যাপার তো ঘুণাক্ষরেও টের পেতাম না। অভয়াপদ একটু দম নিল। হাত বাড়িয়ে বিছানার ওপর থেকে পাখাটা তুলে নিয়ে হাওয়া খেতে খেতে বলল, আমার তো মনে হয় জানো মিলি, সমস্ত ব্যাপারটায় সমীরের আস্কারা ছিল !

—ছিল তা কি তুমি আজ বুঝলে ? এতক্ষণে প্রমীলা কিছুটা সহজ হ'ল। ওষুধ ধরেছে, আর ভয় নেই।

—অবশ্য সন্দেহ আমার গোড়াতেই একটু হয়েছিল। ওই যে খবরের কাগজের ছোকরা কমল, দিনরাত দুটিতে গুজগুজ ফুসফুস। এই সমস্ত মতলবই আঁটছিল কি না কে জানে ! নইলে রমার এতটা সাহস হবে তা মনে হয় না।

—তা হবে না কেন ? প্রেম যে গো, প্রেমে সাহস দেয়, লাজ লজ্জার মাথা খাওয়ায়। শ্রীরাধিকার ব্যাপার পড় নি ?

কথা আর বাড়াল না অভয়াপদ। কথা বাড়ালেই তো আর সমস্যা মিটছে না। বাড়ির মেয়ে কুলে কালি দিয়ে ঘর ছেড়েছে, শুধু ঘরের দরজাই নয়, তার জন্য মনের দরজাও বন্ধ রাখতে হবে। কুলটা বোনের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নয়। স্পষ্ট করে সমীরকে ডেকে বলতে হবে, যদি বোনকে চাও, তো দাদা বৌদির আশ্রয় তোমায় ছাড়তে হবে। আর যদি সামান্য মর্যাদা-জ্ঞানও থাকে তো সেই সর্বনাশীর সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে ভালোভাবে থাকো, আপত্তি নেই।

প্রমীলা রাজী। খুব ভাল কথা। এতে যদি সমীর সম্মত না থাকে তো মানুষ নাচার। এখানের বাস ওঠাতে হবে। মনে মনে প্রমীলা একবার হিসাব করে নিল। সমীর যদি চলেই যায় তো ভালই হয় এক রকম। যা বাজার। নিচের দুটো ঘরে অন্ততঃ গোটা ত্রিশেক

টাকা তো আসেই। একটু আস্তানার জন্য মানুষ দোরে দোরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সমীর ফিরল প্রায় রাত দশটা। অফিস থেকে বেরিয়ে বুঝি কোন বন্ধুর বাড়ি গিয়েছিল, সেখান থেকে লাইব্রেরী হ'য়ে বাড়ি ফিরছে। খুব ভালো ভালো সব বই এসেছে। খানকোরা। এখনও খাতায় তোলা হয় নি। তোলা হলেই সমীর বৌদির জন্য নিয়ে আসবে।

এসব কথা যেন প্রমীলার কানেই গেল না। ভাতের থালা সামনে ধ'রে দিতে দিতে গম্ভীর গলায় বলল, খাওয়া হ'লে তোমার দাদার সঙ্গে একবার দেখা ক'র ঠাকুরপো। এলে তো রাত কাবার ক'রে, তোমার সঙ্গে দেখা করবে বলে মানুষটা সন্ধ্যা থেকে অপেক্ষা করছে।

আসনে বসতে গিয়েও সমীর দাঁড়িয়ে উঠল, কি ব্যাপার বৌদি, শুনেই আসি না হয়।

প্রমীলা বাধা দিল, তুমি খেয়েই যাও ঠাকুরপো। রাত দুপুর অবধি তোমার ভাত আগলে আমি বসে থাকতে পারব না। তোমার দাদা যখন এতক্ষণ অপেক্ষা করতে পেরেছেন, তখন আরও মিনিট পনেরোও পারবেন।

কথা না বাড়িয়ে সমীর খেতে বসল। কি যে কথা তা আর জানতে সমীরের বাকি নেই। অফিসে বোধ হয় কেউ এসে ধরেছে দাদাকে। কন্যাদায়গ্রস্ত বৃদ্ধ, কিংবা ভগ্নীদায়পীড়িত ভদ্রলোক। দাদার বুদ্ধিকেও বলিহারি। এই তো মাইনের ছিরি। ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলায় না, এর ওপর একটা বাড়তি লোকের আমদানী অমনি করলেই হ'ল। শুধু তো কাব্যকথায় পেট ভরবে না তার, মুখব্যাদান ক'রে যখন বলবে, ম্যয় ভুঁখা হুঁ। তখন?

কিন্তু এমনি জরুরী কথা যে রাত জেগে অপেক্ষা করছে দাদা। কেন, কাল বললেই তো হ'ত। ব্যাপারটা আঁচ করতে সমীরের দেরি

হ'ল না। বোধ হয় বউদির বাপের বাড়ির সম্পর্কিত কারুর কন্যাদায়। নয়তো দাদার এমন ভাবে টনক নড়ে কখনও।

তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ ক'রে সমীর সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠল।

একেবারে কোণের দিকে বেতের চেয়ারে অভয়াপদ পা মুড়ে বসেছিল। হাতে পুরানো পত্রিকা। সিঁড়ির আওয়াজ হতেই পত্রি কাটা টেবিলের ওপর ছুঁড়ে ফেলে মুখ তুলে চাইল।

—আমায় ডেকেছ? সমীর সামনাসামনি গিয়ে দাঁড়াল।

দাদার সঙ্গে বেশি কথা বলার অবকাশই হয় না। সমীর নিচে থাকে, অভয়াপদ ওপরে। এখন দিনও গেছে যেদিন হয়তো দেখাশোনাই হয় নি দুজনে। তা ছাড়া অভয়াপদর সঙ্গে বলার মতন কথা সমীরের কিছুই নেই! যা কিছু কথাবার্তা প্রমীলার মারফৎই হ'য়ে যায়।

—রমার কোন খবর রাখ?

ভারি গলায় আচমকা এমন একটা প্রশ্নে সমীর থতমত খেয়ে গেল। রমা ঘর ছাড়ার পর সোজাসুজি দাদার সঙ্গে এ নিয়ে কোনদিন আলোচনা হয় নি। কমল দাদার দু চোখের বিষ, রমাও এমন কিছু চোখের তারা ছিল না। রমা আর প্রমীলার মধ্যে কোনদিন কোন কিছু নিয়ে খিটিমিটি বাঁধলে অভয়াপদ সব সময়েই রমাকে বকেছে। বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে কথা। চোখে আঁচল চাপা দিয়ে রমাকে ছুটে পালাতে হয়েছে। প্রমীলা-বউদিকে ছাড়া দাদার অস্তিত্বও যেন কল্পনা করা যায় না।

কিন্তু হঠাৎ রমার প্রশ্ন কেন?

—না, মানে, খবর আর কি! সমীর আমতা আমতা করল।

অভয়াপদ চেয়ার ঘুরিয়ে বসল। একটা হাত রাখল টেবিলের ওপর।

—খবর যে রাখো তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি। তার আস্তানায় তুমি মাঝে মাঝে যাও এ-ও জেনেছি।

সমীর দু এক মিনিট ভাবল। কমলের সঙ্গে কি দেখা হয়েছিল দাদার! কিন্তু দেখা হ'লেও দাদা তার সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা বলবে, এমন মনে করার কোন হেতু নেই। আর তা ছাড়া কমলও তো এমন আলগা বেফাঁস কথা বলার ছেলে নয়। পরেই কথাটা সমীরের চট ক'রে মনে পড়ে গেল। অফিসে গিয়েও চিঠিটা খুঁজেছে। ইচ্ছা ছিল রমাকে একটা উত্তর দিয়ে দেবে। সামনের শনিবার অফিস ফেরৎ যাবে রমার ওখানে। কিন্তু রাত কাটানো সম্ভব হবে না। তা হ'লেই হাজার কৈফিয়ৎ দিতে হবে বাড়িতে। বউদির অভ্যাস সমীরের অজানা নয়। রমা থাকতেও দেখেছে। ঘরের সারা জিনিস ওলটপালট করা তার স্বভাব। গোয়েন্দাগিরি করাটা যেন মজ্জাগত। ছেঁড়া চিঠি, কাগজের টুকরো সব হাতড়ে হাতড়ে বেড়ায়। রমার চিঠিটাই হাতে এসেছে। সেখান থেকেই জেনেছে সব কিছু।

লুকোচুরি করতে সমীরের ইচ্ছা হল না। ভালোই লাগল না।

—হ্যাঁ, আমি রমার ওখানে গিয়েছিলাম একদিন। মজা আকন্দপুরে ওরা রয়েছে।

—ওরা? অভয়াপদ চোখ দুটো কুঁচকে ছোট ক'রে ফেলল।

—কমল আর রমা। বিয়ের পর ওখানে গিয়েই বাসা করেছে।

চেয়ারের মড়-মড় শব্দ হ'ল। অভয়াপদ ঠিক হ'য়ে বসল। দুটো হাত হাঁটুর ওপর রেখে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, বিয়ে? বামুনের মেয়ের সঙ্গে কায়েতের ছেলের?

—হ্যাঁ, হয় বই কি। সিভিল ম্যারেজ তো অনবরত হচ্ছে। ওরা এখান থেকে বেরিয়ে গিয়েই বিয়ে করেছে।

—সেখানেই আমার আপত্তি সমীর। এ বংশের মেয়েরা বিয়ের পর বরের সঙ্গে বাইরে যায়, আগে বেরিয়ে তারপর বিয়ে করে না। তাছাড়া আমাদের ঠাকুর্দা নাম করা সংস্কৃত পণ্ডিত ছিলেন। গাঁয়ে তাঁর টোল ছিল। তিনি বিধান দিতেন। তাঁর বংশধর হয়ে এসব অনাচার সহ্য করব না। অসবর্ণ বিয়ে আমরা মানি না। লোকের চোখে ধুলো দেওয়ার কারসাজি, ও বিয়ে অসিদ্ধ।

এসব আলোচনা করতেই সমীরের বিশ্রী লাগছিল। কমলের মতন ছেলে হাজারে একটা মেলে না। অনেক ভাগ্য রমার। অমন একটা পুরুষের সান্নিধ্য পেয়েছে। কিন্তু এসব নিয়ে তর্ক করতেও প্রবৃত্তি হল না। টুলো পণ্ডিত ঠাকুর্দার সাতটি স্ত্রী ছিল। মারা যাবার মাস তিনেক আগেও একটি কুলীনের মেয়ের পাণিপীড়ন করেছিলেন। এখন অবশ্য ঠাকুমাদের কোন খবরই কেউ রাখে না। যুগ পাল্টাচ্ছে। সে দিনের সামাজিক রীতিনীতি আজ অচল। মানুষের মনের ওপর বাধা নিষেধের ভার চাপাতে গেলে ঠকতেই হয়। কোন অন্যায় করেনি রমা। বরং মনে মনে কমলকে ভালবেসে, গুরুজনদের ঠিক করে দেওয়া আর এক পাত্রের গলায় মালা দেওয়াটাই হাস্যকর হ'ত। একজনকে মালা, আর একজনকে মন, এ দ্বিচারিনীত্বের ফল হ'ত সর্বনাশ।

নিজের মনকে সমীর শক্ত করে নিল। অবিচলিত কণ্ঠে বলল, রমার সঙ্গে সম্পর্ক ছাড়া আমার পক্ষে সম্ভব হবে না।

—তা হলে আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক তুলে দিতে হবে ঠাকুরপো। দু-নৌকায় পা দেওয়া তোমার চলবে না।

এর মধ্যে প্রমীলা কখন ওপরে উঠে এসেছে। দরজা আগলে দাঁড়িয়েছে।

সমীর ঘুরে দাঁড়াল। আর বুঝতে কোন অসুবিধা হল না। শুধু

আগুন নয়, বাতাসও জুটেছে। সর্বনাশ ঠেকিয়ে রাখা আর বুঝি সম্ভব নয়।

—বেশ, কাল সকালেই আমি অন্য জায়গায় যাবার বন্দোবস্ত করব। সমীর পাশ কাটিয়ে নিচে যাবার চেষ্টা করল।

—ও বাবা, তবু তুমি অমন অসতী বোনের মায়া কাটাতে পারবে না?

—বৌদি!

সমীরের গলার আওয়াজে মনে হল কাচের জানালাগুলোও যেন থর থর করে কেঁপে উঠল। সমীরের এমন তীব্র কণ্ঠ এর আগে এবাড়ীর কেউ শোনেনি। বোধ হয় সমীর নিজেও নয়। দেয়ালে হেলান দিয়ে সমীর কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। শরীরের সমস্ত রক্তকণিকা যেন শিরার বাঁধন ছিঁড়ে ছড়িয়ে পড়বে চারদিকে। বুকের মধ্যে মোচড় দেওয়া যন্ত্রণা। শরীর একটু ঠিক হ'তেই সমীর আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল।

নিজের ঘরে ফিরে এসে সমীর বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ল। বাড়ি ছেড়ে মেসে চলে যেতে হবে তাতে সমীরের বিন্দুমাত্র দুঃখ নেই, বরং এদের আওতা থেকে, এই বিষাক্ত আবহাওয়া থেকে যত দূরে যেতে পারে ততই ভাল। কিন্তু ওর একমাত্র আফসোস কেন এরা রমাকে স্বীকার করে নিচ্ছে না। প্রমীলা না হয় পরের মেয়ে কিন্তু রমা কি শুধু সমরেরই বোন, অভয়াপদর কেউ নয়! সারা মুখে সত্যিকারের কালি মেখে কত মেয়ে আবার ফিরে আসে নিজের সংসারে। তাদের মুখের ওপর সদর দরজা কে আবার বন্ধ করে দেয়। কে রক্তের সম্পর্ক অস্বীকার করে। সে রকম কিছুই তো রমা করে নি। বলিষ্ঠ এক পুরুষের হাত ধরে আলাদা নীড় রচনা করেছে।

বিছানায় সমীর উঠে বসল। মেসে নয়, যদি সামর্থ্য থাকত, আলাদা একটা বাসাই করতো সমীর। নির্বিবাদে রমা আর কমল আসা যাওয়া করত সেখানে। কিংবা এক সঙ্গেই থাকত তিনজনে। হৈ হল্লা ক'রে দিন কাটাত। রমার সংসারে সমীরও নিজের একটু জায়গা করে নিত।

ভোরে উঠেই রমার মনে পড়ে গেল। আজ শনিবার। অফিস ফেরৎ ছোড়দা আসবে। কিন্তু পাশাপাশি আরো একটা কথা মনে এল। কমলের নাইট-ডিউটি। সাড়ে সাতটা নাগাদ বেরোবে, ফিরতে পরের দিন বেলা আটটা। তার মানে শুধু রমা আর সমীর। কমল থাকলে সারাটা রাত বসে বসে গল্প করত। যত আজগুবি গল্প। বানিয়ে বানিয়ে কমল এমন সব মিথ্যা কথাও বলতে পারে! তবু যদি বেলাবেলি আসে সমীর, কিছুক্ষণ গল্প চলতে পারে। বেলা চারটে থেকে রাত সাতটা পর্যন্ত।

কথাটা কমলেরও মনে ছিল। বাজার যাবার মুখে রমাকে বলল, কি গো, তোমার ভাই কি কি খেতে ভালবাসে বল, কুড়িয়ে বাড়িয়ে আনার চেষ্টা করি।

রমা হাসল, ছোড়দার আবার খাওয়া। গেরস্ত বাড়ির ছেলে, যা দেবে তাই খায়। কিন্তু দূর, তুমিই থাকবে না, আড্ডা জমবে না ভাল করে।

থলিটা হাতে ঝোলাতে ঝোলাতে কমল বলল, কি করব, উপায় নেই যে। অফিসে দুজন ছুটিতে, নয়তো আজকের মতন ঠিক অফিস পালাতাম। আর একদিন না হয় ডবল ডিউটি ক'রে অফিসের পাওনা শোধ করতাম।

এটা যে কমলের মনের কথা, তা রমা ভালই জানে। দুজনে ভারি জমে। কমল আর সমীর। মতান্তরের অভাব নেই, কিন্তু একটি দিনের জন্যও মনান্তর নয়। এলোমেলো তর্কের পরে ঠিক ভাব হয়েছে দুজনের। লড়াইয়ের পরে আপোষে শান্তি।

—ছোড়দাকে তোমার খুব ভালো লাগে, না গো? রমা জানলার কাছে এগিয়ে গেল। চটি জোড়া পায়ে গলাতে গলাতে কমল একবার

রমার মুখের দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে চাইল, তারপর বলল, ভয় পেয়ো না। তোমার চেয়ে বেশী নয়।

—আহা, কথার ছিরি দেখো। কপট বিরক্তিতে রমা মুখ ঘুরিয়ে নিল।

বেলা তিনটে বাজারে সঙ্গে সঙ্গে গা ধুয়ে রমা তৈরী হয়ে নিল।

মতলবটা কমল মন্দ করেনি। বিকালে চা খেয়ে তিনজনে বেড়াতে বেরোবে। মোল্লার দিঘির পাশ দিয়ে রেল লাইন ছাড়িয়ে একেবারে গ্রামের মধ্যে। আর একদিন যেমন গিয়েছিল তার চেয়েও দূরে। কোন মাঠের মাঝখানে কিংবা পুকুরের পাড়ে বসে গল্প। তারপর সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসার আগেই বাড়ী ফিরবে। কমলকে রমা আগেই বারণ করে দিয়েছে। আজেবাজে তর্ক নয়, কেবল মজার গল্প। কমল বলবে, রমা আর সমীর শুনবে মুখ বন্ধ করে। ঠিক আগের দিনের মতন। কিংবা আগের দিনের চেয়েও আরো মধুর। আগে সমীরের সামনে কমল আর রমা বুঝি ঘেঁষাঘেষি বসতে পারত, হাতে হাত রেখে? তখন তো সমীরের চোখ এড়িয়ে বড় জোর চায়ের কাপ দেবার সময় হাতে হাতে ছোঁয়াছুঁয়ি, অথবা সমীরকে লুকিয়ে দুজনে চোখে চোখে চাওয়া। চুরি ক'রে খাওয়া জিনিষের মতন সেদিনের চুরি ক'রে চাওয়াও কম ভালো লাগত না।

সাড়ে চারটা। রান্নাঘর থেকে রমা জানলার কাছে এসে দাঁড়াল। কমল দাড়ি কামাবার আয়োজন করছিল, মুখ তুলে রমার দিকে দেখে বলল, সমীরচন্দ্রের আসা উচিত ছিল এতক্ষণে। অফিস তো ছুটি দুটোয়। সোজা চলে এলে পেঁাছে যাবার কথা। বোধ হয় আমার অফিসে গিয়ে বসে আছে।

—কিন্তু সেখানে গেলেও তো জানতে পারবে তোমার নাইট ডিউটি ?

—তাতো পারা উচিত। কমল কথা বাড়াল না। দাড়ি কামাবার সময় একটু অন্যমনস্ক হ'লেই গালের ছালচামড়া থাকে না। এর আগে রমার সঙ্গে এমনি সময়ে কথা বলতে যাওয়ার ফল হয়েছে রক্তাক্ত পরিণতি। সে কথা রমাও জানে। তাই সেও আর কাছে দাঁড়াল না।

অফিস যাবার মুখে কমল সান্ত্বনা দিয়ে গেল। হয়তো সমীর কোন কাজে আটকে পড়েছে। এ শনিবার না আসে এর পরের শনিবার ঠিক আসবে। ভাবনা করার কিছু নেই।

রমা চুপচাপ বসে শুনল। একটি কথা বলল না। হ্যারিকেন হাতে গেট পর্যন্ত এগিয়ে এল। মেঘ থমথম আকাশ। মাঝে মাঝে বিদ্যুতের ঝলকানি। বৃষ্টি আসার আর দেরী নেই। ভালোয় ভালোয় মানুষটা পোঁছতে পারলে হয় অফিসে। ছাতা একটা সঙ্গে আছে বটে, কিন্তু তেমন বৃষ্টি হ'লে ছাতায় কি আর আটকাবে।

রাস্তায় কিছুটা এগিয়ে কমল ফিরে চাইল। হ্যারিকেন হাতে রমা চুপ করে দাঁড়িয়েছে। পাথরের প্রতিমার মতন। কমল হাত নেড়ে রমাকে ঘরের মধ্যে যেতে ব'লে জোরে জোরে পা চালাল।

ভালমন্দ খাবার ভাগ্যিস রমা তৈরী করে নি। ভেবেছিল সমীর এলে তারপর গরম লুচি তরকারী ক'রে দিলেই চলবে। শুধু সকালবেলা দুধ একটু বেশি নিয়েছিল। ঘন করে জ্বাল দিয়ে ক্ষীরের মতন করবে। ক্ষীর ছোড়দার বড় প্রিয়।

তাড়াতাড়ি খাওয়া দাওয়া সেরে রান্নাঘরের কাজ চুকিয়ে রমা

যখন বাইরের ঘরে এসে দাঁড়াল তখন বেশ জোর হাওয়া উঠেছে। কালো মেঘের টুকরো ছিঁড়ে ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। হাওয়া বাড়লে থমথমে ভাবটা কেটে যাবে। বৃষ্টি নাও আসতে পারে। অবশ্য এখন বৃষ্টি এলেও রমার কোন ক্ষতি নেই। মানুষটা অফিসে পৌঁছে গেছে। দরজা জানলা বন্ধ করে ঠাণ্ডায় বেশ আরাম করে ঘুমোতে পারবে রমা।

কিন্তু সত্যিই কি নিশ্চিন্তে পারবে ঘুমোতে। চোখের পাতা বুজলেই রাজ্যের সব চিন্তা এসে জোটে। উদ্ভট কল্পনার রাশ। ছোড়দার কথা, দাদা-বৌদির কথা, জরাজীর্ণ রোগগ্রস্ত বাপের মৃত্যুনিথর কাঠামো। ক্রমেই সব মানুষ যেন সরে সরে যাচ্ছে। ওর সান্নিধ্য এড়িয়ে। যশোদা আর যশোদার মা, ওর দাদা বৌদি সবাই। ছোড়দাও বুঝি সেই দলে গিয়ে ভিড়ল।

হ্যারিকেনটা মাথার কাছে এনে একটা বই হাতে নিয়ে রমা বিছানায় শুয়ে পড়ল। ওই বই হাতে নেওয়া পর্যন্তই, একটি লাইন পড়তে পারল না। বইয়ের পাতা ছাড়িয়ে মন উধাও। ফেলে আসা জীবনের ছোটখাটো ঘটনাগুলোও সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। খুব ছেলেবেলার কথা। মাকে তো মনেই পড়ে না ভাল করে। ঘষা কাঁচের মধ্য দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখার মতন খুব অস্পষ্ট, ম্লান। এক সময়ে দাদা খুবই ভালোবাসত ওকে। জিনিসপত্র এনে দিত। কিন্তু বিয়ের পর থেকেই কেমন আস্তে আস্তে বদলে গেল। জিনিষপত্র দেওয়া চুলোয় যাক্, হাসিমুখে কথাও বলত না।

হঠাৎ দমকা হাওয়ায় হ্যারিকেন নিভে গেল। দু-একবার দপ দপ ক'রেই সব শেষ। সঙ্গে সঙ্গে কে যেন বাইরে থেকে মুঠো মুঠো অন্ধকার এনে ছড়িয়ে দিল ঘরের ভিতর।

বইটা মুড়ে পাশে রেখে রমা দুটো হাত বুকের ওপর এড়ো করে চুপচাপ শুয়ে রইল।

বাইরে ঝড়ের শব্দ। গাছপালাগুলো আকুলি বিকুলি শুরু করেছে। জানলার পাল্লার ওপর জলের ঘসড়ানি। উঠে জানলা বন্ধ করতেও যেন রমার ক্লান্তি এল।

ভালই হয়েছে। কমলের নাইট ডিউটি, ছোড়দা এলে ঠিক যেন জমত না। কমল না থাকলে শুধু সমীর এলে ভালো লাগত না। এ যেন নুন ছাড়া তরকারী কিংবা সঙ্গত ছাড়া গানের আসর। অদ্ভুত সব উপমা রমার মনে হল। তন্দ্রায় চোখ দুটো জড়িয়ে এল। টুপটাপ বৃষ্টির নূপুর। টিনের চালে রিনিঝিনি আওয়াজ। ঠাণ্ডা ভিজে হাওয়া।

হঠাৎ এক সময়ে রমার ঘুম ভেঙে গেল। খুব জোর বৃষ্টি। ঝড়েরও কমতি নেই। খোলা জানলার পাল্লা আছড়ে আছড়ে পড়ছে। শোঁ। শোঁ। আওয়াজ। কিন্তু এসব ছাড়িয়েও কিসের একটা শব্দ। কে বুঝি কড়া নাড়ছে। ঠক্, ঠক্, ঠক্।

ধড়মড় করে রমা বিছানার ওপর উঠে বসল। স্বপ্ন নয়, সত্যিই কড়া নাড়ার আওয়াজ। কিন্তু এত রাত্রে। কমল কি ফিরে এল? কিংবা ছোড়দা। তা ছাড়া আর কে আসবে। উঠে দাঁড়িয়ে রমা কান পেতে রইল। ঝড় জলের ফাঁকে ফাঁকে একটানা শব্দ। রাত কত! হ্যারিকেনটা উস্কে দিয়ে তাকের ওপর রাখা ঘড়ির দিকে দেখল। বারোটা দশ। এত রাত্রে কে এল আবার।

দরজার পাশে ছোট একটা ফাটল। ইচ্ছে করেই করা হয়েছিল। পিয়নদের চিঠি ফেলার সুবিধার জন্য। গৃহস্থকে বিরক্ত না করেও যাতে চিঠি ঘরের ভিতর ফেলা যায়। সেই ফাটলে রমা চোখ রেখে

দাঁড়াল। বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। এক হাত দূরের কিছুও দেখবার উপায় নেই। বিদ্যুতের ঝিলিকে খুব অস্পষ্ট একটা মানুষের কাঠামো।

—রমা, রমা। ঝড়ের আওয়াজের সঙ্গে ভেসে আসা কাতর কণ্ঠস্বর।

একি, এ যেন ছোড়দার গলা। এত রাত্রে এই ঝড়-বাদলের মধ্যে ছোড়দা এল কোথা থেকে।

গায়ের শাড়ী ভাল করে জড়িয়ে নিয়ে রমা দরজার খিল খুলল।

মানুষটা বুঝি কবাটে হেলান দিয়েই ছিল, দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে ছিটকে ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়াল। উগ্র গন্ধ। নিঃশ্বাস নিতে রমার কষ্ট হ'ল। নাকে আঁচল চাপা দিয়ে রমা সরে এল কয়েক পা।

জামা কাপড় দুই-ই ভিজে। একেবারে সপসপে। উস্কোখুস্কো চুল। হাতের মণিবন্ধে বেলফুলের মালা জড়ানো। লালচে চোখ, পুরু ঠোঁট দুটো স্বল্প আলোতেও চকচক করে উঠল। জামা কাপড়ে কাদার ছোপ। পথে আসতে আসতে দু-একবার পদস্খলন হয়েছে তারই চিহ্ন।

—আপনি? রমা বুঝি সাপের গায়েই পা দিয়েছে।

—বাঁচালে মাইরী, পা যে রকম টলছে, সিঁড়িতে উঠতে গেলে প্রাণে বাঁচতাম না। বাপস্, কি জিনিস, দু' পেগেই এমন বানচাল করে দিল।

ততক্ষণে রমা নিজেকে সামলে নিয়েছে। নীরেনবাবু মদে চুর। জ্ঞান নেই মানুষটার। তা বলে রমা তো আর জ্ঞান হারাতে পারে না। তা হ'লেই সর্বনাশ। গালের চুণকালি ধুতে তা হ'লে গলায় বিষ ঢালতে হবে।

নীরেনবাবু মেঝের টান হয়ে শুয়ে পড়লেন। পায়ের জুতো

ছিটকে রমার বিছানার ওপর। বেলফুলের মালা ছিঁড়ে ফুলের কুঁড়ি ঘরময় ছড়িয়ে গেল। পাশ কাটিয়ে রমা সিঁড়ি দিয়ে তরতর ক'রে ওপরে উঠে গেল। পা টলার ভয়ে নীরেনবাবু যে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে সাহস করেন নি, রমা সেই সিঁড়ি বেয়েই উঠল। তার শুধু দুটো পা-ই নয়, সর্বশরীর কাঁপছে। হৃদ্‌স্পন্দনে বাইরের ঝড়ের ছোঁয়াচ। আন্দাজে পা ফেলে ফেলে রমা দুতলায় গিয়ে পেঁৗছল।

প্রথমে দরজায় ধাক্কা, প্রাণপণ চেঁচাতে শুরু করল, যশোদাদি, যশোদাদি। ঝড়ের শব্দ বার বার ওর কণ্ঠস্বরকে ডুবিয়ে দিল। কিন্তু রমা আরও চড়া গলায় আওয়াজ। কণ্ঠস্বর ডুবে গেলে ও যে নিজেই ডুবে যাবে। একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে। তন্ন তন্ন করে খুঁজেও আর কোথাও পাওয়া যাবে না।

অনেকক্ষণ। রমার মনে হ'ল যেন এক যুগ। সাড়াশব্দ নেই। কেবল ঘুমিয়ে থাকা মানুষের ভারি নিঃশ্বাসের আওয়াজ। আরো জোরে রমা কড়া নাড়ল। দুহাতে। প্রাণপণ শক্তিতে। খাটের ক্যাঁচকোচ শব্দ। কাঠের খড়মের আওয়াজ। কে একজন উঠে দেশলাই জ্বালল। তারপর পায়ের শব্দ দরজার দিকে এগিয়ে এল।

খিল খোলার শব্দ। শিকল নামানোর ঝনৎকার। দরজা খুলে বাড়িওয়ালা নিজে বেরিয়ে এলেন। হাতে কমানো হ্যারিকেন।

—কে, কে ওখানে ?

দরজায় হেলান দিয়ে রমা দাঁড়িয়ে ছিল। অনেক কষ্টে বলল, আমি রমা।

—রমা, কি ব্যাপার এত রাত্রে ?

উত্তর দিতে মুখ তুলেই রমা থেমে গেল। বাড়িওয়ালার পেছনে যশোদার মুখ। খুব স্পষ্ট নয়, কিন্তু তা হ'লেও দেখা গেল আলুথালু

চুলের রাশ, কপালে লেপে যাওয়া সিঁদুরের টিপ। সদ্য ঘুম ভাঙা মাংসল মুখের আভাস।

রমা ঢোঁক গিলল, তারপর আস্তে আস্তে বলল, আপনি দয়া ক'রে একটিবার নিচে আসবেন ?

কমানো হ্যারিকেনের পলতেটা যশোদার বাবা উস্কে দিলেন। পিছন ফিরে মেয়ের দিকে চেয়ে দেখলেন একবার, তারপর সাবধানে সিঁড়ি বেয়ে নামতে আরম্ভ করলেন।

হাওয়ার বেগে কবাট দুটো একেবারে খোলা। জলের ছাঁটে সামনেটা ভিজে। হ্যারিকেন নিবে গিয়েছে কখন। হয় হাওয়ার দাপটে কিংবা বৃষ্টির জলে। রমা যশোদার বাপের হাত থেকে হ্যারিকেনটা নিয়ে উঁচু করে ধরল। জোর বাতি। আর কিছু অস্পষ্ট নয়। ঘরের কোণে কোণে আবছা অন্ধকার কিন্তু রমার বিছানার কোথাও ছিটে ফোঁটা অন্ধকার নেই।

মেঝে থেকে কখন নীরেনবাবু হাতড়ে হাতড়ে বিছানায় গিয়ে শুয়েছেন। শুধু মাথাটাই বালিশে, দেহটা মেঝের লুটোচ্ছে। বুকের ওপর দু একটা বেলফুলের কুঁড়ি। চুলগুলো কপালের ওপর এসে পড়েছে। ঠোঁটের কোণ বেয়ে পানের রস গড়িয়ে পড়ছে, তাজা রক্তের মতন।

—একি, এ এখানে এল কি করে ?

কি করে এল ? সেটাই তো রমা ভাবছে। ওর নাম ধরে ডাকবার সাহস কোথা থেকে হল নীরেনবাবুর। পায়ে পায়ে চৌকাঠ ডিঙিয়ে কি করে ঢুকল ওর সাজান সংসারে।

বার কয়েক থেমে থেমে রমা সব বলল। একটু একটু করে। দরজা খুলে দিয়েই রমা ভয়ে ওপরে দৌড়ে গেছে। মেঝের

পড়েছিল নীরেনবাবু, আস্তে আস্তে কখন রমার বিছানায় গিয়ে উঠেছেন।

—সতীপনার আর অন্ত নেই। বাড়ির লোকের আস্কারা না পেলে বাইরের মানুষ ঢুকতে পারে কখনো! কই আমাদের ঘরে তো কেউ ঢোকে না। খোঁজ করে দেখ বাবা, হয়ত সন্ধ্যা থেকে মজলিশ চলেছে।

কাছে পিঠে কোথাও বাজ পড়লেও বোধ হয় এত চমকে উঠত না রমা। পা টিপে টিপে যশোদা কখন এসে বাপের পিছনে দাঁড়িয়েছে। শুধু ছোবলই নয়, তীব্র বিষ ঢেলে দিয়েছে উজাড় করে। স্বপ্নের ছোট ছোট টুকরোর মতন। একটার সঙ্গে আর একটার মিল নেই। দেয়ালে হেলান দিয়ে রমা সব দেখল। যশোদার বাবা হ্যারিকেন সরিয়ে রেখে বিছানার ওপর ঝুঁকে পড়লেন। প্রথমে হাত ধরে তারপর শরীর ধরে ঝাঁকুনী দিতে আরম্ভ করলেন। বার কয়েক। নীরেনবাবু চোখ খুললেন, জড়ান গলায় বললেন, আঃ, কেন গোলমাল কর মাইরী। নেশা কেটে গেলেই সর্বনাশ। এতগুলো টাকা বরবাদ।

চেঁচিয়ে নয়, ঠোঁট নেড়ে যশোদার বাবা বিড় বিড় করে কি বললেন। বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকে কিছুক্ষণ দাঁড়ালেন, পরে দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে সবলে নীরেনবাবুকে টেনে তুললেন। পরণের পাঞ্জাবীটা ফেঁসে গেল গলার কাছটা। রঙীন রুমাল মেঝেয় লুটিয়ে পড়ল। টেনে হিঁচড়ে নীরেনবাবুকে নিয়ে গেলেন।

টানাটানিতে বোধ হয় নেশার ঘোর ফিকে হয়েই এসে থাকবে। আর আপত্তি করলেন না নীরেনবাবু। এমন কি বেরোবার সময়ে আন্দাজ করে নিজের জুতো জোড়াও পায় দিয়ে এলেন।

হ্যারিকেনের আলো সরে যেতেই আবার নিবিড় অন্ধকার। বাইরে ঝড় বাদল একটু যেন কমে এসেছে, কিন্তু রমার বুকের দাপাদাপির অন্ত নেই। দুহাঁটুর উপর মুখ রেখে রমা চুপ করে বসে

রইল। ভিজে মাটির সোঁদা সোঁদা গন্ধ, পাতায় পাতায় জমে থাকা জল ঝরে পড়ার টুপ টুপ শব্দ, মেঝেয় ছড়ান বেলফুলের সুরভি। বিদ্যুতের আলোতে নিজের বিছানার দিকে চেয়েই রমা আবার শিউরে উঠল। ফর্সা বিছানায় কাদার ছোপ। চাদরটা কুঁকড়ে গিয়েছে। মাথার বালিশ ছিটকে পড়েছে। বুনো জানোয়ার ঘরে ঢুকলেও বোধ হয় সব কিছু এত তছনছ করতে পারত না। সাজানো পরিপাটি সংসার এমন ওলট পালট।

ভোর পাঁচটা। কমল চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। দোকান থেকে এক কাপ চা খেয়ে নিয়ে বাড়ির দিকে রওনা হবে। সিঁড়ির মাঝ বরাবর সমীরের সঙ্গে দেখা। কমলের খোঁজে ওপরে উঠছিল।

—কি ব্যাপার হে এত ভোরে ?

—ভোরে না এলে আর পাচ্ছি কোথায় তোমায় ? আন্দাজে ধরলাম, এ সপ্তাহটা তোমার নিশাচর বৃত্তি। কাল থেকেই বোধ শুরু হয়েছে, না ?

কমল ঘাড় নাড়ল। তা না হয় হ'ল, কিন্তু সেদিন রমার চিঠি পেয়েও যে গেল না সমীর ?

সমীর মুচকি হাসল। বলল, বাড়ি চলো না, যেতে যেতেই সব শুনবে।

বাসে পাশাপাশি ব'সে কমল সব শুনল। সমীর আর দাদার কাছে নেই। খিটিমিটি বাধার পরের দিন ভোরেই মেসের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছিল। আস্তানা ঠিক ক'রে বাড়ী ফিরেছিল প্রায় বারোটা। দুটোর মধ্যে ঠেলাগাড়ী ডেকে জিনিসপত্র গুছিয়ে বাড়ী ছেড়েছিল। কাল সারাটা দিন ঘরদোর গুছিয়েছে। নিজের সামান্য গৃহস্থালী। সেজন্যও বটে, তা ছাড়া মন খিঁচড়ে ছিল তাই মজা আকন্দপুরে যাওয়া হ'য়ে ওঠে নি ! কিন্তু কাল সারাটা রাত সমীর চোখ বুজোতে পারে নি। কেবল রমার কথা মনে পড়েছে। অভিমানিনী বোন, একটুতেই ঠোঁট ফোলাত ছেলেবেলায়। যত মান অভিমান, আদর আবদার ছোড়দার কাছে। বিশেষ ক'রে দাদার বিয়ের পর থেকে। তাই সমীর ভোর রাতে কমলের অফিসে হাজির। একসঙ্গে মজা আকন্দপুরে যাবে। রবিবার। কোন অসুবিধা নেই।

মোল্লার দিঘি পর্যন্ত মন্দ নয়, তারপরই কাঁচা শড়ক সুরু। কাল রাত্রের একটানা বৃষ্টিতে জায়গায় জায়গায় জল দাঁড়িয়েছে। গরুর গাড়ীর চাকার দাগে এবড়ো খেবড়ো গর্ত। চাপ চাপ কাদা। ধুতি সামলে দুজনেই সাবধানে পা ফেলল। জুতো জোড়া হাতে তুলে নিতে পারলেই যেন ভাল হ'ত, কিন্তু লজ্জায় সেটা আর পারল না। লাগুক কাদার ছিটে, বাড়ী গিয়ে পরিষ্কার ক'রে নিলেই চলবে।

গেট পার হ'য়ে চৌকাঠের কাছে এসেই দুজনে থমকে দাঁড়াল।

দরজা খোলা। বৃষ্টির ছাঁটে মেঝের অনেকখানি ভিজে। জল থই থই করছে। ঠিক জলের ওপর রমা উপুড় হ'য়ে পড়ে রয়েছে। খোঁপা ভেঙে সারা পিঠে চুল ছড়িয়ে পড়েছে। পায়ের আলতার দাগ জলে ধুয়ে একাকার।

—রমা, রমা, কমল চীৎকার ক'রে এগিয়ে গেল। নিচু হ'য়ে রমার গায়ে হাত ঠেকিয়েই দাঁড়িয়ে পড়ল। সমীরের দিকে চেয়ে বলল, সর্বনাশ, গা যে পুড়ে যাচ্ছে।

সমীর আর কমল সাবধানে ধরাধরি ক'রে রমাকে বিছানায় শুইয়ে দিল। মোটা কম্বল চাপা দিল বুক পর্যন্ত। গামছা দিয়ে রমার মাথার চুল মুছিয়ে দিতে দিতে কমল বলল, দেখো তো ভাই সমীর, রান্নাঘরে বোধ হয় চায়ের দুধ ঢাকা দেওয়া আছে, স্টোভ জ্বালিয়ে একটু গরম ক'রে আন। দরজা হাট করা খোলা, রমা এ ভাবে প'ড়ে, কিছুই তো বুঝতে পারছি না।

সমীর রান্নাঘরে ঢুকে গেল। ব্যাপারটা আগাগোড়া তারও কিছু মাথায় ঢুকছে না। জরজারি রমার সাতজন্মে হয় না। কিন্তু সেজন্য নয়, এমন ভাবে একটা মানুষ সারাটা রাত জলের ওপর প'ড়ে থাকবে, ফিরে দেখবার কেউ নেই।

—উঃ, খুব জোর নিঃশ্বাসের শব্দ। বুক কাঁপিয়ে।

কমল ঝুঁকে পড়ল রমার মুখের ওপর। চাপা গলায় ডাকল,— রমা, রমা।

প্রথমে ভুরু দুটো আস্তে কেঁপে উঠল, তারপর একটু একটু ক'রে রমা চোখ খুলল। একদৃষ্টে দেখল কমলের দিকে চেয়ে। ঠোঁট দুটো নড়ে উঠল। কি বুঝি বলতে চায়। কিন্তু বুজে এল চোখের পাতা। দীর্ঘ নিঃশ্বাসের শব্দ।

কমল আলতো হাত বোলাল চুলের ওপর। কপাল টিপে দিল সন্তর্পণে।

হঠাৎ দরজায় ঠুক ঠুক শব্দ। কমল সমীরের দিকে চেয়ে ইসারা করতেই সমীর উঠে দাঁড়াল। এ সময়ে কে আবার বাইরের লোক এসে জুটল। দরজা খুলেই থেমে গেল। প্রৌঢ় একটি ভদ্রলোক।

—কমলবাবু আছেন ? ভদ্রলোক ব্যস্ত গলায় বললেন।

সমীর একটু ইতস্ততঃ করল। কমলের সঙ্গে দেখা হবার সুবিধা হবে না। রমাকে ছেড়ে কমলের ওঠবার দরকার নেই।

—কমল একটু ব্যস্ত রয়েছে। আপনার কি দরকার আমাকেই বলতে পারেন।

প্রৌঢ় লোকটি সমীরের আপাদমস্তক দেখলেন। কি মনে করলেন, কে জানে। তারপর আমতা আমতা ক'রে বললেন, তাঁর সঙ্গেই একটু দরকার ছিল। বেশী নয়, মিনিট দুয়েক।

কথাগুলি কমলেরও কানে গিয়েছিল। রমার গায়ে কম্বলটা ভাল ক'রে চাপা দিয়ে উঠে এসে দাঁড়াল। কথাবার্তা শুনেই চিনতে পেরেছিল মানুষটাকে। বাড়ীওয়ালা।

—বড় বিপদে পড়েছি, কমল নিচুগলায় বললো, ভোরে ফিরে দেখি দরজা হাট ক'রে খোলা, রমা মেঝেয় পড়ে আছে জলের ওপর। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে।

এত সব কথা বাড়ীওয়ালার যেন কানেও গেল না। ইসারা ক'রে কমলকে ডাকলেন, একটু এদিকে আসুন, জরুরী কথা আছে।

এদিকে মানে বাগানের এক কোণে। বাড়ীওয়ালা সব ভেঙে বললেন। কথার ফাঁকে ফাঁকে নিজের কপাল চাপড়ালেন। কি বরাতই করে এসেছিলেন, এ বয়সেও এত কষ্ট। শেষদিকে একেবারে কমলের দুটো হাত জাপটে ধরলেন। সকলের হ'য়ে তিনি ক্ষমা চাইছেন। কমল যেন কিছু মনে না ক'রে।

মাথার ব্রহ্মতালু পর্যন্ত জ্বলে উঠল। বহুকষ্টে কমল নিজেকে সংযত করল। মানুষ নামের অযোগ্য। জানোয়ারও বুঝি এত হীন হ'তে পারে না। এমন এক পরিবেশে কোন সাহসে কমল রমাকে একলা রেখে গেছে। কিন্তু বোঝাল নিজেকে; বাড়ীওয়ালার মুখের দিকে চেয়ে নিজেকে সান্ত্বনা দিল।

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, ছি, ছি, বয়োজ্যেষ্ঠ আপনি, ক্ষমা চেয়ে আমায় লজ্জা দেবেন না। আপনি আরও বড় সর্বনাশের হাত থেকে আমাদের বাঁচিয়েছেন।

কমলের কাছ থেকে সব শুনে সমীর কিন্তু বেঁকে বসল। না, এমন জায়গায় রমা কমলের থাকা চলে না। মাতাল লম্পটকে বিশ্বাস আছে! নেশার ঘোরে কোনদিন কি ক'রে বসে ঠিক কি! তার চেয়ে অন্য কোথাও আস্তানা বাঁধাই ভাল।

রমা আবার চোখ মেলল ঘণ্টা দুয়েক পর। এদিক ওদিক দেখল। নজর বোলাল মানুষগুলোর মুখের ওপর, তারপর সমীরকে চিনতে পেরে মুচকি হাসল। সমীর কাছেই বসেছিল, আরো এগিয়ে এল রমার দিকে। হাত দিয়ে রমার একটা হাত চেপে ধরে বললে, বেশ মেয়ে, চিঠিতে আমায় আসতে বলে নিজে অসুখ বাধিয়ে ব'সে আছো?

চিঠি! ছোড়দাকে আসতে বলার জন্য! একটু একটু ক'রে রমার মনে প'ড়ে গেল। রাত্রের ছেঁড়া ছেঁড়া ঘটনার টুকরো। সমস্ত শরীর কেঁপে উঠল। তারপর পাশে বসা কমলের কোলের উপর মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে কমল বোঝাল। সব ঠিক হয়ে গেছে। কোন ভয় নেই। এ বাড়ী ছেড়ে অন্য কোথাও চ'লে যাব। তা ছাড়া বাড়ীওয়ালা তাঁর তরফ থেকে ক্ষমাও চেয়ে গেছেন সকালবেলা।

রমা কি বুঝল কে জানে। পাশ ফিরে চোখ বুজিয়ে রইল।

কালোতারা ফার্মেসী। ডাক্তার নবজীবন ভৌমিক। জাঁদরেল চেহারা। মজা আকন্দপুরে খুব পসার! আশে পাশের গাঁ থেকে ডাক আসে। গরীবদের কাছে ধন্বন্তরী। রমাকে অনেকক্ষণ ধ'রে দেখলেন। বুকে পিঠে যন্ত্র লাগিয়ে। চোখের পাতা উলটিয়ে, জিভের তলায় থার্মোমিটার দিয়ে।

কমলের এগিয়ে দেওয়া কাগজে ওষুধের নাম লিখতে লিখতে অভয় দিলেন। কমলের দিকে চেয়ে বললেন, ভয়ের কিছু নেই। হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে গিয়েছে। কদিন একটু সাবধানে থাকলেই ঠিক হ'য়ে যাবে।

বিছানায় শুয়ে শুয়েই রমা দেখল। সমীর আর কমল রান্নার তোড়-জোড় শুরু করেছে। আসল রান্নার চেয়ে রান্নার ঘটাই বিরাট। এক সময়ে ক্লান্তিতে চোখের দুটো পাতা বুজে এলো।

দিন দুয়েক। তারপর ঝেড়েঝুড়ে রমা উঠে পড়ল। জড়তা শরীরের নয়, মনের। কিন্তু সে ধাক্কাও রমা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করল। ভুল বোঝাবুঝি তো হয় নি, অন্ততঃ কমল জেনেছে আসল ব্যাপারটা। যশোদা আর তার মার বাঁকা বাঁকা কথায় আর ভয় করে না রমা।

সেদিন সন্ধ্যার ঝোঁকে তুমুল কোলাহল। কমল নেই। আবার রমা একা। এবার শুধু যশোদা আর তার মা-ই নয়, যশোদার বাপের গলাও শোনা যাচ্ছে। সব কথা স্পষ্ট নয়, কিন্তু এটুকু বোঝা গেল, যা কিছু গোলমাল নীরেনবাবুকে নিয়েই। একটু পরেই সিঁড়িতে ভারী জুতার আওয়াজ। পা ঠুকে ঠুকে কে যেন নেমে আসছে। এবার যশোদার চীৎকার নয়, কান্নার শব্দ। হ্যারিকেন কমিয়ে রমা চুপি চুপি জানালার ধারে এসে দাঁড়াল।

এক হাতে গোটান বিছানা, অন্য হাতে ছোট সুটকেশ নীরেনবাবু বাগানের মধ্যে এসে দাঁড়ালেন। পিছন পিছন যশোদা। মনে হ'ল নীরেনবাবু বোধ হয় বাড়ী ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, আর বাধা দিচ্ছে যশোদা।

—মনে করেন কি তোমার বাবা, নীরেনবাবু ঘুরে দাঁড়ালেন, দুবেলা দু মুঠো খেতে দেন ব'লে মাথা কিনে নিয়েছেন? রাস্তার কুকুর নই আমি। আমার ইজ্জৎ আছে। কপালের ওপর এসে পড়া চুলের গোছা হাত দিয়ে ঠিক করে নিলেন। জড়ান কথা। পা দুটো টলছে একটু।

—ওগো পায়ে পড়ি তোমার, আমায় সঙ্গে নিয়ে চল। গাছের তলায় থাকতে হয়, তাতেও আমি রাজী, আমায় ফেলে যেও না।

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল যশোদা চোখে আঁচল চাপা দিয়ে। এক সময়ে নীরেনবাবুর দুটো পা জড়িয়ে বসে পড়ল।

—মাইরী আর কি, টান দিয়ে নীরেনবাবু পা ছাড়িয়ে নিলেন, নিজে পড়ে থাকব স্টেজের এক পাশে, তোমায় গাঁটছড়া বেঁধে নিয়ে যাব বৈকি সেখানে। তোমার অভাব কি, অমন নবাব বাপ রয়েছে। নেই নেই করেও বেশ আছে টাকাকড়ি। ঢের নাগর জুটে যাবে তোমার।

নীরেনবাবু বাগান ছেড়ে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ালেন। আবছা অন্ধকারে মানুষটাকে আর দেখা গেল না। দু এক মিনিট। আঁচলটা বুকে চেপে যশোদা চুপচাপ দাঁড়াল। পাথরের মূর্তির মতন। তারপর ফিরে এসে একতলার চাতালে বসে পড়ল। সুর তুলে কাঁদতে শুরু করল। ওর এই সর্বনাশের মূলে কোন নষ্টচরিত্র হতভাগী তার উল্লেখ করল। কুলখাকী মেয়ের ফাঁদে পা দিয়েই আজ এই অবস্থা। সাজান ঘর ফেলে মানুষটাকে পথে পা দিতে হ'ল।

শুধু চীৎকার ক'রে কান্নাই নয়, যশোদা সিমেন্টের মেঝেয় মাথা খুঁড়তে শুরু করল। ঠক্ ঠক্ ঠক।

মেঝেয় নয়, প্রতিটি আঘাত যেন রমার বুকে এসে লাগল। ভগবান জানেন রমা নির্দোষ। এক ফোটা কাল দাগ কোথাও পড়ে নি। সে রাত্রের সমস্ত ঘটনা মনে পড়ল। আদিম রিপুটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল নীরেনবাবুর মধ্যে, রমা শুধু আত্মরক্ষা করেছিল। দশ কান করতে চায় নি, চীৎকার ক'রে লোক জড়ও নয়, যেটুকু করেছে, সেটুকু না করলে আজ দাঁড়াবার ঠাঁইটুকুও রমার থাকত না।

কিন্তু তবু এই ইনিয়ে বিনিয়ে কান্নার সুরে মনটা চঞ্চল ক'রে তোলে। অপরাধী মনে হয় নিজেকে। হঠাৎ আর একজনের গলার স্বরে রমা চমকে উঠল। সিঁড়ির কাছে কখন যশোদার মা এসে

দাঁড়িয়েছেন, তুই কাঁদিস নি যশী, উঠে আয়। আমি বলছি ভগবান আছেন। যে সর্বনাশী নিজের কুল মজিয়ে এমন ক'রে পরের ঘর ভাঙে, তার বিচার তিনিই করবেন। তে রাত কাটবে না, তুই দেখিস। ঢং করে পরা সিঁথির সিঁদুর আর হাতের নোয়া দুই-ই যাবে। এখনও চন্দ্রসূর্য উঠছে, দিনরাত হচ্ছে, এর প্রতিকার হবেই, হবেই, হবেই।

দু হাতে কান চাপা দিয়েও কথাগুলো রমা এড়াতে পারল না। হাজারটা সূঁচ বুকে, পিঠে, সর্বাঙ্গে। অসহ্য যন্ত্রণা। রমা বুঝি পাগলই হ'য়ে যাবে। একবার মনে হ'ল ছুটে বাইরে গিয়ে দাঁড়াবে ওদের সামনে। মুখোমুখি। কিন্তু তারপর! কি হবে তাতে। ওদের ছুঁড়ে দেওয়া কাদার ছিটেয় সারা শরীর ভরে যাবে। রাস্তার ওপর চীৎকার শুনে জড় হওয়া লোকদের হাসির খোরাক হবে। এই তো!

খুব আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে রমা বিছানায় এসে বসল। বালিশটা বুকে চেপে উপুড় হয়ে পড়ল। তারপর কান্না। যশোদার মতন সশব্দে নয়, নীরবে। কিন্তু তাতেই নিজের দুটো গালই নয়, বালিশটাও ভিজে উঠল। বিছানার কিছুটাও।

কমল ফিরতেই রমা ছুটে গিয়ে তার বুকে মাথা রাখল। সারারাত চোখ বুজতে পারে নি। একটু তন্দ্রা আসতেই কান্নার আওয়াজে ঘোর কেটে গেছে। মা মেয়ের কান্না, মাঝে মাঝে কর্তার ধমকানি।

রমার মুখটা তুলে ধরে কমল হাসল, কি ব্যাপার? ধৃতরাষ্ট্রের জন্য গান্ধারী চোখ বেঁধে রেখেছিলেন, স্বামীর জন্য তুমিও নাইট ডিউটি শুরু করলে নাকি? দেখো তো আয়নায় চোখমুখের কি চেহারা হয়েছে!

চোখ মুখের চেহারা? মনের চেহারা যে দেখাবার উপায় নেই, নইলে দেখতে পেত কমল অসংখ্য কালশিটে পড়ে কি অবস্থা হয়েছে! এ বাড়িতে আর একটা রাত কাটাতে হ'লে বোধ হয় দম বন্ধ হয়ে রমা মারা যাবে।

কমল অনেকক্ষণ চেয়ে চেয়ে দেখল। সত্যি মায়া হ'ল। পারিবারিক পরিবেশের নিভৃত কোণ থেকে এ চন্দ্রমল্লিকা চয়ন করে এনে কমল তাকে বাইরের ধুলোকাদার মধ্যে ফেলেছে। নোংরা পৃথিবীর স্পর্শে বারবার কুঁকড়ে যাচ্ছে পাঁপড়ি, নখের আঘাতে ছিন্ন ভিন্ন হচ্ছে। কিন্তু অটুট রয়েছে এর সুরভি। অন্তরের বর্ণ একটুও ম্লান হয় নি।

—এ এক রকম ভালই হ'ল, কমল রমার হাত দুটো নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বলল, সমীরের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। তার ইচ্ছা তিনজনে একসঙ্গে থাকি। কোথায় বুঝি বাড়িও একটা দেখে এসেছে। শহরে নয়, শহরতলীতে।

সত্যি! আনন্দে রমার কথা আটকে গেল। কমল, রমা আর সমীর। এ যে কল্পনারও অতীত। রাজী আবার নয়। খুব রাজী রমা। শহরে হোক, শহরতলীতে হোক, নরকে হ'লেও বুঝি রমার আপত্তি নেই। শুধু এই আবহাওয়া থেকে রমা সরে যেতে চায়। এই সুর তুলে কান্নার আবর্ত থেকে অনেক, অনেক দূর।

করিৎকর্মা ছেলে সমীর। ছোটখাট একটা আস্তানা সত্যিই জোগাড় করে ফেলল। মজা আকন্দপুর থেকে মাইল তিনেক শহরের দিকে। মজা আকন্দপুরের চেয়ে অনেক জমজমাট। বিদ্যুৎবাতি আছে; ছোট গোছের সিনেমা 'চিত্রশ্রী,' তাছাড়া গোটা তিনেক স্কুল হাট বাজার সব কিছু। নাম চন্দনপুর। বন্ধুর জন্য মেয়ে দেখতে এসে সমীর, মেয়ে নয়, জায়গাটা পছন্দ ক'রে গিয়েছে। একলা মানুষ ব'লে আর এতকাল গা করে নি। শহরের মেসের ছোট্ট তক্তপোষই যথেষ্ট ছিল, কিন্তু বোন ভগ্নিপতি যদি সঙ্গে থাকে তো চন্দনপুরেই বাসা করবে। করলও শেষ পর্যন্ত।

বাড়িওয়ালার হাতে ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে চলে আসতেই ভদ্রলোক ফ্যালফ্যাল করে কমলের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে রইলেন।

কমলই কথা বলল, কিছু বলবেন?

—বলব? কি বলব বলুন তো—আমার বলবার কোন মুখ তো হতভাগা রেখে যায় নি।

—ছি ছি, কেন আপনি ও সব কথা ভাবছেন? সে সব ভুলে যান। তাছাড়া আপনি তো তাঁকে লঘু পাপে গুরুদণ্ড দিয়েছেন।

বাড়িওয়ালা কিছুক্ষণ কোন কথা বললেন না। এক সময়ে মাথা নিচু করে কেবল বললেন, আপনি শুধু বৌমাকে ক্ষমা করতে বলবেন। ওঁর চোখের জল পড়লে আমার ভিটে মাটি সব উচ্ছন্ন যাবে। যশোদার বরাত এমনিতেই মন্দ, তার ওপর ওঁর অভিশাপ লাগলে সব ছাই হয়ে যাবে।

কমল এবারে বাড়িওয়ালার একটা হাত আঁকড়ে ধরল, ছি ছি, ওসব কথা বলবেন না। ওতে আমাদের অপরাধী করা হয়। আপনি

বিশ্বাস করুন, আমরা সবাই ভাল মনে যাচ্ছি। আপনার জামাইকে আবার ডেকে আনুন।

চাবির গোছা হাতে ক'রে বাড়িওয়ালা বাগানের মধ্যে নামলেন। একটি কথাও নয়। জোরে জোরে পা ফেলে বেড়ার ধারে গিয়ে দাঁড়ালেন।

গোলমাল বাঁধাল সুখী। হাউ মাউ করে কাঁদতে শুরু করল। রমা গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে শান্ত করতে পারল না। বুড়ো মামা না থাকলে সুখী ঠিক বৌদিদের পিছন পিছন চন্দনপুরে গিয়ে উঠত। এক তিল থাকত না এ পোড়া গাঁয়ে।

এক সময়ে ঘোড়ার গাড়ি এসে দাঁড়াল। প্রথম যেদিন এসেছিল ঠিক সে দিনের মতই। গাড়োয়ান আর কমল ধরাধরি করে জিনিষপত্র গাড়ির মাথায় তুলল। সাহায্য করল সুখী।

গাড়িতে ওঠবার মুখে একবার পিছন ফিরে চাইল। এক জায়গায় কিছুক্ষণের জন্য বসলেই মায়া পড়ে যায়। ঠাঁইনাড়া হতে গেলেই কষ্ট হয়। তার ওপর বাড়ি ছেড়ে প্রথম এসে উঠেছিল এখানে। ওপর দিকে চাইতেই জানলার খড়খড়ি বন্ধ হয়ে গেল। কে বুঝি দেখছিল লুকিয়ে! হয়ত যশোদা কিম্বা তার মা। অদ্ভুত মানুষ বাড়িওয়ালা। বাইরের খোলস দেখে বোঝাই যায় না ভিতরে এমন একটা শক্ত মানুষ রয়েছে। কর্তব্যে অবিচল। কমলের ডাকে রমার চমক ভাঙল।

ইদানীং প্রমীলা একেবারেই উঠা নামা করতে পারে না। একটুতেই হাঁফ লাগে। সর্বদাই কেমন বমি বমি ভাব। দেয়াল ধরে নিজেকে সামলায়।

অভয়াপদ আত্মীয় স্বজনের মধ্যে দু একজনকে আনার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সংসার ছেড়ে লোকের পক্ষে আসাও মুস্কিল। এলেও একদিন দুদিনের বেশি থাকতে চায় না। দিন কয়েক উড়ে ঠাকুর রেখেছে একটা। ফলে অর্ধেকের বেশি দিন অভয়াপদকে আধপেটা খেয়েই অফিস ছুটতে হচ্ছে। তা ছাড়া হঠাৎ আপদ বিপদে বাড়িতে একটা বাড়তি লোক থাকলে বুকে বল আসে। সমীর একটা মস্ত বড় সহায় ছিল অভয়াপদর। মানুষ জনের আপদে বুক দিয়ে পড়তো। কিন্তু সে সব ভেবে আর লাভই বা কি!

টাই বাঁধতে বাঁধতে অভয়াপদ স্ত্রীর দিকে একবার ফিরে চাইল। প্রমীলা বিছানায় শুয়ে আছে কাত হয়ে। অল্পদিনেই চেহারা ভেঙে পড়েছে। ফ্যাকাসে গায়ের রঙ, কাগজের মত সাদা ঠোঁট, নিষ্প্রভ চোখের তারা। এ অবস্থায় গায়ে এক বিন্দু রক্ত না থাকা কি রকম মারাত্মক সে কথা আভাসে বুঝিয়ে গেছেন ডাক্তার সেন। স্টেথোস্কোপ দিয়ে অনেকক্ষণ ধ'রে পরীক্ষা ক'রে এক গাদা ওষুধের নাম লিখে গেছেন। কিন্তু তাতেই বা কাজ হচ্ছে কোথায়। গায়ে রক্ত হওয়া দূরে থাক, যেটুকু অবশিষ্ট ছিল, সেটুকুও যেন কে শুষে নিংড়ে নিচ্ছে।

—আজ কেমন বোধ হচ্ছে শরীর? অভয়াপদর নজর টাইয়ের ফাঁসের দিকে। প্রমীলা ম্লান হাসল। শুকনো গলায় বলল, ভাল।

—এখনও মাসখানেক, কি বল? অভয়াপদ কোট পরতে পরতে বলল।

—যাও, অসভ্য কোথাকার, দুহাতে মুখ ঢেকে প্রমীলা উপুড় হয়ে শুল।

কোট পরা শেষ। অভয়াপদ ঝুঁকে আয়নায় নিজের চেহারাটা একবার দেখে নিল। তারপর বলল, আজকাল অলিতে গলিতে নার্সিংহোম হয়েছে। সময় হ'লে তেমন একটা নার্সিংহোমে ভর্তি ক'রে দিলেই বোধ হয় ভাল হবে।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল, কিন্তু প্রমীলার তরফ থেকে কোন উত্তর নেই। কেবল দুটো হাতের ওপর মুখ রেখে অভয়াপদর দিকে চেয়ে রইল।

—ডাক্তার সেনকে জিজ্ঞাসা করতে হবে। তিনি যা বলবেন, তাই হবে।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে অভয়াপদ পিছন ফিরে দেখল। কিন্তু না, প্রমীলা জানলা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে রয়েছে। কি দেখছে, কে জানে! আজকাল সব সময় কেমন অন্যমনস্ক ভাব। কথা বলতে বলতে উদাস হয়ে যায়। এই সময়ে নাকি এমন হয়। চট করে রাগ, আবার অনুরাগও সঙ্গে সঙ্গে। এই সময় ধারে-কাছে একটা লোক থাকা ভাল। কখন কি দরকার হয়, বলা যায়। মনে মনে অভয়াপদ ঠিক করল। অফিস-ফেরৎ একবার শ্বশুরবাড়ি যাবে। শ্বাশুড়ী না আসতে পারেন, অন্ততঃ এই সময়টা প্রমীলাকেই তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেবে। বলেওছে অনেকবার, কিন্তু প্রমীলা রাজী হয় নি। বাপের বাড়ি নয়, শ্বশুরবাড়িতেই থাকবে। নয়তো অভয়াপদর কে দেখাশোনা করবে। যারা মুখ চাইবার তারা দুজনেই তো সরে পড়ল। একজন রাতের অন্ধকারে আর একজন প্রকাশ্য দিনের আলোয়। এই সময় সমীর থাকলে ভারি উপকারে লাগত। ডাক্তারের বাড়ি যাওয়া, ওষুধ আনা, দরকার হ'লে বৌদিকে নিয়ে হাসপাতালে যাওয়া, সব

কিছু। সংসারের কোন কিছু কোনদিনই অভয়াপদকে দেখতে হয় নি।

সদর দরজা বন্ধ হবার শব্দ হ'তেই প্রমীলা উঠে পড়ল। খুব আস্তে। হঠাৎ উঠলেই মাথাটা ঘুরে ওঠে। চাপ চাপ অন্ধকার চোখের সামনে। কানের পাশে অশ্রান্ত আওয়াজ।

উঠে সিঁড়ির মুখে গিয়ে ঠাকুরকে ডাকল, তারপর বলল ওপরে ভাত দিয়ে যেতে।

আজকাল প্রমীলা নিচে আর বিশেষ নামেই না। বিছানার পাশে টেবিল টেনে নিয়ে খেতে শুরু ক'রে! হাত মুখ ধোয়াও বারান্দায় রাখা বালতির জলে।

রমা চলে গিয়ে প্রমীলার খুব অসুবিধা হয় নি। কিন্তু সমীর না থাকাতে একটি বইও পড়তে পারছে না। আগে সপ্তাহে গোটা দুয়েক আনকোরা গল্পের বই আসত, আজকাল সারা মাসে একটিও না। আশে-পাশের ছেলেদের ধ'রে বই আনার চেষ্টা করে প্রমীলা, কিন্তু সব সময় তাদের তো পাওয়া যায় না হাতের কাছে। তা ছাড়া প্রমীলার পছন্দ সমীর যেমন জানত তেমন আর কেউ নয়। বাছা বাছা গোয়েন্দা কাহিনী, প্রেমোপাখ্যান সমীর ঠিক জুটিয়ে আনত।

বাপের বাড়ি যেতে প্রমীলার একটুও ইচ্ছা করে না। পয়সাকড়ি হয়ত আছে, কিন্তু এসব বিষয়ে সেই মান্ধাতার আমলের অলকা মজুমদার সম্বল। থলথলে গায়ের চামড়া, দুচোখে ছানি পড়ার যোগাড়, অথচ প্রসব করাতে ঠিক নিয়ে আসবে তাকে। কোন ওজর আপত্তি শুনবে না। অগাধ বিশ্বাস তার ওপর। কিন্তু প্রমীলার ভারি ভয়। আজকাল কেমন হালফ্যাসানের সব নার্সিংহোম হয়েছে।

ঝকঝকে তকতকে পরিষ্কার। ডাক্তার সেনের নিজেরই আছে, মেট্রোপলিটন নার্সিংহোম। এখানে থাকলে সেখানেই ভর্তি হবে।

সেদিনের খবরের কাগজটা নিয়ে প্রমীলা কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করল। ভাল লাগল না। উঠে বসে ওষুধ খেল শিশি থেকে। কি ঝাঁজ আর কি বিশ্রী গন্ধ। খাবার সময় যেন কান্না পায় প্রমীলার। লবঙ্গ চিবিয়ে তবে ধাতস্থ হয়।

ঘুমোবার উপায় নেই। দুচোখ বুজলেই এলোমেলো স্বপ্ন। শিউরে জেগে ওঠে। কাল কাল লোমশ হাত এগিয়ে এসে ওর গলা টিপে ধরছে। নিঃশ্বাস সত্যিই বন্ধ হয়ে আসে। সারা কপাল ঘামে ভিজে ওঠে। বুকের মধ্যে দ্রুত স্পন্দন। জেগে ওঠে প্রমীলা কিন্তু দুঃস্বপ্নের ঘোর কাটিয়ে উঠতে পারে না।

ডাক্তার সেন বলছেন, নার্ভ দুর্বল। কিছু মনের ব্যাপারও রয়েছে। চেষ্টা ক'রে এ ভাব কাটিয়ে উঠতে হবে। নয়তো সন্তানের পক্ষে ক্ষতিকর হ'তে পারে। এমন অবস্থায় মায়ের মানসিক অবস্থা সন্তানের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। কিন্তু কি ক'রে এ ঝোঁক প্রমীলা কাটিয়ে উঠবে! দুর্বল শরীর। মনে জোর আনার শক্তিটুকুও বুঝি নিঃশেষিত। বাপের বাড়ি থেকে মা কোথাকার মাদুলী পাঠিয়েছেন; অন্য সময় প্রমীলা কি করত বলা যায় না, কিন্তু এখন সযত্নে হাতে বেঁধেছে! মাঝে মাঝে কালীর পটের কাছে মাথা নোয়ায়। বিপদ কাটিয়ে দাও ঠাকুর। হৃষ্টপুষ্ট এক সন্তান দুজনেরই অনেকদিনের কামনা। সুপ্রসব হোক। সন্তানকে কোলে ক'রে প্রমীলা যেন ভালোয় ভালোয় ঘরে ফিরে আসতে পারে।

প্রায় পাঁচটা নাগাদ অভয়াপদ উঠি উঠি করছে এমন সময় টেলিফোন। টেলিফোন পেয়েই অভয়াপদর মাথা ঘুরে উঠল, সর্বনাশ। ফোন করছে পাশের বাড়ির বলাই। মোড়ের দোকান থেকে!

প্রমীলা অজ্ঞান হয়ে গেছে। বাথরুমে বুঝি পিছলে পড়েছে কি ভাবে। তাদের ঠাকুরের মুখে খবর পেয়ে বলাই ফোন করছে।

অবশ্য বন্দোবস্ত করাই ছিল। কিছু একটা হ'লে পাশের বাড়ীর বলাইকে খবর দিতে। ঠিক সময়ে যাতে অভয়াপদ খবরটা পায়। প্রমীলার হঠাৎ ব্যথা উঠলে কিম্বা শরীর খারাপ বোধ হ'লে। কিন্তু এ কি বিপত্তি! শরীরের এই অবস্থায় প'ড়ে যাওয়া মানে তো সর্বনাশ। বাঁচানোই দায়।

ট্যাক্সি ক'রে অভয়াপদ যখন বাড়ী এসে পেঁছিল তখন পাড়ার দু-একটি মেয়েছেলে এসে জড় হয়েছে। বলাই বুদ্ধি ক'রে ডাক্তার সেনকেও খবর দিয়েছে। প্রমীলাকে শুইয়ে দিয়েছে বিছানায়। মাথার কাছে ব'সে কে একজন হাওয়া করছে। জ্ঞান ফিরে এসেছে, কিন্তু এখনও বড়ো দুর্বল। কথা বলতে পারছে না! গরম দুধে কয়েক ফোঁটা ব্র্যাণ্ডি। প্রথমবার খাওয়াতে গিয়ে কস বেয়ে অনেকটা প'ড়ে গিয়েছিল, এবার কিছুটা পেটে গিয়েছে।

অভয়াপদকে দেখে ডাক্তার সেন এগিয়ে এলেন। সিঁড়ির ধারে নিয়ে গিয়ে বললেন, চোটটা অবশ্য খুব বেশী নয়। বেকায়দায় পড়লে রোগিনীকে বাঁচান যেত না। কিন্তু তলপেটে একটু লেগেছে বলেই মনে হচ্ছে। আপনি এ সময় কাউকে এনে রাখুন। কাছে আর একটি মেয়েছেলে থাকা ভাল। ডাক্তার সেন নিজেই মাথা নিচু ক'রে কি একটু চিন্তা করলেন, তারপর বললেন, এই সময়টা শ্বশুরবাড়ী থেকে

রমাকেই নিয়ে আসুন না একবার। কারুর কাছে থাকা খুব দরকার। সারাটা দিন একেবারে একলা।

রমা! অভয়াপদ একটু চমকে উঠল। শ্বশুরবাড়ী থেকে! ডাক্তার সেন এ বাড়ির পুরনো চিকিৎসক। তাঁকে অবশ্য তাই বলা হয়েছে। আচমকা জলজ্যান্ত একটা মেয়ের উধাও হ'য়ে যাওয়ার আর কি কারণ দেখানো যেতে পারে।

—নয়তো, ডাক্তার সেন শুরু করলেন, এক কাজ করি। আমি ওকে আজই নার্সিংহোমে নিয়ে গিয়ে তুলি। খরচ আপনার একটু বেশী হবে, তা ছাড়া আর তো উপায় দেখছি না।

—সেই ভালো। খরচ একটু বেশী পড়ে পড়ুক। অফিস থেকে ধার ধোর ক'রে অভয়াপদ ঠিক বন্দোবস্ত করবে।

ডাক্তার নিজেই নিয়ে গেলেন মোটরে। খুব সাবধানে ধ'রে ধ'রে। প্রমীলা যাবার সময় চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে অভয়াপদকে খুঁজল, তারপর সে কাছে যেতেই কান্নায় ভেঙে পড়ল।

রুমাল দিয়ে অভয়াপদ প্রমীলার দুটো চোখ মুছিয়ে দিল। কাঁধে হাত রেখে বলল, ছি, কাঁদে না। তোমার ঘরদোর তোমারই রইল। মাসখানেকের মধ্যেই তো ফিরে আসছো।

খুব অস্ফুট গলায় প্রমীলা বলল, তোমার? তোমার কি হবে?

—আমার জন্য ভেবো না। ঠাকুর রইল। সব ঠিক হয়ে যাবে। এসব নিয়ে একটুও চিন্তা কর না।

অভয়াপদ সঙ্গে গেল। নার্সিংহোমে ভর্তি ক'রে দিয়ে ফিরল রাত প্রায় আটটা। ঘরের দাওয়ায় ঠাকুর তার বন্ধুদের নিয়ে তাসে বসেছিল, বাবুকে দেখে উঠে দাঁড়াল।

ফাঁকা ঘর। একতলায় জনমানব নেই। অনেকদিন পরে অভয়াপদ পা ঠুকে ঠুকে রমার ঘরে ঢুকল, ইদানীং সমীর থাকত এ ঘরে। নিজের বাক্স, বিছানা আর বইগুলো ছাড়া আর কিছুই নিয়ে যায় নি।

সরু তক্তপোষ। নড়বড়ে টেবিল। জানলার গরাদে কাপড় রাখবার দড়িটা পর্যন্ত ঠিক। এগিয়ে গিয়ে অভয়াপদ টেবিলের কাছে দাঁড়াল। সমীর চিরকালের একগুঁয়ে। যে গোঁ ধরবে, তা করবেই। কি দরকার ছিল এ বাড়ি ছাড়ার। রমা তো নিজের বন্দোবস্ত নিজেই ক'রে নিয়েছে, মিছিমিছি সমীর নিজের আখের নষ্ট করছে। কোথায় মেসে এক কোণে পড়ে আছে ঠিক আছে?

অন্যমনস্কভাবে অভয়াপদ টেবিলের ওপর রাখা কাগজের টুকরো-গুলো নাড়াচাড়া করতে করতে একটা কাগজের টুকরো হাতে তুলে নিল। রমার হাতের লেখা। দুধের হিসাব। অনেকদিন আগের। সংসারের সবকিছু রমার হাতেই ছিল। রান্নাবান্না থেকে খুঁটিনাটি সব কিছু।

দুটো হাত পিছনে রেখে অভয়াপদ ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

প্রমীলার যদি কিছু হয়। প্রমীলা যদি না ফেরে। এক হাতে অভয়াপদ নিজের চুলের মুঠো ধরলো শক্ত ক'রে। কি হবে তা হ'লে। যক্ষের মতন বাড়িটা আগলাতে হবে। কিংবা আস্তানা উঠিয়ে কোন মেসে গিয়ে উঠতে হবে। হয়তো সমীরেরই পাশাপাশি।

সিঁড়িতে উঠতে উঠতে নিজের মনকে অভয়াপদ ঠিক ক'রে নিল। যত সব আবোল-তাবোল চিন্তা। অর্থহীন। সন্তান বুকে জড়িয়ে প্রমীলা ফিরে আসবে। একটি শিশুর কাকলীতে বাড়ির নির্জনতা খান খান হয়ে যাবে। সমস্ত শূন্যতা পূর্ণ হয়ে উঠবে—রমা সমীর কারুর অভাব আর অভাব ব'লে মনে হবে না।

পোষাক খুলে বেতের চেয়ারে অভয়াপদ বসল। কাল অফিস ফেরত শ্বশুরবাড়ীতে একবার খবর দিতে হবে। নার্সিংহোমে পাঠান ওদের খুব পছন্দসই নয়। ওখানে নাকি সুচিকিৎসা হয় না। ফ্যাসানদুরস্ত মেয়েদের সময় কাটাবার জায়গা। যেমন ডাক্তার তেমনি প্রজাপতি-নার্সের দল। অবশ্য বুঝিয়ে বলতে পারবে অভয়াপদ। একদিন সঙ্গে ক'রে এনে দেখিয়েও দিয়ে যেতে পারবে। আধুনিক ব্যবস্থা সব কিছুর। রোগিনীদের চিত্তবিনোদনের হাজার রকমের বন্দোবস্ত।

ক্লান্তিতে একসময়ে অভয়াপদর দু-চোখ বুজে এলো।

এখানে আর বাড়ীওয়ালার হাঙ্গাম নেই। একতলা ছোট্ট বাড়ি। গোটা তিনেক ঘর। চারপাশে জমিও আছে। বাড়ি রমার খুব পছন্দ। হাসতে হাসতে কমলকে ডেকে বলল, দেখলে তো, ছোড়দা কি কাজের। আর তুমি কি বাড়িতেই তুলেছিলে।

কমলও হাসল, তখন ছিল আমাদের অজ্ঞাতবাসের বছর। কোনরকমে মুখ লুকিয়ে থাকা।

—আর এখন? রমা কমলের খুব কাছে সরে এল, একেবারে গা ঘেঁষে।

কমল এদিক ওদিক চেয়ে দেখল। না, সমীর ধারে কাছে কোথাও নেই। একহাত দিয়ে রমাকে বুকের কাছে টেনে এনে বলল, অজ্ঞাতবাসের দিন কেটে গেছে। তোমার সারা শরীরে আগমনীর ঘোষণা। অন্ধকারে থাকা আর চলবে কি করে?

—যাও দুষ্টু কোথাকার। আঁচলে মুখ ঢেকে রমা ছুটে পালাল।

ছুটে পালাল বটে কিন্তু বেশী দূর নয়। পাশের ঘরে আয়নার সামনে গিয়ে বসে পড়ল। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল নিজেকে। অনেক পুরন্ত হয়েছে শরীর। উচ্ছলতা কমেছে, ভাদ্রের ভরা নদীর মতন টলটলে।

কথাটা মাত্র কাল রাত্রে রমা কমলকে বলেছে। ইনিয়ে-বিনিয়ে অনেক কথা বলার পর। কি দুষ্ট মানুষ। ঠিক মনে ক'রে রেখেছে। কিছু বলা যায় না, এখনি হয়ত ছোড়দাকে ডেকে শোনাবে কথাটা। ও মানুষ সব পারে।

কিন্তু সব যে পারে না কমল তার প্রমাণ পরের দিনই পাওয়া গেল।

রাত্রে খেতে বসে কমলই কথাটা পাড়ল, ওহে সমীর, তোমার দাদার সঙ্গে দেখা হ'ল।

সমীর থালা থেকে মুখ তুলল, তাই নাকি ? কথাবার্তা হ'ল কিছু ?

—মাথা খারাপ। রাস্তার মাঝখানে শেষকালে মারধোর খাব। কমল হাসল, কিন্তু তোমার দাদার শরীরটা যেন খারাপ দেখলাম। বাসের জন্য অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিলেন, আমিও উল্টো দিকের ফুটপাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম। চুল উস্কো-খুস্কো, মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ির ছিটে। অমন ফিটফাট সাহেবের পক্ষে বেমানানই মনে হ'ল।

দু হাতে সন্তর্পণে দুধের বাটি হাতে রমা রান্নাঘর থেকে আসছিল, কমলের কথা শুনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। বলতে নেই, অসুখ-বিসুখ জ্বর-জ্বারি দাদার বিশেষ হয়ই না। ছোট বেলা থেকে রমা দেখেছে। অবশ্য মানুষের শরীরের কথা কি বলা যায়। তা ছাড়া বয়সও তো বাড়ছে।

—হয়তো বৌদির সঙ্গে ঝগড়াঝাটি হ'য়ে থাকবে। জলের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে সমীর বলল।

দুধের বাটি দুজনের পাতের কাছে দিয়ে রমা হাসল, ও কথা বল না ছোড়দা। আর যার সঙ্গেই হোক, দাদার সঙ্গে বৌদির কোন দিন ঝগড়া হয় না। একটি বারের জন্যও নয়।

সকলেই হেসে উঠল।

কিন্তু তবু সকলের মনেই একটা সন্দেহের ছিটে। কি জানি বৌদির শরীর ভাল তো!

—তুমি কিন্তু একবার জিজ্ঞাসা করলেই পারতে। রমা কমলের দিকে ফিরে বলল।

—তোমার আর কি, তুমি তো বলেই খালাস। তারপর আমি সম্বন্ধীর ঘুসির চোটে রাস্তায় গড়াগড়ি দিই আর কি!

কথাটা সত্যি কমলেরও মনে হয়েছিল। ক্ষতি কি এগিয়ে গিয়ে বাড়ির কুশল প্রশ্ন করার! মায়ের পেটের বোন। মরে না হয় ঠাঁই

দেবে না, কিন্তু মন থেকে ছেঁটে ফেলে দেবে, তাও কখনও হয়। কিন্তু সাত পাঁচ ভেবে আর সাহস করে নি।

—আমার কিন্তু ভারি ইচ্ছা হয়, রমা আস্তে আস্তে বলল, সবাই মিলে ও বাড়িতে একবার বেড়াতে যাই।

শুধু রমার কেন, সকলেরই মনের ইচ্ছা অনেকটা তাই। কমল চায় সকলের সঙ্গে মিলে-মিশে থাকতে। মুখোমুখি দেখা হ'লে পাশ কাটিয়ে যাবে, মুখ ঘুরিয়ে থাকবে, এ বড় বিশ্রী। থাকতে ওরা চায় না কিন্তু যাওয়া-আসা বন্ধ থাকবে কেন। অনেক দিন তো হ'য়ে গেল, এতদিনে অভয়াপদ আর প্রমীলার রাগ নিশ্চয় কমে গেছে। একবার গিয়ে উঠলে কি অসৎ ব্যবহার করবে, মুখের ওপর দেবে দরজা বন্ধ ক'রে!

দাদা না পারলেও, বৌদির অসাধ্য কিছু নেই। সমীর মনে মনে ভাবল। বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে এমন সব কথা বলবে, পালিয়ে আসতে পথ পাবে না ওরা।

—তার চেয়ে এক কাজ করা যাক, সমীর সমস্যার সমাধান করতে পেরেছে এমনি ভাবে কথাটা বলল, আমি বরং একদিন খোঁজ নিতে যাই। চেঁচামিচি গালাগালি যদি কিছু হয়, আমার ওপর দিয়েই যাবে।

এবারে কমল আর রমা হাসল। কিন্তু রমার মন সায় দিল না। দরকার নেই বাপু যেচে গালাগাল খেতে যাবার। অনেক দিন ধ'রে মন খারাপ হ'য়ে থাকবে। উঠতে বসতে অস্বস্তি। এই বেশ আছি আমরা। বরং যদি পারে তো ছোড়দা টেলিফোনে যেন একবার খোঁজ নেয়।

সেদিন হঠাৎ বাসে দেখা। একবারে মুখোমুখি। আগে দেখতে পেলে কমল হয়তো উঠতই না সে বাসে। কিন্তু উঠে ভিতরে গিয়ে বসতে যেতেই থেমে গেল।

—কি খবর দাদা? চন্দনপুরে বাসা বেঁধেছেন বুঝি?

পিছনে সিটে হেলান দিয়ে নীরেনবাবু। ধোপদুরস্ত কাপড়। সযত্নে আঁচড়ানো চুল। পান চিবোচ্ছিলেন, হাতে জর্দার কৌটা।

ঘাড় নেড়ে এগিয়ে যেতে গিয়েও বাধা। ভদ্রলোক কমলের জামার হাতায় টান দিলেন, এই যে জায়গা রয়েছে এখানে।

অগত্যা পাশেই বসতে হ'ল।

—তারপর আপনি কোথায় আছেন এখন? কমল আলগোছে প্রশ্ন করল।

মুখের পান সামলে নীরেনবাবু একগাল হাসলেন, আর কোথায়? সকল দেশের রাণী সে যে আমার শ্বশুরভূমি!

বাস ভর্তি লোক। দেবীপুর থেকেই ভিড় শুরু হয়। বস্‌বার জায়গা ঠাস-বোঝাই। এবার রড ধরে ঝোলার পালা। আচমকা গানের সুর শুনে দু একজন ফিরে চাইল। কিন্তু নীরেনবাবুর চক্ষু লজ্জার বালাই নেই। কোন দিনই ছিল না। কমলের দিকে ঝুঁকে পড়ে বলতে লাগলেন, আপনারা মশাই একেবারে ছুট ক'রে চলে এলেন। বেশ থাকা গিয়েছিল।

কথা বাড়াল না কমল। পুরনো কথার ধার দিয়েও গেল না। মিছিমিছি খুঁচিয়ে ঘা।

—চন্দনপুরে ভালো বাড়ি একটা পাওয়া গেল। শহরের কাছেও হল, ভাড়াও কম।

এসব কথা নীরেনবাবুর বোধ হয় কানেও গেল না। নিজের কাহিনীতেই মশগুল।

—শ্বশুর মশাই তো খুব মেজাজ দেখালেন। লম্বা লম্বা বাত। তবে আমিও চুপ করে থাকবার লোক নই মশাই। আজই অবস্থা একটু টসকেছে। নয়তো ভুবন ডাক্তার নকুড় বোসদের সাতখানা গাঁয়ের লোক এক ডাকে চেনে। গুটি গুটি গিয়ে আমাকে পায়ে ধরে নিয়ে আসতে হল তো। নব-নিকেতনের দরজায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাপ আর মেয়ে দাঁড়িয়ে। থিয়েটার সেরে বেরোতেই শ্বশুর মশাই ছুটে এসে হাত চেপে ধরলেন। যা হবার হয়ে গিয়েছে। বাবা তুমি ফিরে চল। আমিও ফিরব না, উনিও ছাড়বেন না। তারপর ভাবলাম শেষকালে থিয়েটারের দোর-গোড়ায় একটা কেলেঙ্কারী। যশী চোখে আঁচল দিয়ে হাপুস নয়নে কাঁদছে। কেউ দেখে ফেললে আমার মাথা কাটা যাবে। যা হোক একটা প্রেষ্টিজ আছে তো?

—তাতো নিশ্চয়! কমল ঘাড় নাড়ল। না নাড়লে বিপদ বাড়বে বই কমবে না। কতক্ষণ এই এলোপাথাড়ি কাহিনী শুনতে হবে ঠিক আছে?

—তাই মশাই ফিরে এলাম। এখন বাড়ির সবাই তটস্থ। পান থেকে চুণটুকু খসলেই হাতজোড় করছে। হুঁ। উৎসাহের চোটে নীরেনবাবু পকেট থেকে সিগারেট বের করতে গিয়েই থেমে গেলেন। এই এক কারবার হয়েছে। ট্রামে বাসে সিগারেট ধরাবার উপায় নেই। যত সব।

ভাগ্য ভালো কমলের। শহরে বাস ঢুকতেই নীরেনবাবু উঠে পড়লেন, উঠি দাদা। ম্যানেজারের বাড়ি একটু নামবো। মাস তিনেক উপুড়-হস্ত করার নাম নেই। কাঁহাতক আর শ্বশুর মশাইয়ের কাছে হাত পাতা যায়। ইজ্জতে বাধে। আর মেয়ে-মানুষ জাতটাও মশাই অদ্ভুত।

স্বামীর শোক ভুলবে, তবু গয়নার শোক ভুলতে পারবে না। বাড়িতে টেঁকা দায় হ'য়ে পড়েছে। শেষ দিকের কথাগুলো বললেন ফিসফিসিয়ে। মুখের কাছে মুখ আনতেই কমল টের পেল। মৃদু গন্ধ। আগের রাতের রেশটুকুই হয়তো।

মাঝ রাতে কড়া নাড়ার আওয়াজে অভয়াপদর ঘুম ভেঙে গেল। বিছানার ওপর উঠে বসল। এত রাত্রে কে আবার দরজা ধাক্কা দেয়। দরজার কাছেই ঠাকুরের বিছানা। এত আওয়াজেও তার ঘুম ভাঙবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। চটি পায়ে গলিয়ে অভয়াপদ সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে এল।

এবার কড়া নাড়া থেমে গেছে। নাম ধ'রে কে একজন ডাকছে।

ঘুমের ঘোরে গলার আওয়াজ অভয়াপদ ঠিক ঠাহর করতে পারল না। সন্তর্পণে ঠাকুরের পাশ কাটিয়ে দরজার খিল খুলল।

নিতাইবাবু। মোড়ের দর্জির দোকানের মালিক। বিয়ে থা করেন নি। নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ। দোকান ঘরেই খাওয়া দাওয়া সব। চেঁচামেচি ক'রে ক'রে ভদ্রলোকের কপালে ঘাম জমে উঠেছে।

—এই যে অভয়াপদবাবু, আপনার একটা জরুরী টেলিফোন এসেছে। মেট্রোপলিটন নার্সিংহোম থেকে।

--কি খবর বলুন তো? খারাপ কিছু নয় তো? ভয়ে অভয়াপদর গলা জড়িয়ে গেল। দুটো পা-ই ঠক ঠক করে কাঁপছে। একটা হাত দিয়ে দরজার পাল্লা চেপে ধরল।

—কি জানি, সে সব তো কিছু বললে না। শুধু বললে, আপনাকে তাড়াতাড়ি একবার নার্সিংহোমে যেতে।

বিপদ বই কি। বিপদ ছাড়া আর কি। তা না হ'লে রাত বিরেতে টেলিফোন আসে, না মাঝরাত্তিরে হাসপাতালে যেতে বলে।

—আমার স্ত্রী ওখানে রয়েছেন দিন দশেক। তারই বোধ হয় কিছু হ'ল। অভয়াপদ আমতা আমতা করল। নিতাইবাবুকে নয়,

নিজেকেই যেন বলল কথাগুলো। অমঙ্গলের কথাটা আগে থেকে বলে ফেললে নাকি বিপদের মাত্রা কমে যায়। কি জানি, কি করবে অভয়াপদ কিছুই ঠিক ক'রে উঠতে পারল না।

—যান, আপনি আর দেরী করবেন না। যাবার কথাটা নিতাইবাবু মনে করিয়ে দিয়ে রাস্তায় নেমে পড়লেন।

পোষাক প'রে ঠাকুরকে ডেকে বাইরে বেরোতে আরও মিনিট পনেরো। বেরিয়ে তো পড়ুক, রাস্তা থেকে একটা ট্যাক্সি নিয়ে নিলেই হবে।

বরাত মন্দের ভাল অভয়াপদর। মোড় থেকেই ট্যাক্সি পেয়ে গেল। নার্সিংহোমে পেঁাছেই কিন্তু গা হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে এল। সব নিস্তব্ধ। কেবল নার্সদের উঁচু হিলের ঠক ঠক শব্দ। বাতাসে বিশ্রী ওষুধের গন্ধ। এনকোয়ারীতে খোঁজ করতেই এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এসে অভয়াপদকে নিয়ে ওপরে উঠলেন।

প্রমীলার বিছানার চারপাশ পার্টিশন দিয়ে ঘেরা। উপরের বাতিটা পর্যন্ত রঙিন কাগজ জড়িয়ে ম্লান করে দিয়েছে। পুরু চশমা প্রৌঢ় ডাক্তার পার্টিশনের কাছে দাঁড়িয়ে একজন নার্সের সঙ্গে কথা বলছিলেন, পায়ের শব্দে ঘুরে দাঁড়ালেন।

—কে ইনি ?

—পেসেণ্টের স্বামী।

—ও, ডাক্তার অভয়াপদকে ডেকে এক পাশে নিয়ে গেলেন। বারান্দার এক কোণে ;

—অবস্থা খুব ভাল নয়। হার্ট দুর্বল, তা ছাড়া শরীরেও রক্ত কম। এ অবস্থায় একমাত্র উপায় মা আর সন্তানকে আলাদা করে দেওয়া, নয়ত দুজনের কাউকেই বাঁচান যাবে না।

মা আর সন্তানকে আলাদা ? কিছু বুঝতে পারছে না অভয়াপদ। মাঝরাতে ঘুম থেকে তুলে এনে এরা কি সব হেঁয়ালী শুরু করেছে ?

—হ্যাঁ, আজ রাত্রেই অপারেশন করতে হবে। দেরী করলে ক্ষতিই হবে।

চেয়ারের হাতল ধ'রে অভয়াপদ টাল সামলাল। প্রমীলা যে বাঁচবে না, তা আগেই জানত। কি করবে অভয়াপদ। প্রমীলা ছাড়া ও যে কত নিঃসহায় এই মুহূর্তে সেটা স্পষ্ট হয়ে উঠল।

—আপনারা যা ভাল বোঝেন তাই করুন। আমি কি বলব ?

—নার্ভাস হবেন না। মনে জোর রাখুন। ডাক্তার পকেট থেকে কাগজ বের করে অভয়াপদর সামনে ধরলেন, একটা সই করে দিন।

কেবল কালো কালো অক্ষরের সার, আর কিছুই চোখে পড়ল না। তারপর চোখ কুঁচকে দেখল অভয়াপদ। অপারেশন করতে দেওয়ার অনুমতিপত্র। ভাল মন্দ যদি কিছু হয়ে যায় তবে সমস্ত দায়িত্ব অভয়াপদর। একবার মুখ তুলে ডাক্তারের দিকে চেয়ে দেখল আর একবার চোখ ফেরাল পার্টিশনের দিকে তারপর নিচু হ'য়ে ডাক্তারের এগিয়ে দেওয়া কলম দিয়ে নিজের নাম সই ক'রে দিল।

কয়েক ঘণ্টা নয়, যেন কয়েক যুগ। নার্সিংহোমের ওয়েটিং রুমের টেবিলে মাথা রেখে অভয়াপদ চুপচাপ ব'সে রইল। বিশ্রী সব শব্দ। জানলার ক্যাঁচ কোঁচ, নিশাচর পাখীর কর্কশ চীৎকার, রিক্সার ঠুং ঠাং। বার বার তন্দ্রা ভেঙে গেল। এখনি হয়ত নার্স এসে খবর দেবে, সব শেষ! নিস্পন্দ নিথর। প্রমীলার নিষ্প্রাণ দেহ দেখার মত সাহস নেই অভয়াপদর। দু হাতে চোখ ঢেকে ছুটে পালাবে। কিন্তু কোথায় কতক্ষণের জন্য !

মৃদু ধাক্কা। হাতের ওপর মাথা রেখে অভয়াপদ ঘুমিয়ে পড়েছিল, ঝাঁকানিতে চমকে জেগে উঠল।

—কে ?

সামনেই নার্স। কাল রাতের নয়, নতুন একজন। ভোর হয়ে গেছে। জানলা দিয়ে টেবিলের ওপর নরম রোদের আল্পনা।

—আপনি বাড়ি যান এবার!

—কিন্তু প্রমীলার অপারেশনের কি হ'ল ?

—ভয় অনেকটা কেটে গেছে, তবে এখনও চব্বিশ ঘণ্টা না কাটলে কিছু বলা যায় না। অপারেশন ভালই হয়েছে। ডাক্তার চৌধুরীর ছুরি কাঁচির হাত চমৎকার।

—একবার দেখতে পাই না। অভয়াপদর গলায় অনুনয়ের আমেজ।

—কাল বিকেলে আসবেন। তার আগে দেখা করতে দেওয়ার সুবিধা হবে না।

আর একটা রাত অভয়াপদ কোন রকমে কাটাল। দরখাস্ত পাঠিয়ে অফিসে সাতদিনের ছুটি নিল। নামমাত্র ভাতে বসল। বার দুয়েক নার্সিংহোমে খবর নিল। অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়নি। বিকাল চারটা বাজতেই নার্সিংহোমের দিকে পা চালাল।

ঠিক গেটের মুখেই ডাক্তার সেনের সঙ্গে দেখা। অভয়াপদকে দেখে মুচকি হাসলেন, ভয় অনেকটা কেটে গেছে। তবে শরীর খুব দুর্বল। এখনও মাসখানেক শুয়ে থাকতে হবে।

তা থাক, তাতে কোন আপত্তি নেই অভয়াপদর। এক মাস কেন, ছ-মাস থাক শুয়ে। তবু তো প্রাণে বেঁচে থাকুক।

অভয়াপদ ডাক্তার সেনের একটা হাত জাপটে ধরলেন, প্রাণের আর কোন ভয় নেই তো ?

—একেবারে নেই বলা যায় না। হার্ট এখন দুর্বল। কোন উত্তেজনার কারণ না ঘটতে দেওয়াই উচিত।

ডাক্তার পাশ কাটিয়ে বাইরে চলে গেলেন।

সিঁড়িতে পা দিতেই একটি নার্স এসে দাঁড়াল। প্রমীলাকে দেখাশুনা করার ভার এরই ওপর। অভয়াপদকে দেখে বলল, আজ আপনার সামনে যাওয়া উচিত হবে না।

—সে কি ?

খুব দুর্বল। ভাল করে চোখ চাইতে পারছেন না। তার ওপর এখনও কিছু বুঝতে পারছেন না, তাই, বুঝতে পারলেই কান্নাকাটি শুরু করবেন।

—কি বুঝতে পারলে ?

—পেটের বাচ্চাটাকে যে অপারেশন ক'রে বের করে ফেলা হয়েছে, সে কথা।

—ওঃ, অভয়াপদ নিঃশ্বাস ফেলল। কিন্তু একবার দেখা হয় না, একটুখানি শুধু চোখের দেখা ?

ঠোঁট কামড়ে নার্সটি কি ভাবল কিছুক্ষণ, তারপর বলল, আচ্ছা আসুন আমার সঙ্গে।

বারান্দার দেয়াল আর পার্টিশনের সামান্য ফাঁক। এপাশে দাঁড়ালে ওপাশের কিছুটা দেখা যায়। বিছানার খানিকটা। সেইখানে অভয়াপদকে নার্স দাঁড় করিয়ে দিল। ম্লান আলো। সেই আবছা আলোয় আরো বিশীর্ণ দেখাল প্রমীলার মুখ। দুটি চোখ নিমীলিত। মুখের রং কাগজের মত সাদা। প্রমীলা নয়, প্রমীলার কঙ্কাল। এ দৃশ্য বেশীক্ষণ চোখে দেখা যায় না।

এক মাস নয়, মাস দেড়েক। উঠে হেঁটে চলতে পারল ওই পর্যন্ত, নয়ত শরীর প্রমীলার এমন কিছু সারল না। সিঁড়িতে বেশী ওঠানামা করলে এখনও হাঁফ লাগে, ভারী জিনিষ তুলতে গেলে অন্ধকার দেখে চোখে। একলা থাকলেই ফুঁপিয়ে কাঁদে। কিছুদিন বাপের বাড়ী রইল। কথা দিল মাসখানেক থাকবে, কিন্তু সাতদিন না যেতেই অভয়াপদকে জরুরী তলব। ভাল লাগছে না। ফিরে যাবে অভয়াপদর কাছে। কেন এমন হ'ল। সন্তান বুকে জড়িয়ে নার্সিং-হোম থেকে ফিরে আসবে, এই কথাই তো ছিল। আচমকা দমকা হাওয়ায় সব ওলোট পালোট। তিলে তিলে নিজের রক্ত দিয়ে গড়ে তোলা শিশুকে রেখে আসতে হ'ল। অপুষ্ট মাংসপিণ্ড। প্রমীলা আর অভয়াপদর অপূর্ণ বাসনার মতনই।

ডাক্তার সেন মাঝে মাঝে আসেন। প্রমীলার বুক পিঠ পরীক্ষা ক'রে ঠোঁট ওল্টান, আরো দ্রুত উন্নতি আশা করেছিলাম। হার্টের অবস্থা প্রায় সেরকমই। কি ব্যাপার, আপনি কি খাওয়া দাওয়া বন্ধ করেছেন?

প্রমীলা উত্তর দিল না, উত্তর দিল অভয়াপদ, ওই খুঁটে খুঁটে পাখীর মতন খাওয়া। নিজের শরীর নিজেকেই দেখতে হবে বই কি। আমি আর কতটুকু বাড়ীতে থাকি।

তা অবশ্য সত্যি। কিন্তু যেটুকু থাকে, সেটুকু তদ্বির তদারকের অন্ত নেই। আঙুর ছাড়িয়ে মুখে দেওয়া, বুঝিয়ে শুনিয়ে গরম দুধ খাওয়ানো, বোতল বোতল টনিক। কিন্তু তেমন উপকার আর কই হচ্ছে। এখনও গায়ের রং ফ্যাকাসে, চোখের কোণে ছিটে ফোঁটা রক্ত নেই। সারা হাতে পায়ে শিরার জট।

কথাটা ডাক্তার সেনই বললেন। প্রমীলাকে দেখে অভয়াপদর পাশাপাশি নিচে নামতে নামতে বললেন, এক কাজ করুন। এত ওষুধ বিষুধেও তো কিছুই হ'ল না। দিনকতক বাইরে যান।

—বাইরে?

—হ্যাঁ, সমুদ্রের ধার কিম্বা সাঁওতাল পরগণার কোথাও। যান না, মাস কয়েকের জন্য ঘুরে আসুন। মনের দিক থেকেও একটা পরিবর্তন হবে। একঘেঁয়ে পরিবেশে আর কাঁহাতক ভাল লাগে।

কথাটা প্রমীলারও মনে লাগল। কয়েক দিনের জন্য ঘুরে আসলে হয় কোথাও। দিন সাতেক কল্পনা জল্পনা চলল। টাইম-টেবিল উল্টে উল্টে জায়গার খোঁজ। অবশেষে ঠিক হ'ল দেওঘর। কাছাকাছিও হবে আর জায়গাটাও স্বাস্থ্যকর। প্রথমে একমাসের ছুটি, পরে দরকার হ'লে বাড়ান যাবে।

শুভদিন দেখে দুজনে রওনা হ'য়ে গেল। উড়ে ঠাকুরকেও সঙ্গে নেওয়া হ'ল। বাড়ীতে ডবল তালা। প্রতিবেশীরা খোঁজ খবর নেবে মাঝে মাঝে। মানে তালা দুটো ঠিক আছে কি না সেইটুকু।

জলবায়ুর জন্যই হোক কিম্বা জায়গা পরিবর্তনের জন্যই হোক, প্রমীলার শরীরের বেশ উন্নতি দেখা গেল।

বিকেলে সেজেগুজে কোনদিন নন্দন পাহাড়, কোনদিন যশিডি রোড ধ'রে টানা হাঁটা। জায়গাটা অভয়াপদরও ভাল লাগল। আশেপাশে অনেক বাঙ্গালী পরিবার। বেড়াতে বেড়াতে আলাপ হ'ল দু-একজনার সঙ্গে। বাড়ীতে আসা-যাওয়া, দুপুরে তাসের আসর। একটু একটু ক'রে গালে রং ফুটলো প্রমীলার, কণ্ঠা চোয়াল ভরাট হ'ল মাংসের পলিমাটি পড়ে। মনে মনে অভয়াপদ ঠিক ক'রে ফেলল। অঢেল ছুটি পাওনা রয়েছে। শরীর যদি সারে প্রমীলার তো ছুটি বাড়ান যাবে। কোন অসুবিধা নেই।

মাঝে মাঝে অভয়াপদ ঠাট্টা করে। হালকা পরিহাস। প্রমীলার কাছে দাঁড়িয়ে বলে, তোমার তো অনেক বন্ধু বান্ধব জুটে গেছে এখানে, তুমি থাক, আমি চলি কলকাতায়।

—তাই বই কি, প্রমীলা ভুরু কোঁচকাল, তুমি না থাকলে আমার বুঝি এ জায়গা ভাল লাগবে ?

অভয়াপদ হাসল। বলল, পাগল না কি, তোমায় এই একপাল জোয়ান প্রতিবেশীর মধ্যে ফেলে কখনও যেতে পারি ? এসে দেখব বেহাত হয়ে গেছ।

—ভারি অসভ্য হচ্ছ তুমি। যত বয়স হচ্ছে মুখের আগল যেন আরো খুলে যাচ্ছে তোমার।

বাইরে পায়ের আওয়াজ হতেই অভয়াপদ কথা বাড়াল না। মল্লিকবাবুদের বাড়ির সব এসেছেন। মন্দিরে যাওয়া হবে।

মাঝে মাঝে কথাও ওঠে।

—বেশ আছেন মশাই, ছা-পোনা নেই। দিব্যি ঝাড়া হাত-পা। যখন যা মনে হচ্ছে করছেন। আর আমাদের দেখুন তো অবস্থা। ছেলেপুলের পাল। তার ওপর গলায় মাছের কাঁটা ফুটে থাকার মতন দু-দুটো আইবুড়ো বোন। আপনার তো পাঁচ জায়গায় যাওয়া আসা আছে। দেখবেন তো যদি পাত্রটাত্র পান।

উত্তর দিতে গিয়েই অভয়াপদ থেমে গিয়েছে। ছায়া থমথম প্রমীলার মুখ। নিঃসন্তান নারীর ব্যথা আর বুঝি কাউকে বোঝাবার নয়। এতদিনে কত বড় হ'ত। সেদিনের মাংসপিণ্ড আকৃতি পেত। নিটোল হাত পা, ককিয়ে কান্না, এক মাথা কোঁকড়ান চুলের রাশ। অন্তর ভরে থাকত প্রমীলার। পেয়ে হারানোর এ বেদনা রাখার বুঝি ওর ঠাঁই নেই।

দুধের সাধ ঘোলে মেটাবার চেষ্টা। প্রায়ই আশ-পাশের বাড়ি থেকে ছোট ছেলে মেয়ে কোলে ক'রে নিয়ে আসত প্রমীলা। তাদের সাজানো-গোজানো, পাউডার বুলিয়ে দেওয়া গালে, চোখে কাজল, কপালে টিপ। বুকে চেপে ধরে আদরে সোহাগে উদ্ব্যস্ত ক'রে তুলত। মনে হ'ত ওদের গা থেকে বর্ণ গন্ধ সব কিছু বুঝি ও মুছে নেবে। নরম স্পর্শ সন্তর্পণে লুকিয়ে রাখবে মনের মণিকোঠায়।

সমীর অফিস থেকে বেরিয়ে ফুটপাথে কিছুক্ষণ দাঁড়াল।

শনিবার। এত সকালে বাড়ি ফিরেই বা কি করবে! কমলের ফিরতে রাত হবে। অন্ততঃ সাতটা তো বটেই। চুপচাপ রমার সঙ্গে কথা। বেচারীর সংসারের কাজে বাধা দেওয়া। তার চেয়ে বন্ধু-বান্ধবের মেসে গিয়ে উঠলে হয়। দেখতে দেখতে সময় কেটে যাবে।

কিছুটা এগিয়েই কি ভেবে সমীর থেমে গেল। ক'দিন থেকে দাদার কথা মনে হচ্ছে। টেলিফোনের হাতল তুলেও সমীর ছেড়ে দিয়েছে। থাক গে, যেচে অপমান হ'য়ে আর লাভ কি! কিন্তু ক'দিন থেকে মন বুঝছে না। কমলের কাছে বেশ কয়েক মাস আগে দাদার উস্কোথুস্কো চেহারার কথা শুনেছিল। কে জানে, কি ব্যাপার। পরের বিপদে আপদে বুক দিয়ে পড়তে হয়, আর নিজের বাড়ির খোঁজ খবরটুকু নেওয়াও বুঝি কর্তব্য নয়। সমীর মন ঠিক ক'রে ফেলল। যা হবার হবে। সোজা গিয়ে উঠবে দাদার বাড়ি। ভয় কিসের। থাকতে তো আর যাবে না। শুধু চোখের দেখা, কে কেমন আছে এইটুকু।

সমীর চলন্ত বাসে উঠে পড়ল। বহু দিনের চেনা গলি। মানুষজনও অচেনা নয়। গলির মোড়েই কয়েকজনের সঙ্গে দেখা।

—কি ব্যাপার হে তোমার? কোথায় ছিলে এতদিন?

—বদলীর চাকরী বুঝি? বাইরে বাইরেই কাটাতে হয়? তা বেশ। পরের পয়সায় দেশ ভ্রমণ করে বেড়াচ্ছ।

কোনরকমে পাশ কাটিয়ে সমীর গলির মধ্যে ঢুকে পড়ল। সবাইয়ের প্রশ্নের উত্তর দিতে হলেই সর্বনাশ আর কি। একটা মুখে কুলোবে না।

খুব কাছে যেতে হ'ল না। দূর থেকেই বিকালের পড়ন্ত রোদে ডবল তালা ঝিকমিকিয়ে উঠল। তবু আস্তে আস্তে সমীর এগিয়ে গেল। যদি আশেপাশের লোকদের কাছ থেকে খোঁজখবর পাওয়া যায়।

মেঘ না চাইতেই জল। পাশের বাড়ির বলাই হন্তদন্ত হয়ে বেরোচ্ছে। বোধ হয় কোন পার্কে মিটিং আছে। কোন মিটিং বলাইয়ের ফাঁক যায় না। বিষয় যাই হোক। গোরক্ষা সমিতির উদ্বোধন থেকে শুরু ক'রে নিখিল ভারত যক্ষ্মা নিবারণী সভায় তার সমান উৎসাহ। কোন ক্লান্তি নেই, উদ্দীপনার অভাবও নয়।

সমীরকে দেখেই বলাই থমকে দাঁড়াল, আরে সমীরদা যে, কি মনে করে?

—কি মনে করে নয় ভাই, দাদাবৌদির খবর নিতে এসেছি।

—এতদিনে এসেছ খবর নিতে? বলে যমে মানুষে টানাটানি।

—সেকি? কার অসুখ?

—তোমার বৌদির। তুমি এদেশে ছিলে না বুঝি? তোমার বৌদির তো যায় যায় অবস্থা। অপারেশন ক'রে পেটের বাচ্চা নষ্ট ক'রে ফেলা হ'ল। এক ফোঁটা রক্ত ছিলো না শরীরে। তোমার দাদা একলা মানুষ, নাকালের একশেষ। আহা!

বলাই যাবার মুখেই বাধা পেল। সমীর এগিয়ে এসে তার কাঁধে একটা হাত রাখল, আমি এখানে ছিলাম না ভাই। কোন খবর জানি না। দাদা বৌদি নেই এখানে?

—না, তাঁরা নেই এখানে। মাসখানেক হল দেওঘরে গেছেন। বৌদির শরীর সারাতে। এখানে না হয় ছিলেই না সমীরদা, কিন্তু চিঠিপত্রের পাটও কি তুলে দিয়েছিলে? কথা শেষ করে বলাই আর দাঁড়াল না। হন হন্ ক'রে এগিয়ে গেল।

এই রকমই ছেলে বলাই। কিছু রেখে ঢেকে বলতে জানে না। যা মুখে আসে তাই বলে ফেলে। লঘু গুরুর বালাই নেই। কিন্তু পরহিতব্রতী এই ছেলেটিকে চিরকালই ভাল লাগত। সময়ে অসময়ে অনেক কাজ করেছে সমীরের।

দাদা বৌদি নেই, তবু সমীর দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। অনেকদিন এখানে কাটিয়েছে। অনেক বছর। দরজার পাশে পাড়ার ছেলেদের খড়ির আঁচড়, একপাশে ভোটের বিজ্ঞাপনের খানিকটা, এদিকটায় নাম্বার প্লেটটা অস্পষ্ট হ'য়ে এলেও, পড়তে অসুবিধা হয় না। সব ঠিক আছে। ছোট-খাটো অনেক দিনের চিহ্ন। কেবল মানুষ-গুলোই ছড়িয়ে ছিটকে পড়েছে চারদিকে।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সমীর ফিরে এল। দেওঘর থেকে দাদা বৌদি ফিরুক, এসে একদিন দেখা ক'রে যাবে।

সোজা বাড়ী নয়। পার্কে বসল কিছুক্ষণ। জনস্রোতের মধ্যে গা ভাসিয়ে এদিক ওদিক ঘুরল। মনের মধ্যে একটা খোঁচ। এর আগেই খোঁজ নেওয়া উচিত ছিল। দাদাকে টেলিফোন কিংবা সরাসরি বাসায় চলে আসা। রমার ওপর কর্তব্য যেমন রয়েছে তেমনি নিজের দাদা বৌদিকেও অবহেলা করা অনুচিত। মতের অমিল হলেই বা তা কেন মনান্তরের রূপ নেবে।

চন্দনপুরে যখন সমীর নামল, তখন সবে সন্ধ্যা উতরেছে। পশ্চিমের আকাশে রঙের ছিনিমিনির জের রয়েছে। মাথার ওপরে সাঁঝ তারার ঝিলিক। একটু এগিয়েই সমীর থেমে গেল। দেখলো দুটো চোখ কুঁচকে। ঠিক আগে আগেই কমলের মতন কে চলেছে। আবছা অন্ধকারে ঠিক ঠাওর হ'ল না। সিনেমার আলোর সামনে দেখা যাবে

গেলও তাই। কমলই চলেছে। দু-হাতে জিনিসপত্রের পোঁটলা। জোরে পা চালিয়ে সমীর পাশে গিয়ে দাঁড়াল, কি খবর, তোমায় তো বাসে দেখলাম না? রাস্তার মাঝখানে এলে কোথা থেকে? কথার সঙ্গে সঙ্গে সমীর কমলের হাত থেকে দু-একটা পোঁটলা টেনে নিল।

—এর আগের বাসে এসেছি; বাজারে নেমেছিলাম।

—কি এত সওদা করলে? চা, সাবান, এ দুটো পোঁটলা কিসের? ওটা আবার কিসের বোতল? ঠোঁট কুঁচকে কমল হাসল, মাভৈঃ, সে সব কিছু নয়। তোমার বোনের ওষুধ।

—ওষুধ! কেন, রমার আবার কি হ'ল? সমীর আশ্চর্য হ'য়ে গেল। সকাল বেলা অফিস যাবার সময়ও তো দেখে গেছে দিব্যি ঘোরাফেরা করছে, কাজ করছে সংসারের। কিছু বলা যায় না। মানুষের শরীর খারাপ হ'লেই হল। প্রমীলা বৌদির স্বাস্থ্যও তো ভালই ছিলো। শক্ত সমর্থ চেহারা।

কমল হাসি থামাল—না, না, এমন কিছু হয় নি।

—এমন কিছু হয় নি তো শখ ক'রে কে আবার বোতল বোতল ওষুধ গেলে!

সমীরের চোখ মুখের চেহারা দেখে কমল জোরে হেসে ফেলল, তুমি যে মামা হচ্ছো সমীর। এখন থেকে ডাক্তার রমাকে টনিক খেতে বলেছে। তাই বোস ফার্মেসীতে নেমেছিলাম।

মামা! আর অস্পষ্ট নয়। কুয়াশা ভেদ ক'রে সূর্যের আলো আসার মতন একটু একটু ক'রে সব স্বচ্ছ হয়ে এল। ইদানীং তাই বুঝি এত সুন্দর হয়েছে রমা। এত পরিপূর্ণ। জায়ার রূপের সঙ্গে মিশেছে জননীর রূপ।

বুঝতে যখন পারল তখন সমীরকে আর আটকান গেল না। পোঁটলা সামলে একটা হাতে কমলের হাত চেপে ধরল, ভোজের

আয়োজন কর কমল। কোন কথা শুনছি না। এমন একটা সুখবর তুমি চেপে রেখেছিলে?

সমীরের ঝাঁকুনিতে বেকায়দায় পড়ে গেল কমল। বহু কষ্টে হাতের জিনিসপত্র সামলে বলল, দোহাই তোমার সমীর, রাস্তার মাঝখানে এত আনন্দ দেখালে মুস্কিলে পড়ে যাব। জিনিষপত্র ছড়িয়ে একাকার হয়ে যাবে। বাড়ি পৌঁছুতে দাও, তারপর যত ইচ্ছা আনন্দ প্রকাশ কর।

যেতে যেতেই সমীর বলল। প্রমীলার অসুখের কথা। দাদা-বৌদির বায়ু পরিবর্তনের জন্য বাইরে যাবার খবর। এখন থেকে রমাকে ভাল ডাক্তার দেখানো দরকার। চন্দনপুরে নয়, শহরের কোন নাম করা চিকিৎসাবিদ।

—কাকে দেখান যায় বল তো? কমল ভাবনায় পড়ে গেল। এই সময়টা খুব সাবধানে থাকতে হয় মেয়েদের। গোড়া থেকে সাবধান না হ'লে, শেষকালে বিপদে পড়তে হয়।

—কেন, আমাদের ডাক্তার সেন রয়েছেন। ছেলেবেলা থেকে আমাদের দেখছেন। ইদানীং নার্সিংহোমও একটা খুলেছেন। ভদ্রলোকের হাতযশও খুব, পশারও ভাল।

—তা ত' হ'লো, কিন্তু সেখানে নিয়ে যাওয়া ত বিপদ।

—কেন?

—কেন আবার! সোমনাথ বাঁড়ুয্যের মেয়ে কমল ঘোষের পরিবার, একটু বাধো বাধো ঠেকবে না?

—ঠেকুক, সমীর মরীয়া, মানুষের প্রণে আগে না ঠুনকো জাত আগে?

—আমারও তাই মত সমীর, কমল হাসল, সেইজন্যই প্রাণের দিকে নজর দিয়েছিলাম। জাতের কথা ভাবি নি।

সমীর কোন ত্রুটি রাখল না। মা বেঁচে থাকলেও বোধ হয় রমার জন্য এতটা করতে পারত না। রোজ অফিস ফেরত ফল নিয়ে আসতে শুরু করল। দুধের বরাদ্দ বাড়িয়ে দিল। রমা কোন ভারী কাজে হাত দিলে হাঁ হাঁ ক'রে ছুটে এল।

—তুমি কি আরম্ভ করেছ ছোড়দা? অনুযোগ করতে রমা ছাড়ত না।

—কি আরম্ভ করেছি?

—এই রোজ গাদা গাদা ফল আন, রোজ তোমার সামনে এক গ্লাস দুধ খেতে হবে, এই সব।

—ফল আর দুধ কোনটাই তো আর খারাপ জিনিষ নয়। খাওয়া ভাল। আয়নায় নিজের চেহারাটা দেখেছিস একবার? চোখের কোণে কালি, চোয়াল ঠেলে উঠেছে।

একবার নয়, অনেকবার রমা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখেছে। একটু কালি পড়েছে দু-চোখের কোণে। কিন্তু পুরন্ত মুখ। নিটোল। চোয়াল ওঠার চিহ্নও নেই। মাংস লেগে ভারি হয়ে উঠেছে দুটি গাল।

শুধু খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারেই নয়, সমীরের নজর চারদিকে। সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে দেখল বাইরের ঘরে কমল আর রমা মুখোমুখি চুপচাপ বসে আছে। হয়তো কথা বলছিল, সমীরকে আসতে দেখে থেমে গেছে। হাতের ফলগুলো টেবিলের উপর রাখতে রাখতে সমীর বলল, বাঃ দুজনে মুখোমুখি, গভীর দুঃখে দুঃখী? কেন, কমলের সঙ্গে একটু বেড়িয়ে এলেও তো পার। নদীর ধার আর কতটুকু রাস্তা। যাও, যাও, ওঠো। কুড়েমীতে রাজযোটক।

সেদিন সকালেই সমীর অফিসে কার কাছে শুনেছে। এই সময় চলাফেরা করা ভাল। বাইরের আলো বাতাস লাগানো দরকার।

মেমরা এ সময়ে গড়ের মাঠে লম্বা লম্বা পা ফেলে হাওয়া খেয়ে বেড়ায়। মেমদের এমন অবস্থায় কখনও মাঠে-ঘাটে সমীর দেখে নি। তবু সাবধানের মার নেই। অফিসের চৌধুরীমশাই বিজ্ঞ লোক। বয়েস ষাটের কাছে, গত বছরেও ছেলে হয়েছে একটি। এটি নিয়ে এগার। তাঁর কথার দাম আছে বৈকি।

হাতজোড় করেছে কমল, অনুনয়-বিনয়, কিন্তু সমীর ভোলবার ছেলে নয়। উহুঁ, নদীর ধার না হোক, অন্ততঃ গোরাবাজারের মাঠ পর্যন্ত হেঁটে আসুক দুজনে। বাড়ীর কাজ সমীর করবে।

রমা হাসল, দোহাই ছোড়দা। বেড়াতে না হয় আমরা যাচ্ছি, কিন্তু তুমি দয়া ক'রে বাড়ির কাজ করতে যেও না। তা হ'লে বেড়িয়ে যেটুকু শক্তি-সঞ্চয় করব, ফিরে এসে তোমার কাজ ঠিক করতে করতে সবটুকু ক্ষয় হয়ে যাবে।

শুধু এই নয়। মাস ছয়েক যেতেই সমীর অন্য উপদেশ দিল। অবশ্য কমলের কানে কানে।

—ওসব উড়ো তর্ক রাখো কমল। বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ। আমি বলছি এক ছুটির দিন দেখে দুজনে কালীদর্শন ক'রে এস। একেবারে কালীঘাটে।

—কেন, কমল মুচকি হাসল, চন্দনপুরের ভুবনেশ্বরীর মন্দিরই তো রয়েছে। আবার পয়সা খরচ ক'রে অতদূর যাওয়া।

—উহু, সমীর মাথা নাড়ল, এসব ব্যাপারে একেবারে হেড-অফিসে যাওয়াই ভাল।

এ ব্যবস্থাটা রমারও খুব মনে ধরল। শহরে থাকতে ন-মাসে ছ-মাসে তবু যাওয়া হ'ত কালীঘাটে, কিন্তু শহর থেকে সরে এসে ও পাট উঠেই গেছে। বিয়ের পরেই রমার যাবার খুবই ইচ্ছা হয়েছিল,

কিন্তু তখন বাইরে বেরোতে সাহস হয় নি। কি জানি কে কোথা দিয়ে দেখে ফেলবে।

কমল কপালে হাত চাপড়াল, না, তোমরা ভাইবোনে আমায় পাগল করবে দেখছি। যা থাকে বরাতে, সামনের বুধবার আমার ছুটি, খেয়েদেয়ে দুর্গা ব'লে বেরিয়ে পড়া যাবে।

শুধু মুখের কথা নয়। কমল সত্যি সত্যিই রমাকে নিয়ে দুপুরের দিকে বেরিয়ে পড়ল। সকাল সকাল না বেরোলে ফিরতে রাত হয়ে যাবে। দরজায় তালা। কোন অসুবিধা নেই। বাড়তি চাবি সমীরের কাছেও আছে।

কালীঘাটের কাছ বরাবর পৌঁছেই দুজনে থমকে দাঁড়াল। জন-স্রোতের শেষ নেই। নানান জাত, নানান বয়স। ভিড়ে রাস্তা দেখবার উপায় নেই।

পথচলতি লোকের কাছে কমল খোঁজ নিল। কি ব্যাপার। পাল পার্বন কিছু নয়, অথচ এত ভিড়।

দুঃখ বিমোচন যজ্ঞ হচ্ছে যে। কোন এক রায় বাহাদুর যজ্ঞ করাচ্ছেন। দেশের দুঃখ যাতে ঘোচে। দেশের দুঃখ ঘুচবে কিনা ভগবান জানেন, কিন্তু রমা আর কমলের দুঃখ বাড়ল। অনেক কষ্টে ভিড় ঠেলে ঠেলে এগোতে লাগল। পাঁচ মিনিটের পথ আধ ঘণ্টায়।

প্রণাম সেরে দুজনের বেরিয়ে আসতে বেলা গড়িয়ে সন্ধ্যা। প্রসাদী ফুল হাতে নিয়ে কমল এগোতেই একেবারে সামনাসামনি। এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেও সুবিধা হল না। চোখে চোখ পড়েছে।

গরদের পাঞ্জাবী, সারা কপালে সিঁদুর লেপা, গলায় জবার মালা। অদ্ভুত চেহারা। পিছনে অবগুণ্ঠনবতী।

—এই যে কমলবাবু, পুণ্য সঞ্চয় করতে বেরিয়েছেন ? নীরেনবাবু একগাল হাসলেন। গলার আওয়াজেই রমা চমকে মুখ তুললো, তারপর হাত দিয়ে মাথার ঘোমটা টেনে দিল।

প্রশ্নের উত্তর কমল এড়িয়ে গেল। শুকনো হেসে বলল, এই যে, ভাল আছেন ?

—মায়ের চরণে পড়ে আছি। আমাদের আর ভাল আর মন্দ। জড়ান গলা। নীরেনবাবু প্রকৃতিস্থ নেই।

—চলি, বাড়ি পৌঁছোতে রাত হয়ে যাবে। কমল পাশ কাটাবার চেষ্টা করল। তারপরেই নীরেনবাবুর পিছনে দাঁড়ান বৌটিকে দেখতে পেল। সুবুদ্ধি হোক নীরেনবাবুর। সস্ত্রীক ধর্মাচরণের সুফল ফলুক।

কথাটা কমল ব'লেই ফেলল, একেবারে বৌদিকেও নিয়ে বেরিয়েছেন। আর আপনাকে পায় কে ?

বৌদিকে ! তারপরই নীরেনবাবু পাশের অবগুণ্ঠনবতীর দিকে চেয়ে হাসিতে ভেঙে পড়লেন, বেশ আছেন মশাই আপনি। খবরের কাগজের লোক কি না, রং চড়িয়ে একেবারে দিনকে রাত।

কমল অপ্রস্তুতের একশেষ ! স্ত্রী নয়, তবে ও মহিলা কে ?

পরিচয় নীরেনবাবুই দিলেন, ইনি আমাদের বোর্ডের কণিকাসুন্দরী। এঁর নাম শোনেন নি, 'রিজিয়া'য় 'রিজিয়া', 'জনা'য় 'জনা', ষোড়শী'তে 'ষোড়শী' ? বিখ্যাত অ্যাকট্রেস। মঞ্চ ছেড়ে এবার পর্দায় নামতে চলেছেন। কায়া নয়, ছায়া। সঙ্গে সঙ্গে রয়েছি, ছোঁয়াচ লেগে অধীনেরও যদি বরাত খুলে যায়। কাল থেকে নতুন বইয়ের শুটিং শুরু, তাই বললাম, মাকে একবার দর্শন দিয়ে আসি। হাজার হোক, নতুন লাইন ত'।

রমা অবাক হ'য়ে মহিলাটির দিকে চেয়েছিল। দুচোখ পর্যন্ত

ঘোমটা। তারই ফাঁকে নাকের নাকছাবি, প্রবাল-টুকটুকে ঠোঁট নজরে পড়ল।

নীরেনবাবু একটু সরতেই কমল পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে এল। পিছন পিছন রমা। এ সব লোকের ছায়া মাড়ালেও পাপ। চোখাচোখি হ'লেই সারা শরীরটা কাঁটা দিয়ে ওঠে।

সকালের দিকে বাইরের ঘরে বসে কমল খবরের কাগজের পাতা ওল্টাচ্ছিল। সবই তো জানা খবর। তা ছাড়া কয়েকটা সংবাদ সে নিজের হাতেই সাজিয়েছে। কেটে ছেঁটে মুখরোচক ক'রে। কিন্তু তবু এই এক আচ্ছা নেশা। সকালে উঠে হাতের কাছে খবরের কাগজ না পেলে সারাটা দুনিয়া বিস্বাদ ঠেকে। খবরের কাগজ হাতের মুঠোয় পাওয়া তো নয়, দুনিয়ার সব কিছু যেন হাতের মুঠোয় পাওয়া।

রমা এতক্ষণ কাছে বসে কি একটা সেলাই করছিল, একটু আগে উঠে গেছে। বোধ হয় রান্নার তদারকে। কিছুদিন আগেও সমীর খুব ঝুঁকেছিল। শরীরের এমন অবস্থায় রান্নাবান্নার কাজ ক'রে দরকার নেই। তার চেয়ে বরং একজন রাঁধুনী জোগাড় করে আনবে।

দু হাতযোড় ক'রে রমা সমীরকে থামিয়েছিল। ছোড়দা, তোমার পায়ে পড়ি। আমার কোন কষ্ট হবে না। উটকো লোককে কিছুতেই আমি হেঁসেলে ঢুকতে দেব না। ভারি তো কটা মানুষের রান্না। আমার একটুও কষ্ট হয় না।

রমার মুখের দিকে চেয়ে সমীর কি ভেবে আর এগোয় নি। বাড়তি লোক আনে নি বটে, কিন্তু নিজে এগিয়ে গিয়েছে সাহায্য করতে।

ভাতের হাঁড়ি নামাবার মুখে রমা বাধা পেল।

—সর্, সর্, আমি নামাচ্ছি।

—কেন? তুমি যাও, আমি খুব নামাতে পারব।

—তর্ক করিস নি। সমীর এগিয়ে ভাতের হাঁড়ি নামাল। খুব সাবধানে কাপড় দিয়ে চেপে।

—ফ্যান গেলে দেব ? সমীর কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়াল।

—হ্যাঁ, ওইটে হ'লেই চোদ্দ পোয়া পূর্ণ হয়। একটা গামছা জড়াও। কাল সকাল থেকে রান্নাঘরের কাজটাই না হয় নাও, আমিই তোমার হ'য়ে অফিসে যাব এখন।

সমীর হেসে সরে দাঁড়াল।

সরার মুখ খুলে দিয়ে রমা সমীরের দিকে ফিরে বসল। আঁচল দিয়ে কপাল গাল মুছে নিয়ে বলল, এইবার তুমি একটা বিয়ে-থা কর ছোড়দা।

—আমি ?

—হ্যাঁ। তুমি রাজী হও তো বল, কাল থেকে দেখা আরম্ভ করি।

—ওই দেখ, কথাটা একেবারে ভুলেই গেছি। হঠাৎ একটা কিছু মনে পড়েছে এই ভাবে সমীর লাফিয়ে উঠে পড়ল। হন্তদন্ত হ'য়ে নিজের ঘরে ঢুকে তাকের ওপর থেকে একটা আনকোরা বই পেড়ে নিল। কাল কলেজ স্ট্রীট ঘুরে ঘুরে বইটা কিনেছে। অফিসের একটি ভদ্র-লোকও সঙ্গে ছিল। পরামর্শ টা তাঁরই।

বই হাতে নিয়ে সমীর যখন বাইরের ঘরে গিয়ে দাঁড়াল, তখন কমল খবরের কাগজের শেষ পাতা মনোযোগ দিয়ে পড়ছে। মানব সভ্যতার আদিম ইতিহাস সম্বন্ধে ভারি মনোজ্ঞ রচনা। লেখক বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরা অধ্যাপক। প্রবন্ধটার মাঝামাঝি যেতেই সমীরের ডাকে কমলের চমক ভাঙল!

—কি যে ছাইপাঁশ সব পড়। যত আজগুবি খবর। খবরের কাগজ থেকে চোখ না তুলেই কমল হাসল। বলল, তোমার সঙ্গে এ বিষয়ে আর একজনের খুব মিল আছে সমীর।

—মিল আছে, কার ?

—মজা আকন্দপুরের যশোদার। বাড়ীওয়ালার মেয়ের।

—কি রকম ?

—খবরের কাগজ সম্বন্ধে তাঁরও এই মত। দুনিয়ার যত উদ্ভুটে খবর এক সঙ্গে ক'রে নাকি খবরের কাগজ বেরোয়।

—কথাটা খুব মিথ্যে নয়। কোথায় পেরুতে কার মেরুদণ্ড ভাঙল, কিংবা মোম্বাসায় রাজা বদল হ'ল তা জেনে আর আমাদের লাভ কি ?

কোন উত্তর দিল না কমল। কথাগুলো যে সমীরের মনের কথা নয়, সেটুকু বুঝতে অসুবিধা হ'ল না।

সমীর কমলের পাশে বসে হাতের বইটা এগিয়ে দিল, ওসব রেখে সময় ক'রে এ বইটা প'ড়ো মন দিয়ে।

—কি বই হে। গীতা ভাগবত নয় তো ? এমন ছুটির সকালটা ওভাবে নষ্ট করব।

মুখে কমল এ কথা বলল বটে, কিন্তু হাত বাড়িয়ে নিলও বইটা। মলাটের ওপর চোখ বুলিয়েই অবাক হ'য়ে গেল। প্রসূতি পালন। কোন এক রাধাবিনোদ সেনশর্মার লেখা। চালু বই, পঞ্চম সংস্করণ চলছে।

—না, তোমার মাথা খারাপ হবার আর বাকি নেই।

—ওই তো তোমার দোষ। কোন কিছু গভীর ভাবে নাও না। খুব ভাল বই। অনেক কিছু জানবার আছে।

—জানবার আছে, তা আমাকে কেন, বোনকেই দিয়ে যাও না। সমীর মুখ নিচু করল। হাত দিয়ে শতরঞ্চ খুঁটতে খুঁটতে বলল, ঠিক আছে, তুমিই দিয়ে দিও।

কমল বইটার পাতা ওল্টানর ফাঁকে সমীর দাঁড়িয়ে উঠল, চলি, সকালে আবার একটি বন্ধুর বাড়ী যাওয়া দরকার।

—তোমার দাদা বৌদির কোন খবর পেলে নাকি ?

সমীর আবার বসল। কমলের গা ঘেঁষে।

—না, আর কোন খবর পাই নি। বলাইয়ের কাছে শুনলাম ওরা দেওঘর গেছে। কবে ফিরবে তাও কিছু জানি না। বৌদির শরীর সারাতে গেছে এইটুকুই শুধু শুনলাম।

—এসব ব্যাপারে শরীর সারতে বেশ একটু দেরীই হয়। রোগটা যতটা মনের, শরীরের ততটা নয়। কমল খুব আস্তে আস্তে বলল।

—হুঁ, সমীর বেশ একটু আনমনা। এত কাছাকাছি থেকেও দাদার এমন একটা বিপদে কিছু যে করতে পারল না, এ আক্ষেপ সমীরের যাবার নয়।

—তোমার দাদার মনেও খুব একটা ধাক্কা লেগেছে।

—হ্যাঁ, খুবই সম্ভব।

সারা রাত সমীর ভেবেছে। কেন এমন হয়। দিয়ে কেড়ে নেওয়ার একি রহস্য। দশমাস দশদিন নিজের বুকের রক্ত নিংড়ে তিল তিল ক'রে নিভৃতে গড়ে তোলা আত্মজ, অনেকটা নিজের কামনাই। স্বগোত্র, তাকে হারালে কি নিয়ে বাঁচবে মানুষ? কোন ছলনায় ভুলে আবার ঢুকবে নিজেদের রংচংয়ে সাজানো সংসারে?

কথাটা অফিসেও দু একজন বন্ধুর কাছে সমীর বলেছে। কেউ কেউ সমবেদনা প্রকাশ করেছে, উপদেশও দিয়েছে কেউ কেউ। সময়ে সাবধান হ'লে নাকি এ সব হবার ভয় থাকে না। চোখে চোখে রাখতে হবে আসন্ন-প্রসবাকে। কথাটা সমীরই পেড়েছিল। এ সম্বন্ধে বই নেই কোন? সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে এমন কোন বই। নেই আবার। কত রয়েছে। ভাল ভাল লোকের লেখা। কিন্তু কজন আর খোঁজ রাখে? ব্যাপারটা তলিয়ে দেখবার চেষ্টাই করে না কেউ। তা না হ'লে এ দুর্ভাগা দেশে শিশু মৃত্যুর হার এমন হবে কেন? প্রতি

মুহূর্তে কত হাজার শিশু শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করছে, তারও একটা ফিরিস্তি দিয়েছিল সহকর্মীরা।

সমীর আর দেরী করে নি। অফিসের একজনকে সঙ্গে নিয়ে বইয়ের পাড়া ঘুরে বইটা জোগাড় করেছে। রাত জেগে কিছুটা পড়েও ছিল, কিন্তু তারপর মনে হয়েছে, বইটা কমলেরই পড়া উচিত। ঢিলে-ঢালা পোষাক পরা সম্বন্ধে যে সব নির্দেশ রয়েছে সেগুলো কমলের মারফৎ রমাকে জানানই সমীচীন।

—উঠি, এর পরে গেলে বন্ধুটিকে ধরতে পারব না। বেরিয়ে যাবে। সমীর উঠে পড়ল। ঘরের মধ্যে ঢুকে তাড়াতাড়ি সার্ট গলিয়ে নিল। তারপর চটি ফটফট করতে করতে রাস্তায় নামল।

অনেকক্ষণ ধ'রে কমল চেয়ে চেয়ে দেখল। যে কোন বোনের এমন ভাই পাওয়া ভাগ্যের কথা সন্দেহ নেই, কিন্তু যে কোন লোকের এমন বন্ধু পাওয়াও কম গৌরবের নয়। ফুলের সৌন্দর্য যেমন ফোটে দুটি সবুজ পাতার পটভূমিতে তেমনি রমার লাবণ্য আর সৌন্দর্যের অনেকখানিই মধুরতর হয়েছে সমীরের স্নেহ-সান্নিধ্যে। কোনদিন নিজের দিকে ফিরেও চায় নি। নিজেকে নিঃশেষে মিশিয়ে দিয়েছে কমলদের সংসারে। এ আত্মবিলুপ্তির তুলনা নেই। কথাটা মনে হ'তেই সঙ্গে সঙ্গে কমলের আর একটা কথা মনে পড়ে গেল।

সমীরের পাঞ্জাবীটা অটুট কিন্তু ধুতির অবস্থা মারাত্মক। হাঁটুর কাছে ফেঁসে গেছে। অনেকখানি জায়গা। বলা যায় না, নতুন ধুতি কেনার পয়সা দিয়েই হয় তো রমার জন্য ফল আর দুধ এনেছে। বোনকে স্বাস্থ্যোজ্জ্বল করতে নিজের ধূলিধূসর অবস্থা।

—রমা, রমা। কমল গলাটা একটু চড়াল।

ছুটির দিন। রান্নাবান্নার তত তাড়া নেই। রমা আস্তে আস্তে

কাজ সারছিল। বঁটি পেতে আনাজ কুটতে শুরু করেছিল, কমলের ডাকে বঁটি সরিয়ে বাইরের ঘরে এসে দাঁড়াল।

—ডাকছ আমায় ?

—সারাক্ষণই তো ডাকছি। মনে প্রাণে, অহোরাত্র।

—চালাকি রাখ, রমা কপট রাগে ভুরু কোঁচকাল, কি বলবে বল।

—সমীরের জামা কাপড়ের অবস্থা দেখেছ ? যে কাপড় পরে আজ বেরোল, সে কাপড়ে কেউ রাস্তায় পা দেয় না। বোনকে বহাল তবিয়তে রাখতে বেচারীর যে ফতুর হবার দাখিল।

সিঁথির সিঁদুর রমার সারা মুখে কে বুঝি লেপে দিল। কিছুক্ষণ মুখই তুলতে পারল না, তারপর ফিসফিসিয়ে বলল, সত্যি, ছোড়দা নিজের দিকে দেখেই না।

—ছোড়দা যখন দেখে না, তখন আমাদের তো দেখা উচিত, কি বল ? কমল কাগজ সরিয়ে উঠে দাঁড়াল, দেখো তো, ওর বাক্সপ্যাঁটরা হাঁটকে। যদি নতুন কাপড় চোপড় না থাকে তো, কাল আমি বেরোবার সময় একবার মনে করিয়ে দিয়ো, এক জোড়া ধুতি নিয়ে আসব।

—এখনি দেখছি। রমা আর দাঁড়াল না। সমীরের ঘরে গিয়ে ঢুকল।

তালার বালাই নেই। ডালাটা খুলতেই একরাশ ছেঁড়া কাপড়ের স্তূপ। সে সব সরিয়েই রমা অবাক হ'য়ে গেল। একি ব্যাপার! এক তাল ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জামা। রবারের খেলনা। বল, বাঁশী, বেলুন।

পায়ের শব্দ হতেই রমা চমকে মুখ ফেরাল। দরজার কাছে কমল এসে দাঁড়িয়েছে। লজ্জায় রমা তাড়াতাড়ি বাক্সের সামনে থেকে সরে দাঁড়াল।

কমল এগিয়ে এল, কি ব্যাপার ? নতুন ধুতি বোধ হয় একখানাও নেই ? সে আমি সমীরের কাপড়ের অবস্থা দেখেই বুঝেছি।

কমলের কথা শেষ হতেই রমা চাপা গলায় বলল, প্যাটরার কাছে গিয়ে একবার দেখ না।

বেশীদূর নয়, কয়েক পা এগোতেই সমস্ত ব্যাপারটা কমলের চোখে পড়ল। আনকোরা ধুতি নেই বটে, কিন্তু বাচ্চা ছেলেমেয়েদের জামা-ফ্রকের কমতি নেই। অগুণ্তি খেলনা।

নিচু হয়ে কমল একটা একটা করে জামাগুলো তুলে ধরল। ছেলেদের জামা, মেয়েদের ফ্রক। ঝুমঝুমি থেকে ঝিনুক পর্যন্ত।

দেখতে দেখতে কমল এক সময়ে হেসে উঠল। রমার দিকে ফিরে বলল, তা বেচারীর আর দোষ কি বল। গণৎকার তো আর নয়। ভাগ্নে হবে না ভাগ্নী হবে তা আগের থেকে বুঝবেই বা কি করে। সেই জন্যই দু' রকম পোষাকই কিনে রেখেছে।

হাসতে হাসতে কমলের হঠাৎ খেয়াল হল, রমা যোগ দেয় নি তার হাসিতে। চুপচাপ জানালার গরাদ ধরে বাইরের দিকে চেয়ে রয়েছে, দু গাল বেয়ে জলের ধারা। দাঁত দিয়ে চেপে ধরেও ঠোঁটের কাঁপুনি বন্ধ করতে পারছে না।

কমল সাবধানে বাক্সের ডালাটা বন্ধ করে দিল।

গরম পড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রমীলার শরীর খারাপ হতে সুরু করল। জ্বর হওয়ায় মুখ চোখ শুকিয়ে উঠল। দুর্বল ভাব। চলাফেরা করলেই বুকের দুপদুপানি বাড়ে। একটুতেই ক্লান্তি।

অভয়াপদ মাথায় হাত দিয়ে পড়ল। সর্বনাশ। বেশ সেরে উঠেছিল শরীর। মনে করেছিল আর দিন পনেরো পরেই কলকাতা রওনা হবে। কিন্তু এ কি বিপত্তি। এক মাসের নাম করে এসে কত দিন কেটে গেল। পাওনা ছুটিও প্রায় শেষ। এবার ছুটি নিলে অর্ধেক মাইনে। সেজন্য আক্ষেপ নেই অভয়াপদর। কোন রকমে চালিয়ে নেবে। কিন্তু প্রমীলার শরীর নিয়েই তো ভয়ের কথা।

প্রতিবেশীরা অন্য উপদেশ দিল। এই অসহ্য গরমেই কষ্ট হচ্ছে। গরম ক্রমেই বাড়বে। এখানকার লোকেরাই ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ে। বাইরের লোকের তো কথাই নেই। এই সময়টা দেওঘর ছেড়ে অন্য কোথাও যাওয়াই সমীচীন। শরীরের এই দুর্বল অবস্থায় কলকাতায় ফিরেও দরকার নেই।

তা হ'লে ? আবার কোথায় গিয়ে উঠবে ?

পুরী। পুরী। গরমের সময় পুরী চমৎকার জায়গা। নাতিশীতোষ্ণ। আর দ্বিধা নয়, এই বেলা রওনা হওয়াই ভাল। এর পর হোটেলে আর জায়গা পাওয়া যাবে না।

অগত্যা আবার বিছানাপত্তর বাঁধার পালা। প্রতিবেশীদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যাত্রা শুরু।

পুরীতেও একই অবস্থা। প্রথম দিন কতক বেশ কাটল। সমুদ্র আর মন্দির, বালির উপর পায়ের ছাপ ফেলে ফেলে হাঁটা। কোনারক

যাওয়ারও ইচ্ছা ছিল, কিন্তু, প্রমীলার শরীরের দিকে চেয়ে অভয়াপদ সাহস করল না। মধ্যে কয়েকদিন ভুবনেশ্বর ঘুরে এল। মাঝে মাঝে ভাল থাকে প্রমীলা। মুখ থেকে ক্লান্তির ছায়া অপসারিত। হাসি-খুশিতে উজ্জ্বল। কিন্তু আবার কেমন ঝিমিয়ে পড়ে। বালির ওপর ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মেলা। লুটোপুটি খাচ্ছে, এ ওর গায়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিচ্ছে বালির কণা। প্রমীলা একদৃষ্টে চেয়ে চেয়ে দেখে। ইচ্ছা করে, বালিকাদা মাখা শিশুদের মধ্যে থেকে তুলে নেয় একটাকে। বুকে চেপে ধ'রে আদরে সোহাগে পাগল করে তোলে। শিশুর কলকণ্ঠের কাকলি কানে যেন অমৃত বর্ষণ করে।

মাঝে মাঝে দু একজনের সঙ্গে ভাব করার চেষ্টা করেছে। এগিয়ে গিয়ে কোলে তুলে নিয়েছে দু এক জনকে। কেউ কেউ কেঁদে উঠেছে, আবার কেউ কেউ বুকে মুখ গুঁজে উপভোগ করেছে প্রমীলার আদর যত্ন।

দূরে বসে অভয়াপদ চুপচাপ দেখেছে। অতৃপ্ত মাতৃহৃদয়ের ক্ষুধা। নিজের রক্ত আর মজ্জা নিংড়ে একটি শিশু। তারই দুর্বার আকাঙ্ক্ষায় প্রমীলা তিল তিল করে ক্ষয় হ'য়ে যাচ্ছে। কেমন একটা ভীতি এসেছে শরীরে আর মনে। সন্তান ধারণের ক্ষমতাও বুঝি লোপ পেয়ে যাবে। না, না, আর নয়। আবার তো হারিয়ে যাবে তেমন ক'রে। পৃথিবীর আলো-বাতাস দেখার আগেই কাঁচি আর ফোরসেপের নির্মম পেষণে তার ইতি। এ সর্বনেশে খেলায় আর প্রমীলার উৎসাহ নেই।

অভয়াপদ ডাক্তার সেনকে সমস্ত ব্যাপারটা খুলে লিখল। এর আগে দেওঘর থেকে প্রমীলার ভালো থাকার খবর দিয়েছিল। বর্তমান শরীরের অবস্থার কথা লিখে জানাল।

প্রায় দিন পনেরো পর। ডাক্তার সেন লাইন কয়েক উত্তর দিলেন। বাইরে যদি শরীর ঠিক না থাকে, তাহলে থাকার আর দরকার নেই। কলকাতায় ফিরে আসুক। নতুন এক ইনজেকশন বেরিয়েছে। গোটা বারো নিতে হয়। ডাক্তার সেনের ইচ্ছা প্রমীলাকে এই ইনজেকশনের কোর্স দেবেন। ওঁর মনে হয় কিছু কাজ এতে হবেই।

সকাল থেকে সমীর পিছনে লেগে রইল। কমলকে উদ্ভ্রান্ত। ডাক্তার সেনের কাছে আজই একবার যাওয়া দরকার। রমাকে সঙ্গে নিয়ে। তিনি যা ভাল বোঝেন তাই হবে। এই বেলা নার্সিংহোমে একটা সিট নিয়ে রাখা ভাল। নয়তো পরে হয়তো ভর্তিই হ'তে পারবে না।

আয়নার সামনে বসে কমল দাড়ি কামাচ্ছিল। সাবান ঘসতে ঘসতে হাসল, না সমীর, তুমি এবার ক্ষেপবে দেখছি। ছেলেপুলে যেন আর কারুর হয় না, তোমার বোনেরই যা হচ্ছে।

—আরে, তা হবে না কেন? সমীর কমলের পাশে চেপে বসল, যেমন হচ্ছে, মরছেও তেমনি। তুমি তো খবরের কাগজের লোক, এদেশের শিশু মৃত্যুর হার তোমার অজানা নয়।

—তা তো নয়। কিন্তু তোমার বোনের তরিবতের কি কোন ত্রুটি হয়েছে বলতে পার? তুমি তো ফলের বাজার উজাড় ক'রে রোজ নিয়ে আসছ। টনিকের খালি বোতলও ঘরে বড় কম জমে নি। আর কি করতে চাও বল।

—উহুঁঃ, আজই নিয়ে যাও ডাক্তার সেনের কাছে। ভদ্রলোকের সঙ্গে তোমারও তো আলাপ আছে। একটা ব্যবস্থা ঠিক ক'রে দেবেন।

রমাও প্রথমে কিন্তু কিন্তু করেছিল। ভারি লজ্জা করবে ঘোমটা দিয়ে ডাক্তার সেনের সামনে দাঁড়াতে, তাও শরীরের এই অবস্থায়। কিন্তু কোন আপত্তি টিঁকল না সমীরের কাছে। ওদের সঙ্গে করে বাস-ষ্টপেজ পর্যন্ত পেঁ ৗছে দিয়ে এল। শহরে পেঁ ৗছে কমল যেন ট্যাক্সি নেয় একটা। এই অবস্থায় রমাকে বাসে ট্রামে বেশি চড়ানো ঠিক হবে না। মাস

কাবার, নয়ত সমীর বোধ হয় চন্দনপুর থেকে শহরে যাবার টানা ট্যাক্সির ব্যবস্থাই করত।

সমীরের মনেও কেমন একটা ভয় হ'য়ে গেছে। এর মধ্যে অভয়াপদর অফিসে একবার ফোন করেছিল। দাদা এখনও ফেরে নি। তার মানে বৌদির শরীর সারে নি এখনও। তারপর অফিস এলাকায় বলাইয়ের সঙ্গেও দেখা হয়েছিল। সেও ওই এক কথাই বলেছিল। দেওঘরে শরীর সারে নি, দাদা বৌদি পুরীতে গেছে। কবে কলকাতায় ফিরবে কিছুই ঠিক নেই। নাকে দড়ি দিয়ে যেন ঘোরাচ্ছে মানুষটাকে। টাকার শ্রাদ্ধ। শরীরটা সারলে তবু সার্থক হ'ত খরচ। কাজেই এই বেলা রমাকে ভাল লোককে দিয়ে দেখান দরকার। বাইরে থেকে শরীর রমার ভালই আছে, কিন্তু বাইরের থেকে মানুষের আর কতটুকু দেখা যায়। যন্ত্রপাতি দিয়ে পরীক্ষা করতে হবে। আভ্যন্তরীণ দুর্বলতার খোঁজ পাওয়া সোজা কথা? সবার অলক্ষ্যে তিল তিল করে গড়ে উঠছে শিশু। মেদ অস্থি মজ্জা থেকে আহরণ করছে জীবনীশক্তি। স্বতন্ত্র এক সত্তা। কত সাবধানে লালন করতে হবে তাকে। হৃদয়ের রক্ত দিয়ে হৃদ্‌স্পন্দনের ছন্দ রাখতে হবে।

ভেবেও সমীর কূল-কিনারা পায় না। ভালয় ভালয় সব কিছু হয়ে গেলে যেন সে বাঁচে। হৃষ্টপুষ্ট এক সন্তান কোলে ক'রে রমা ফিরে এসেছে। প্রসূতি আর শিশু দুজনেই সুস্থ, সবল, এমন একটা অবস্থা কল্পনা ক'রে। আনন্দ রাখার আর ঠাঁই থাকবে না সমীরের। কিন্তু সে কবে!

রমা যা ভয় করেছিল, ডাক্তার সেন তার ধার দিয়েও গেলেন না। কেবল হেসে বললেন, তোমার দাদা বিয়েতে তো ফাঁকি দিলেন, এবার আর ছাড়ছি না। এক থালা সন্দেশ আদায় করব। ডাক্তার সেন,

বহু দিনের পুরানো লোক। সোমনাথবাবুকে আগে আগে দেখতে আসতেন। রমাদের পরিবারের সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠ। কমলকে ঠিক চিনে উঠতে পারলেন না। সোমনাথবাবুদের বাড়িতে দেখে থাকবেন!

চেম্বারে রোগিনীদের ভিড় একটু কমতেই রমাকে ভিতরে ডাকলেন। অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করলেন। প্রশ্ন করলেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে! কমলের কাছ থেকে নিয়ে চন্দনপুরের ডাক্তারের প্রেস-ক্রিপশনগুলোর ওপর নজর বোলালেন। তারপর বললেন, ভয়ের কোন কারণ নেই, ঠিক আছে।

ডাক্তারের আশ্বাসবাণীতে কমল স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। হাজার হোক শহরের নামকরা ডাক্তার। তাঁর মতামতের দাম অনেক।

কথাটা কমলই পাড়ল। নার্সিংহোমে একটা সিটের জন্য। ওদের ইচ্ছা রমা ডাক্তার সেনের তদারকেই থাকুক। চন্দনপুরের বুড়ো ধাত্রীর ওপর ছেড়ে দিতে সাহস হ'ল না।

বেশ তো। আপনি এর মধ্যে আর একদিন নিয়ে আসবেন। আমি আর একবার পরীক্ষা করব, সেদিনই ভর্তির বন্দোবস্ত ক'রে দেব।

ডাক্তার সেন রমার দিকে চেয়ে কি ভাবলেন কিছুক্ষণ! ঠোঁট কামড়ে বললেন, অবশ্য এই সময়টা অতদূর থেকে আসা যাওয়া না ক'রে কাছাকাছি থাকতে পারলেই ছিল ভাল। কিন্তু তোমার দাদা বউদি তো বাইরে। অবশ্য চিঠি পেয়েছি, শীঘ্রই বোধ হয় আসবেন।

একটু ইতস্ততঃ করল রমা, তারপর সঙ্কোচ কাটিয়ে জিজ্ঞাসা করল, বউদির শরীর এখন কেমন?

জিজ্ঞাসা করেই লজ্জায় পড়ে গেল। ওর বউদি, অথচ মঙ্গল-অমঙ্গলের সংবাদ পেতে হবে ডাক্তারের মারফৎ! কেন, চিঠিপত্রের মাধ্যমে ওর কাছে খবর আসে না? ছি, ছি, এ প্রশ্ন না তুললেই ভাল ছিল।

অবশ্য ডাক্তার সেন এসব নিয়ে মাথা ঘামালেন না। এখনও কিছু রোগী অপেক্ষা করছে। সময় কম। স্টেথোস্কোপ গলায় ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে উঠতে উঠতে বললেন, মিসেস ব্যানার্জীর রোগটা মনের ব্যাপারই বেশী। উত্তেজনাপ্রবণ মেয়েদের পক্ষে এ রকম একটা ব্যাপার হ'য়ে গেলে সামলাতে দেরী হয়। দেখি, নতুন একটা ইনজেকশনের কোর্স দেব ঠিক করেছি। বেশ, তা হ'লে ওই কথাই রইল। বুধবার নাগাদ আর একবার নিয়ে আসবেন।

কমল আর রমা দুজনেই বাইরে বেরিয়ে এল। ঝিরঝিরে বাতাস। পার্কে পার্কে ঠাস বোঝাই লোক। পথচলতি লোকেরও কমতি নেই।

কমল রমার দিকে একবার ফিরে চাইল, তারপর বলল, কি, কষ্ট হচ্ছে ?

ঘাড় নাড়ল রমা, না, কষ্ট হবে কেন ? বউদির কথা ভাবছি। দাদা বউদি ফিরে এলে আমাকে নিয়ে আসবে একদিন। কি আর হবে ?

কমল হাসল, উহুঁ, সমীরকে নিয়ে এস। তার পাতলা চেহারা আছে, তাড়া করলে পালিয়ে আত্মরক্ষা করতে পারবে। তোমার যত্ন আদরে আমার যে রকম নাড়ুগোপাল প্যাটার্নের সাইজ হয়েছে, ছুটতে গেলেও কাছা-কোঁচা জড়িয়ে রাস্তার মাঝখানে চিৎপাত হ'য়ে পড়ব।

গোটা ছয়েক ইনজেকশনেই প্রমীলার অনেক উপকার হ'ল।

প্রথম প্রথম ডাক্তার সেনের সহকারী বাড়িতে এসে দিয়েছেন, এখন প্রমীলা বিকালের দিকে নিজেই নার্সিংহোমে চলে যায়। অসুবিধা কিছু নেই, বরং সুবিধা অনেক। ছোট ছেলেমেয়ের পাল। প্রমীলা বেছে বেছে দু একটাকে কোলে তুলে নেয়। বুকের মাঝখানে চটকায়। ওষুধে যা না হয়, ছেলেপিলে কোলে করলে জীবনীশক্তি যেন বেড়ে যায় প্রমীলার। বুকের টনটনানি অনেক কম।

সেদিন ইনজেকশন শেষ ক'রে প্রমীলা বাইরে যেতেই একমাথা কোঁকড়ানো চুল একটি ছেলেকে দেখতে পেল। বাপের সঙ্গে সদ্যজাত ভাইকে দেখতে এসেছে। প্রমীলা হাত নেড়ে ডাকল প্রথমে, তারপর কাছে গিয়ে আদর করবার চেষ্টা করল। কিন্তু ছেলেটি মুখ গুঁজে রইল। কিছুতেই মুখ তুলল না। বাপ অপ্রস্তুত। অনেক সাধ্য-সাধনা করলেন, কিন্তু ছেলে মুখ তুলল না।

প্রমীলা হেসে হাল ছেড়ে দিল। সঙ্গে উড়ে ঠাকুরটা এসেছিল। রোজই আসে। প্রমীলাকে পৌঁছে দিয়েই চলে যায়। অভয়াপদ অফিস ফেরৎ নিয়ে যায়। এর মধ্যে প্রমীলা একবার ওপরে ঘুরে আসবে।

সিঁড়ির মুখেই নার্সের সঙ্গে দেখা হ'ল। ভারি হাসিখুশী মেয়েটি। প্রমীলার সঙ্গে খুব ভাব। প্রমীলাকে দেখে এক গাল হাসল, আসুন প্রমীলাদি। এই তো চেহারা বেশ সেরে এসেছে। কিন্তু মুখ এত ভার কেন?

প্রমীলা কপট গাম্ভীর্যে মুখ আরো ভার করল, নিচে একটি বাচ্চার সঙ্গে ভাব করতে গেলাম, তো এমন মুখ ফিরিয়ে রইল। কিছুতেই আমার দিকে ফেরাতে পারলাম না।

—ও, এই কথা, নার্সটি হাসি থামাল না, চলুন আপনাকে একগাদা বাচ্ছা দেখাচ্ছি।

কাছাকাছি যেতেই কান্নার শব্দ কানে গেল। অন্ততঃ ডজনখানেক ছেলেমেয়ে। ছোট ছোট খাট, বুকে নম্বর লাগানো। মায়ের নম্বরের সঙ্গে মিলিয়ে। একজনের বাচ্ছা যেন অন্য কারুর কাছে চলে না যায়।

ঘুরে ঘুরে প্রমীলা দেখল। কেউ দিব্যি ঘুমাচ্ছে চোখ বুজিয়ে, কেউ পরিত্রাহি চীৎকার করছে। নানা আকারের নানা বয়সের কচি কচি মাংসের তাল।

তোয়ালে ঢাকা একটি শিশুকে নিয়ে আর একটি নার্স এঘর থেকে ওঘরে যাচ্ছিল, প্রমীলা থামাল তাকে।

—ছেলে না মেয়ে ?

মেয়ে, নার্সটি হাত নিচু করল। ফুটফুটে মেয়ে, কোঁকড়ানো আঙুরের থোলোর মতন চুলের রাশ। টানা চোখ, টিকোল নাক, লালটুকটুকে ঠোঁট। প্রমীলাকে দেখে মুচকি হাসল।

—ওমা, কি সুন্দর মেয়ে। আবার দুষ্টু দুষ্টু হাসি। দিন না একটু আমার কোলে।

নার্স শিশুটিকে সন্তর্পণে প্রমীলার কোলে তুলে দিল। কচি কচি হাত বাড়িয়ে বাচ্ছাটা প্রথমে প্রমীলার শাড়ী চেপে ধরল, তারপর প্রমীলা চুমো খেতে মাথা নিচু করতেই মুঠো করে ধরল চুলের গোছা। আচ্ছা মেয়ে তো। ওমা, এইটুকু মেয়ে আবার কপালে কাজলের টিপ!

—কার মেয়ে ভাই ? প্রমীলা আদর করতে করতে জিজ্ঞাসা করল।

—এগার নম্বরের। আজই বউটি চলে যাবে তাই মেয়েকে সাজানো-গোছানো হয়েছে।

—সে কি, আজই চলে যাবে ? বিষাদের ছায়া নামল প্রমীলার মুখে। ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যাবে, আর হয় তো দেখাই হবে না। ভেবেছিল রোজ একবার ক'রে আসবে। মেয়েটিকে চটকাবে বুকে নিয়ে।

একটু কি ভাবল প্রমীলা, তারপর বলল, চলুন এর মার সঙ্গে আলাপ ক'রে আসি। মেয়েটাকে কিনেই নেবো না হয়। কত হাজার টাকা পেলে এর মা একে দেবে ? কথার সঙ্গে সঙ্গে ঝুঁকে পড়ে মেয়েটিকে নাক দিয়ে কাতুকুতু দিল, কি গো সোনামণি, কত দাম তোমার ?

মেয়েটি কি বুঝল কে জানে। আরো জোরে চুলের মুঠি আঁকড়ে খিল খিল ক'রে হেসে উঠল। কামরায় ঢুকতেই এক রাশ কুঞ্চিত চুলের গোছা দেখা গেল। জানলা ধরে বাইরের দিকে চেয়ে মেয়েটি কি দেখছিল।

—আপনার মেয়েটিকে নিতে এলাম। কত টাকা হ'লে দিতে পারেন বলুন ত ?

আচমকা গলার আওয়াজে মেয়েটি চমকে উঠল, তারপর ফিরেই অবাক।

সদ্যজাতাকে বুকের মধ্যে আঁকড়ে প্রমীলা দাঁড়িয়ে।

—একি বৌদি ?

—ঠাকুরঝি !

ভয় হ'ল রমার। চিনতে না পেরে যে মেয়েটিকে বৌদি বুকে জড়িয়ে ধরেছিল, পরিচয় পেয়ে কঠিন মাটিতে তাকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে না তো। ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়া মেয়ের সন্তান। অসবর্ণ বিয়ের ফল।

কিন্তু আশ্চর্য, প্রমীলা সে সব কিছুই করল না ! আরও জোরে মেয়েটাকে বুকের মধ্যে আঁকড়ে ধরল। চুমোয় চুমোয় উদ্ব্যস্ত। ধরা

গলায় বলল, মা হয়ে একেবারে পীর হয়ে গেছ, না ঠাকুরঝি? বড় বৌদি, এতদিন পরে দেখা, একটা প্রণামও বুঝি করতে নেই? কথার সঙ্গে সঙ্গে টস টস করে চোখের জল প্রমীলার গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল।

কম্পিত পায়ে এগিয়ে যেতে গিয়েই রমা বাধা পেল। পিছন থেকে কমল এসে দাঁড়াল, নিচু হয়ে প্রণাম করতে করতে বলল, কথাটা যে আমায় ঠেস দিয়ে বলা তা বুঝি বুঝতে পারি নি ভেবেছ বৌদি! বাবা, প্রণাম পাবার এত লোভ?

কমলের ইঙ্গিতে রমাও এগিয়ে প্রমীলার পায়ের ধুলো নিল। সোজা হয়ে দাঁড়াতেই প্রমীলা তার চিবুক স্পর্শ ক'রে চুমো খেল। হেসে বলল, প্রণামে ভুলছি না, আসল কথাটাই যে চাপা পড়ে গেল। কত টাকা পেলে মেয়েকে দিতে পারো বল?

মুখ নিচু করে রমা হাসতে লাগল। উত্তর দিল কমল, তোমার ভালোবাসার কাছে আবার টাকা বৌদি। তোমার ভালোবাসার মূল্যেই তুমি নাও ওকে।

হঠাৎ কি মনে হ'তে রমা আঁচল টেনে দিল মাথায়। ফিসফিসিয়ে বলল, ছোড়দা আসে নি?

—আসে নি আবার। সকাল থেকে পাগল ক'রে মেরেছে। নিচে দুভায়ে মুখোমুখি বসে কথা হচ্ছে।

এদের কথার এক বর্ণও প্রমীলার কানে গেল না। এক মনে মেয়েটাকে আদর ক'রে চলেছে। আর মেয়েটাও তো আচ্ছা আদরখাকী। মাটীর তালের মতন চুপ ক'রে পড়ে আদর খাচ্ছে। মাটীর তালই বটে! কিন্তু এত তার রং, এত তার জেল্লা, দূরে সরে যাওয়া হৃদয়কে কাছে টানার এত শক্তি!

সমাপ্ত

গরম পড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রমীলার শরীর খারাপ হতে সুরু করল। জ্বর হওয়ার মুখ চোখ শুকিয়ে উঠল। দুর্বল ভাব। চলাফেরা করলেই বুকের দুপদুপানি বাড়ে। একটুতেই ক্লান্তি।

অভয়াপদ মাথায় হাত দিয়ে পড়ল। সর্বনাশ। বেশ সেরে উঠেছিল শরীর। মনে করেছিল আর দিন পনেরো পরেই কলকাতা রওনা হবে। কিন্তু এ কি বিপত্তি। এক মাসের নাম করে এসে কত দিন কেটে গেল। পাওনা ছুটিও প্রায় শেষ। এবার ছুটি নিলে অর্ধেক মাইনে। সেজন্য আক্ষেপ নেই অভয়াপদর। কোন রকমে চালিয়ে নেবে। কিন্তু প্রমীলার শরীর নিয়েই তো ভয়ের কথা।

প্রতিবেশীরা অন্য উপদেশ দিল। এই অসহ্য গরমেই কষ্ট হচ্ছে। গরম ক্রমেই বাড়বে। এখানকার লোকেরাই ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ে। বাইরের লোকের তো কথাই নেই। এই সময়টা দেওঘর ছেড়ে অন্য কোথাও যাওয়াই সমীচীন। শরীরের এই দুর্বল অবস্থায় কলকাতায় ফিরেও দরকার নেই।

তা হ'লে? আবার কোথায় গিয়ে উঠবে?

পুরী। পুরী। গরমের সময় পুরী চমৎকার জায়গা। নাতিশীতোষ্ণ। আর দ্বিধা নয়, এই বেলা রওনা হওয়াই ভাল। এর পর হোটেলে আর জায়গা পাওয়া যাবে না।

অগত্যা আবার বিছানাপত্তর বাঁধার পালা। প্রতিবেশীদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যাত্রা শুরু।

পুরীতেও একই অবস্থা। প্রথম দিন কতক বেশ কাটল। সমুদ্র আর মন্দির, বালির উপর পায়ের ছাপ ফেলে ফেলে হাঁটা। কোনারক

যাওয়ারও ইচ্ছা ছিল, কিন্তু, প্রমীলার শরীরের দিকে চেয়ে অভয়াপদ সাহস করল না। মধ্যে কয়েকদিন ভুবনেশ্বর ঘুরে এল। মাঝে মাঝে ভাল থাকে প্রমীলা। মুখ থেকে ক্লান্তির ছায়া অপসারিত। হাসি-খুশিতে উজ্জ্বল। কিন্তু আবার কেমন ঝিমিয়ে পড়ে। বালির ওপর ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মেলা। লুটোপুটি খাচ্ছে, এ ওর গায়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিচ্ছে বালির কণা। প্রমীলা একদৃষ্টে চেয়ে চেয়ে দেখে। ইচ্ছা করে, বালিকাদা মাখা শিশুদের মধ্যে থেকে তুলে নেয় একটাকে। বুকে চেপে ধ'রে আদরে সোহাগে পাগল করে তোলে। শিশুর কলকণ্ঠের কাকলি কানে যেন অমৃত বর্ষণ করে।

মাঝে মাঝে দু একজনের সঙ্গে ভাব করার চেষ্টা করেছে। এগিয়ে গিয়ে কোলে তুলে নিয়েছে দু এক জনকে। কেউ কেউ কেঁদে উঠেছে, আবার কেউ কেউ বুকে মুখ গুঁজে উপভোগ করেছে প্রমীলার আদর যত্ন।

দূরে বসে অভয়াপদ চুপচাপ দেখেছে। অতৃপ্ত মাতৃহৃদয়ের ক্ষুধা। নিজের রক্ত আর মজ্জা নিংড়ে একটি শিশু। তারই দুর্বার আকাঙ্ক্ষায় প্রমীলা তিল তিল করে ক্ষয় হ'য়ে যাচ্ছে। কেমন একটা ভীতি এসেছে শরীরে আর মনে। সন্তান ধারণের ক্ষমতাও বুঝি লোপ পেয়ে যাবে। না, না, আর নয়। আবার তো হারিয়ে যাবে তেমন ক'রে। পৃথিবীর আলো-বাতাস দেখার আগেই কাঁচি আর ফোরসেপের নির্মম পেষণে তার ইতি। এ সর্বনেশে খেলায় আর প্রমীলার উৎসাহ নেই।

অভয়াপদ ডাক্তার সেনকে সমস্ত ব্যাপারটা খুলে লিখল। এর আগে দেওঘর থেকে প্রমীলার ভালো থাকার খবর দিয়েছিল। বর্তমান শরীরের অবস্থার কথা লিখে জানাল।

প্রায় দিন পনেরো পর। ডাক্তার সেন লাইন কয়েক উত্তর দিলেন। বাইরে যদি শরীর ঠিক না থাকে, তাহলে থাকার আর দরকার নেই। কলকাতায় ফিরে আসুক। নতুন এক ইনজেকশন বেরিয়েছে। গোটা বারো নিতে হয়। ডাক্তার সেনের ইচ্ছা প্রমীলাকে এই ইনজেকশনের কোর্স দেবেন। ওঁর মনে হয় কিছু কাজ এতে হবেই।

সকাল থেকে সমীর পিছনে লেগে রইল। কমলকে উদ্ভ্রান্ত। ডাক্তার সেনের কাছে আজই একবার যাওয়া দরকার! রমাকে সঙ্গে নিয়ে। তিনি যা ভাল বোঝেন তাই হবে। এই বেলা নার্সিংহোমে একটা সিট নিয়ে রাখা ভাল। নয়তো পরে হয়তো ভর্তিই হ'তে পারবে না।

আয়নার সামনে বসে কমল দাড়ি কামাচ্ছিল। সাবান ঘসতে ঘসতে হাসল, না সমীর, তুমি এবার ক্ষেপবে দেখছি। ছেলেপুলে যেন আর কারুর হয় না, তোমার বোনেরই যা হচ্ছে।

—আরে, তা হবে না কেন? সমীর কমলের পাশে চেপে বসল, যেমন হচ্ছে, মরছেও তেমনি। তুমি তো খবরের কাগজের লোক, এদেশের শিশু মৃত্যুর হার তোমার অজানা নয়।

—তা তো নয়। কিন্তু তোমার বোনের তরিবতের কি কোন ত্রুটি হয়েছে বলতে পার? তুমি তো ফলের বাজার উজাড় ক'রে রোজ নিয়ে আসছ। টনিকের খালি বোতলও ঘরে বড় কম জমে নি। আর কি করতে চাও বল।

—উহুঁঃ, আজই নিয়ে যাও ডাক্তার সেনের কাছে। ভদ্রলোকের সঙ্গে তোমারও তো আলাপ আছে। একটা ব্যবস্থা ঠিক ক'রে দেবেন।

রমাও প্রথমে কিন্তু কিন্তু করেছিল। ভারি লজ্জা করবে ঘোমটা দিয়ে ডাক্তার সেনের সামনে দাঁড়াতে, তাও শরীরের এই অবস্থায়। কিন্তু কোন আপত্তি টিঁকল না সমীরের কাছে। ওদের সঙ্গে করে বাস-ষ্টপেজ পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে এল। শহরে পৌঁছে কমল যেন ট্যাক্সি নেয় একটা। এই অবস্থায় রমাকে বাসে ট্রামে বেশি চড়ানো ঠিক হবে না। মাস

কাবার, নয়ত সমীর বোধ হয় চন্দনপুর থেকে শহরে যাবার টানা ট্যাক্সির ব্যবস্থাই করত।

সমীরের মনেও কেমন একটা ভয় হ'য়ে গেছে। এর মধ্যে অভয়াপদর অফিসে একবার ফোন করেছিল। দাদা এখনও ফেরে নি। তার মানে বৌদির শরীর সারে নি এখনও। তারপর অফিস এলাকায় বলাইয়ের সঙ্গেও দেখা হয়েছিল। সেও ওই এক কথাই বলেছিল। দেওঘরে শরীর সারে নি, দাদা বৌদি পুরীতে গেছে। কবে কলকাতায় ফিরবে কিছুই ঠিক নেই। নাকে দড়ি দিয়ে যেন ঘোরাচ্ছে মানুষটাকে। টাকার শ্রাদ্ধ। শরীরটা সারলে তবু সার্থক হ'ত খরচ। কাজেই এই বেলা রমাকে ভাল লোককে দিয়ে দেখান দরকার। বাইরে থেকে শরীর রমার ভালই আছে, কিন্তু বাইরের থেকে মানুষের আর কতটুকু দেখা যায়। যন্ত্রপাতি দিয়ে পরীক্ষা করতে হবে। আভ্যন্তরীণ দুর্বলতার খোঁজ পাওয়া সোজা কথা? সবার অলক্ষ্যে তিল তিল করে গড়ে উঠছে শিশু। মেদ অস্থি মজ্জা থেকে আহরণ করছে জীবনীশক্তি। স্বতন্ত্র এক সত্তা। কত সাবধানে লালন করতে হবে তাকে। হৃদয়ের রক্ত দিয়ে হৃদ্‌স্পন্দনের ছন্দ রাখতে হবে।

ভেবেও সমীর কুল-কিনারা পায় না। ভালয় ভালয় সব কিছু হয়ে গেলে যেন সে বাঁচে। হৃষ্টপুষ্ট এক সন্তান কোলে ক'রে রমা ফিরে এসেছে। প্রসূতি আর শিশু দুজনেই সুস্থ, সবল, এমন একটা অবস্থা কল্পনা ক'রে। আনন্দ রাখার আর ঠাঁই থাকবে না সমীরের। কিন্তু সে কবে!

রমা যা ভয় করেছিল, ডাক্তার সেন তার ধার দিয়েও গেলেন না। কেবল হেসে বললেন, তোমার দাদা বিয়েতে তো ফাঁকি দিলেন, এবার আর ছাড়ছি না। এক থালা সন্দেশ আদায় করব। ডাক্তার সেন

বহু দিনের পুরানো লোক। সোমনাথবাবুকে আগে আগে দেখতে আসতেন। রমাদের পরিবারের সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠ। কমলকে ঠিক চিনে উঠতে পারলেন না। সোমনাথবাবুদের বাড়িতে দেখে থাকবেন!

চেম্বারে রোগিনীদের ভিড় একটু কমতেই রমাকে ভিতরে ডাকলেন। অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করলেন। প্রশ্ন করলেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে! কমলের কাছ থেকে নিয়ে চন্দনপুরের ডাক্তারের প্রেস-ক্রিপশনগুলোর ওপর নজর বোলালেন। তারপর বললেন, ভয়ের কোন কারণ নেই, ঠিক আছে।

ডাক্তারের আশ্বাসবাণীতে কমল স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। হাজার হোক শহরের নামকরা ডাক্তার। তাঁর মতামতের দাম অনেক।

কথাটা কমলই পাড়ল। নার্সিংহোমে একটা সিটের জন্য। ওদের ইচ্ছা রমা ডাক্তার সেনের তদারকেই থাকুক। চন্দনপুরের বুড়ো ধাত্রীর ওপর ছেড়ে দিতে সাহস হ'ল না।

বেশ তো। আপনি এর মধ্যে আর একদিন নিয়ে আসবেন। আমি আর একবার পরীক্ষা করব, সেদিনই ভর্তির বন্দোবস্ত ক'রে দেব।

ডাক্তার সেন রমার দিকে চেয়ে কি ভাবলেন কিছুক্ষণ! ঠোঁট কামড়ে বললেন, অবশ্য এই সময়টা অতদূর থেকে আসা যাওয়া না ক'রে কাছাকাছি থাকতে পারলেই ছিল ভাল। কিন্তু তোমার দাদা বউদি তো বাইরে। অবশ্য চিঠি পেয়েছি, শীঘ্রই বোধ হয় আসবেন।

একটু ইতস্ততঃ করল রমা, তারপর সঙ্কোচ কাটিয়ে জিজ্ঞাসা করল, বউদির শরীর এখন কেমন?

জিজ্ঞাসা করেই লজ্জায় পড়ে গেল। ওর বউদি, অথচ মঙ্গল-অমঙ্গলের সংবাদ পেতে হবে ডাক্তারের মারফৎ! কেন, চিঠিপত্রের মাধ্যমে ওর কাছে খবর আসে না? ছি, ছি, এ প্রশ্ন না তুললেই ভাল ছিল।

অবশ্য ডাক্তার সেন এসব নিয়ে মাথা ঘামালেন না। এখনও কিছু রোগী অপেক্ষা করছে। সময় কম। স্টেথোস্কোপ গলায় ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে উঠতে উঠতে বললেন, মিসেস ব্যানার্জীর রোগটা মনের ব্যাপারই বেশী। উত্তেজনাপ্রবণ মেয়েদের পক্ষে এ রকম একটা ব্যাপার হ'য়ে গেলে সামলাতে দেরী হয়। দেখি, নতুন একটা ইনজেকশনের কোর্স দেব ঠিক করেছি। বেশ, তা হ'লে ওই কথাই রইল। বুধবার নাগাদ আর একবার নিয়ে আসবেন।

কমল আর রমা দুজনেই বাইরে বেরিয়ে এল। ঝিরঝিরে বাতাস। পার্কে পার্কে ঠাস বোঝাই লোক। পথচলতি লোকেরও কমতি নেই।

কমল রমার দিকে একবার ফিরে চাইল, তারপর বলল, কি, কষ্ট হচ্ছে?

ঘাড় নাড়ল রমা, না, কষ্ট হবে কেন? বউদির কথা ভাবছি। দাদা বউদি ফিরে এলে আমাকে নিয়ে আসবে একদিন। কি আর হবে?

কমল হাসল, উহুঁ, সমীরকে নিয়ে এস। তার পাতলা চেহারা আছে, তাড়া করলে পালিয়ে আত্মরক্ষা করতে পারবে। তোমার যত্ন আদরে আমার যে রকম নাড়ুগোপাল প্যাটার্নের সাইজ হয়েছে, ছুটতে গেলেও কাছা-কোঁচা জড়িয়ে রাস্তার মাঝখানে চিৎপাত হ'য়ে পড়ব।

গোটা ছয়েক ইনজেকশনেই প্রমীলার অনেক উপকার হ'ল।

প্রথম প্রথম ডাক্তার সেনের সহকারী বাড়িতে এসে দিয়েছেন, এখন প্রমীলা বিকালের দিকে নিজেই নার্সিংহোমে চলে যায়। অসুবিধা কিছু নেই, বরং সুবিধা অনেক। ছোট ছেলেমেয়ের পাল। প্রমীলা বেছে বেছে দু একটাকে কোলে তুলে নেয়। বুকের মাঝখানে চটকায়। ওষুধে যা না হয়, ছেলেপিলে কোলে করলে জীবনীশক্তি যেন বেড়ে যায় প্রমীলার। বুকের টনটনানি অনেক কম।

সেদিন ইনজেকশন শেষ ক'রে প্রমীলা বাইরে যেতেই একমাথা কোঁকড়ানো চুল একটি ছেলেকে দেখতে পেল। বাপের সঙ্গে সদ্যজাত ভাইকে দেখতে এসেছে। প্রমীলা হাত নেড়ে ডাকল প্রথমে, তারপর কাছে গিয়ে আদর করবার চেষ্টা করল। কিন্তু ছেলেটি মুখ গুঁজে রইল। কিছুতেই মুখ তুলল না। বাপ অপ্রস্তুত। অনেক সাধ্য-সাধনা করলেন, কিন্তু ছেলে মুখ তুলল না।

প্রমীলা হেসে হাল ছেড়ে দিল। সঙ্গে উড়ে ঠাকুরটা এসেছিল। রোজই আসে। প্রমীলাকে পোঁছে দিয়েই চলে যায়। অভয়াপদ অফিস ফেরৎ নিয়ে যায়। এর মধ্যে প্রমীলা একবার ওপরে ঘুরে আসবে।

সিঁড়ির মুখেই নার্সের সঙ্গে দেখা হ'ল। ভারি হাসিখুশী মেয়েটি। প্রমীলার সঙ্গে খুব ভাব। প্রমীলাকে দেখে এক গাল হাসল, আসুন প্রমীলাদি। এই তো চেহারা বেশ সেরে এসেছে। কিন্তু মুখ এত ভার কেন ?

প্রমীলা কপট গাম্ভীর্যে মুখ আরো ভার করল, নিচে একটি বাচ্চার সঙ্গে ভাব করতে গেলাম, তো এমন মুখ ফিরিয়ে রইল। কিছুতেই আমার দিকে ফেরাতে পারলাম না।

—ও, এই কথা, নার্সটি হাসি থামাল না, চলুন আপনাকে একগাদা বাচ্ছা দেখাচ্ছি।

কাছাকাছি যেতেই কান্নার শব্দ কানে গেল। অন্ততঃ ডজনখানেক ছেলেমেয়ে। ছোট ছোট খাট, বুকে নম্বর লাগানো। মায়ের নম্বরের সঙ্গে মিলিয়ে। একজনের বাচ্ছা যেন অন্য কারুর কাছে চলে না যায়।

ঘুরে ঘুরে প্রমীলা দেখল। কেউ দিব্যি ঘুমাচ্ছে চোখ বুজিয়ে, কেউ পরিত্রাহি চীৎকার করছে। নানা আকারের নানা বয়সের কচি কচি মাংসের তাল।

তোয়ালে ঢাকা একটি শিশুকে নিয়ে আর একটি নার্স এঘর থেকে ওঘরে যাচ্ছিল, প্রমীলা থামাল তাকে।

—ছেলে না মেয়ে ?

মেয়ে, নার্সটি হাত নিচু করল। ফুটফুটে মেয়ে, কোঁকড়ানো আঙুরের থোলোর মতন চুলের রাশ। টানা চোখ, টিকোল নাক, লালটুকটুকে ঠোঁট। প্রমীলাকে দেখে মুচকি হাসল।

—ওমা, কি সুন্দর মেয়ে। আবার দুষ্টু দুষ্টু হাসি। দিন না একটু আমার কোলে।

নার্স শিশুটিকে সন্তর্পণে প্রমীলার কোলে তুলে দিল। কচি কচি হাত বাড়িয়ে বাচ্ছাটা প্রথমে প্রমীলার শাড়ী চেপে ধরল, তারপর প্রমীলা চুমো খেতে মাথা নিচু করতেই মুঠো করে ধরল চুলের গোছা। আচ্ছা মেয়ে তো। ওমা, এইটুকু মেয়ে আবার কপালে কাজলের টিপ !

—কার মেয়ে ভাই ? প্রমীলা আদর করতে করতে জিজ্ঞাসা করল।

—এগার নম্বরের। আজই বউটি চলে যাবে তাই মেয়েকে সাজানো-গোছানো হয়েছে।

—সে কি, আজই চলে যাবে ? বিষাদের ছায়া নামল প্রমীলার মুখে। ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যাবে, আর হয় তো দেখাই হবে না। ভেবেছিল রোজ একবার ক'রে আসবে। মেয়েটিকে চটকাবে বুকে নিয়ে।

একটু কি ভাবল প্রমীলা, তারপর বলল, চলুন এর মার সঙ্গে আলাপ ক'রে আসি। মেয়েটাকে কিনেই নেবো না হয়। কত হাজার টাকা পেলে এর মা একে দেবে ? কথার সঙ্গে সঙ্গে ঝুঁকে পড়ে মেয়েটিকে নাক দিয়ে কাতুকুতু দিল, কি গো সোনামণি, কত দাম তোমার ?

মেয়েটি কি বুঝল কে জানে। আরো জোরে চুলের মুঠি আঁকড়ে খিল খিল ক'রে হেসে উঠল। কামরায় ঢুকতেই এক রাশ কুঞ্চিত চুলের গোছা দেখা গেল। জানলা ধরে বাইরের দিকে চেয়ে মেয়েটি কি দেখছিল।

—আপনার মেয়েটিকে নিতে এলাম। কত টাকা হ'লে দিতে পারেন বলুন ত ?

আচমকা গলার আওয়াজে মেয়েটি চমকে উঠল, তারপর ফিরেই অবাক।

সদ্যজাতাকে বুকের মধ্যে আঁকড়ে প্রমীলা দাঁড়িয়ে।

—একি বৌদি ?

—ঠাকুরঝি !

ভয় হ'ল রমার। চিনতে না পেরে যে মেয়েটিকে বৌদি বুকে জড়িয়ে ধরেছিল, পরিচয় পেয়ে কঠিন মাটিতে তাকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে না তো। ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়া মেয়ের সন্তান। অসবর্ণ বিয়ের ফল।

কিন্তু আশ্চর্য, প্রমীলা সে সব কিছুই করল না ! আরও জোরে মেয়েটাকে বুকের মধ্যে আঁকড়ে ধরল। চুমোয় চুমোয় উদ্‌ভ্রান্ত। ধরা

গলায় বলল, মা হয়ে একেবারে পীর হয়ে গেছ, না ঠাকুরঝি? বড় বৌদি, এতদিন পরে দেখা, একটা প্রণামও বুঝি করতে নেই? কথার সঙ্গে সঙ্গে টস টস করে চোখের জল প্রমীলার গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল।

কম্পিত পায়ে এগিয়ে যেতে গিয়েই রমা বাধা পেল। পিছন থেকে কমল এসে দাঁড়াল, নিচু হয়ে প্রণাম করতে করতে বলল, কথাটা যে আমায় ঠেস দিয়ে বলা তা বুঝি বুঝতে পারি নি ভেবেছ বৌদি! বাবা, প্রণাম পাবার এত লোভ?

কমলের ইঙ্গিতে রমাও এগিয়ে প্রমীলার পায়ের ধুলো নিল। সোজা হয়ে দাঁড়াতেই প্রমীলা তার চিবুক স্পর্শ ক'রে চুমো খেল। হেসে বলল, প্রণামে ভুলছি না, আসল কথাটাই যে চাপা পড়ে গেল। কত টাকা পেলে মেয়েকে দিতে পারো বল?

মুখ নিচু করে রমা হাসতে লাগল। উত্তর দিল কমল, তোমার ভালোবাসার কাছে আবার টাকা বৌদি। তোমার ভালোবাসার মূল্যেই তুমি নাও ওকে।

হঠাৎ কি মনে হ'তে রমা আঁচল টেনে দিল মাথায়। ফিসফিসিয়ে বলল, ছোড়দা আসে নি?

—আসে নি আবার। সকাল থেকে পাগল ক'রে মেরেছে। নিচে দুভায়ে মুখোমুখি বসে কথা হচ্ছে।

এদের কথার এক বর্ণও প্রমীলার কানে গেল না। এক মনে মেয়েটাকে আদর ক'রে চলেছে। আর মেয়েটাও তো আচ্ছা আদরখাকী। মাটীর তালের মতন চুপ ক'রে পড়ে আদর খাচ্ছে। মাটীর তালই বটে! কিন্তু এত তার রং, এত তার জেল্লা, দূরে সরে যাওয়া হৃদয়কে কাছে টানার এত শক্তি!

সমাপ্ত